হালকা হাসি চোখের জল

১ম খণ্ড

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

৫৭/২ ডি কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ : মহালয়া ১৩৭০, ২২ সেপ্টেম্বর ১৯৬৩

প্রকাশিকা : মাধবী মণ্ডল

সংবাদ প্রকাশন : ৫৭/২ ডি, কলেজ স্ট্রীট

কলকাতা-৭০০ ০৭৩

মুদ্রক : জগন্নাথ ঘোষ

নিউ রামকৃষ্ণ প্রেস, ৬৩এ/২ হরি ঘোষ স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০ ০০৬

বাড় ও শ্বশুরমশাই

এই শীতকাল, এমন মিঠে রোদ, একটু বড়ি-টড়ি তো দিতে পার।' ডাল দিয়ে ভাত চটকাতে চটকাতে অসীম ব্যাজার ব্যাজার মুখে কথা ক'টা স্ত্রীকে মিহি করে বললে। হুকুম-টুকুম নয়। একটা সামান্য অভিলাষ। এইটুকু বলে থেমে থাকলে ক্ষতি ছিল না। সে আর একটু এগিয়েই বিপদ ডেকে আনল। 'মা-ও গেছেন, খাবার বারোটাও বেজে গেছে।'

মনোরমা মাথা নিচু করে সরষের তেল দিয়ে আলুভাতে মাখছিল। মুখ না তুলেই বললে, 'রাখো রাখো, মা যে তোমাকে রোজ পঞ্চব্যঞ্জন দিয়ে খাওয়াতেন তা আমার দেখা আছে। মরা মানুষটাকে নিয়ে আর টানাটানি কোর না।'

'হ্যাঁ, মায়ের কথা বললেই তো তোমার গায়ে জ্বালা ধরবে। সেই লাস্ট নাইটিন সেভেনটি সেভেনে একবার নারকোল, ছোলা-টোলা দিয়ে মোচা হয়েছিল, সেভেনটি ফাইভে হয়েছিল থোড়। তারপর থেকে লাগাতার চলছে, ভাত, ডাল, আলুভাতে, মাছের ঝাল; মাছের ঝাল, আলুভাতে, ভাত, ডাল। জীবনে ঘেন্না ধরে গেল।'

'আমারও।'

'হ্যাঁ আমার যা হবে, সঙ্গে সঙ্গে তোমারও তাই হবে। শুধু হবে না, ডবল ডোজে হবে। বেশ কৌশল শিখেছ। তোমার ঘেন্না ধরার কারণটা কি?'

'কেঁচো খুঁড়তে যেও না, সাপ বেরোবে। খাচ্ছ খেয়ে যাও। মোচা, নারকোল, থোড় না নিয়ে এলে আমি কি জন্ম দেবো?' ধপাস করে আলুভাতের একটা টেনিস বল পাতে ফেলে দিয়ে মনোরমা উঠে

গেল। রান্নাঘরে গনগনে উনুনে মাছ ভাজা হচ্ছে। সাঁড়াশি দিয়ে কড়াটা উনুন থেকে উপড়ে নিয়ে এল। গরম তেলে মাছ বিজবিজ করছে মনোরমার মেজাজের মত। একবার যদি সাঁড়াশির ঠোঁট আলগা হয়ে কড়া দুম করে মেঝেতে পড়ে মনোরমার ঠোঁট ফসকে বেরোনো বাক্যের চেয়েও অসীম আহত হবে। বড় ভয় পায় এই মুহূর্তকে। মনোরমা থালার সামনে উবু হয়ে বসে ভীত অসীমের পাতে একটি চারাপোনা ফেলে দিল। ন্যাজের দিকটা নুনের ওপর গিয়ে পড়ল। ভয় কেটে গেছে। এতক্ষণ আগের কথার যে উত্তরটা মনে মনে মকশ করছিল তা বলা যেতে পারে।

'গর্ভে মোচা ধারণ করতে গেলে কলা গাছের বীজ চাই, সে কথা আমি জানি ; কিন্তু ওই তিন বস্তু বাজারের ঝোলা থেকে বেরোলে তোমার মুখ তো তোলা হাঁড়ির মত হবে। এ তো আর তোমার ড্রেসিং নয়। ঘাড়ে পাউডার, ভুরুতে পেন্‌সিল, কপালে কুমকুম। মোচা ড্রেস করার একটা আলাদা আর্ট আছে। সে আমার মা জানতেন।'

কড়াটা মাটিতে নামিয়ে রেখে মনোরমা বললে, 'হ্যাঁ, তোমার মা সব জানতেন। কবিরাজের মেয়ে ছিলেন তো। শেকড়-বাকড়, পাতামাতা, কচু-ঘেঁচু।'

'আর তুমি হলে অ্যালোপ্যাথের মেয়ে। মাছ, মাংস, লিভার পিল'

'আমি কার মেয়ে সে তো ভালো করেই জানো। অত ঠেস দিয়ে কথা বলার কি আছে ? ডাক্তারের মেয়ে হলে তোমার মত মোচা-খেকোর গলায় কি আর মালা দিতুম। টাকার জোরে ব্যারিস্টার জুটতো।'

অসীম হেসে ফেলল। দুজনের ঝগড়া এইভাবেই শুরু হয়ে হাসিতে শেষ হয়। মনোরমা বড় ভাল মেয়ে। একা সংসারটাকে মাথায় করে রেখেছে। সহজ সরল মেয়ে। বেশি খাটাতে চায় না

বলে অসীম সাবেক কালের খাবার ফ্যাচাং বাড়িতে ঢোকাতে চায় না, আবার সুযোগ পেলে বলতেও ছাড়ে না।

অসীম অফিসে চলে গেল। মনোরমা কিছুক্ষণ এপাশ-ওপাশ করে ঠিক করে ফেললে, যা থাকে বরাতে, আজ সে সারা দুপুর বসে বসে বড়ি দেবে। কি এমন হাতি-ঘোড়া ব্যাপার! ডাল বেটে, নুন দিয়ে ফেটিয়ে একটা সাদা কাপড়ের ওপর টুকুস টুকুস করে পেড়ে যাওয়া। সমস্যা নাক নিয়ে। নাক উঁচু উঁচু না হলে বড়ি দেখে নাক-উঁচু মানুষের মন ভরে না। থ্যাবড়া-নাকী মেয়ে যেমন বিয়ের বাজারে অচল, চ্যাপ্টা নাক বড়িও তেমনি সমঝদারের সমালোচনার বস্তু।

শঙ্করীর মা বাড়িতে কাজ করে। সেই হ'ল মনোরমার উপদেষ্টা। উপদেষ্টা বললে, 'আজ তো হবে না মা। ও রাতের বেলা ডাল ভিজিয়ে রাখতে হবে। সকালে বাটতে হবে। তুমি আজ ভিজিয়ে রেখো, কাল সকালে আমি বেটে দোব।' কাল মানে রবিবার। সেই ভালো। রবিবার ছুটির দিন। অসীমের সাহায্যও পাওয়া যাবে।

রবিবার বেলা একটা নাগাদ ডালবাটা রেডি হয়ে গেল। কালো জিরে ভাজছে। খাওয়া-দাওয়া শেষ। এইবার শীতের রোদে পিঠ দিয়ে ডুরে শাড়ি পরে মনোরমা ছাদে বসে বড়ি দেবে।

'তোমার এই ধুতিটা নিচ্ছি।'

অসীম লাফিয়ে উঠল, 'কেন? আমার ওই সাধের নতুন ধুতিটা তোমার কোন কম্মে লাগবে?'

'বড়ি দোব।'

'বড়ি দেবে আমার ধুতিতে? মামার বাড়ি! নিজের শাড়িতে দাও।'

'আটপৌরে নতুন শাড়ি নেই। তোলা শাড়ি একটা দেড়শো-দুশো টাকা দাম। সোনার বড়ি হলে দেওয়া যেত। ডালের বড়ি কি ফুলভয়েলে দেওয়া যায়?'

'তাহলে বিছানার চাদরে।'

'চাদরে? অপবিত্র জিনিস। তোমার কোনও ভয় নেই। বড়ি খুলে নিয়ে কেচে দোব, ইস্তিরি করে নিলেই যেমন নতুন তেমনি নতুন। ধুতিটা তো পড়েই থাকে। তুমি তো প্যান্ট আর পাজামা পরেই সারা জীবন কাটালে।'

রাজি না হয়ে উপায় কি! বড়ির হুজুক সে-ই তুলেছিল।

বেলা তিনটে নাগাদ সার সার বড়ি অসীমের কাঁচি ধুতির ওপর থেবড়ে থেবড়ে বসে গেল। তেমন টিকোলো নাক সবক'টার হল না। শঙ্করীর মা জ্ঞান দিলে, 'ভগবানের সৃষ্টিতেই মা কত খুঁত। মানুষের হাতে সব কি সমান হয়। পাড়া বড়ির নাক ধরে আর টানাটানি করুনি! জন্মের পর মানুষেরই আর কিছু করা যায় না। এ তো ডালের বড়ি।'

বড়ির পুংলিঙ্গ বড়া। কিছু বড়া হল, কিছু বড়ি। যা হয়েছে বেশ হয়েছে। মনোরমা এসে অসীমকে বললে, 'এই যে মশাই। তোমার কাগজপত্র নিয়ে ছাতে উঠে যাও। ইজিচেয়ার পেতে বসে বসে পড় আর বড়ি পাহারা দাও।'

'যথা আজ্ঞা।' ইজিচেয়ারে শরীর ছড়িয়ে অসীম কাগজ পড়ছে। কিছু দূরেই কাপড়ে সত্যাগ্রহীর মত বসে আছে সার সার বড়ি। মিঠে রোদ, মিষ্টি হাওয়া, পাখির ডাক। কেমন যেন ঘুম এসে যাচ্ছে, চোখ জুড়ে আসছে। দু' একটা কাক মাঝে মাঝে পাশে হেঁটে হেঁটে খড়খড় করে বড়ি ঠোকরাতে আসছে।

অসীম হুস করলেই উড়ে পালাচ্ছে। এ এক ভালো জ্বালা যা হোক। একেই কি বলে, যমে মানুষে টানাটানি। কতক্ষণ আর জেগে থাকা যায়। অসীমের চোখ বুজতে বুজতে বুজেই গেল।

মনোরমার চিৎকারে অসীমের ঘুম ভেঙে গেল। 'এ কি? আমার বড়ি কোথায়?' মনোরমার হাতে বিকেলের চা। অসীম চোখ মেলে দেখলে ফাঁকা ছাদ। কোথাও বড়ির নামগন্ধ নেই।

'তুমি তুলে নিয়ে গেছ।'

'তুলে নিয়ে যাব কি? ভালো করে শুকনোই হল না।'

'ভৌতিক ব্যাপার তো? আচ্ছা রসিকতা! আর কেউ এসেছিল?'

'কে আবার আসবে? তোমাকে পাহারায় রেখে গেলুম তাহলে কি জন্যে?'

'কাকের তো এত ক্ষমতা হবে না? দশহাত ধুতি ঠোঁটে করে নিয়ে পালাবে।'

'পারে, ওরা সব পারে। এক সঙ্গে একশো কাক ঠোঁটে করে নিয়ে উড়তে…।' মনোরমার কথা বন্ধ হয়ে গেল।

'ওই দেখ? আমগাছের ডালে ওটা কি ঝুলছে।'

অসীম আমগাছের মগডালের দিকে তাকাল, সাদা একটা কাপড় ঝুলছে।

'হ্যাঁ, ওই তো তোমার সেই বড়ি। ওই তো আমার সেই নতুন কাপড়। ওখানে গেল কি করে?' হঠাৎ রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেল। পাতার আড়ালে তিনি বসেছিলেন ন্যাজ ঝুলিয়ে। কাপড়-সমেত এ ডাল থেকে ও ডালে লাফ মারলেন, হুপ করে।

'আরে এ তো সেই বীর হনুমানটা।'

'আমার কাপড়? সর্বনাশ হয়ে গেল মনোরমা। টেনে টেনে ফর্দাফাঁই করে দিলে।'

'আমার বড়ি? আমার এতক্ষণের পরিশ্রম। মুখপোড়া হনুমানে খেয়ে নিলে! কার জন্যে বড়ি দিলুম আর কার ভোগে গেল!'

'একছড়া কলা আনো, কলা। কাপড়টা অন্তত উদ্ধার করি।'

'কলা কোথায় পাব?'

'তাহলে?' তাহলে, দু'জনে ছাদে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ সাধ্য-সাধনা করলে। 'হে বাবা রামের বাহন! হে পবনসুত। হে বাবা গান্ধীজীর চেলা। হে ভগবান হনুমান।' হনুমানের কোনও সুমতি দেখা গেল না। অসীম রেগে গিয়ে বলল,' ঠিক আমার শ্বশুরমশাইয়ের মত একগুঁয়ে।'

'অ্যাঁ, কি বললে ?'

'তখন তোমাকে কি বলেছিলুম ? কাপড়ে দিও না। কাপড়ে দিও না। শুনলে ?'

'কে বড়ি বড়ি করে লাফিয়েছিল ?'

'ওই যে আমার শ্বশুরমশাই কাঁচি ধুতি পরে খাচ্ছেন।'

আবার ভীষণ ঝটাপটি হয়ে গেল দু'জনে। আর সেই ছেঁড়া ছেঁড়া ধুতিটা আমগাছের ডালে ঝুলে রইল একটা সিজন ধর্মঠাকুরের নিশান হয়ে।

বাড়িঅলা

অনেকদিনের ইচ্ছে, ছোট্ট-খাট্টো একটা বাড়ি তৈরি করব। বেশ বাংলো প্যাটার্নের। চারপাশে ছবির মত বাগান। রুমালের মাপের সবুজ ঘাসে ঢাকা লন। গ্রীষ্মের বিকেলে পাশাপাশি তুটো বাগান চেয়ারে বুড়ো-বুড়ি বসে বসে ফুরফুরে হাওয়া খাব। আকাশে একটা তুটো করে তারা ফুটবে। পশ্চিম আকাশে ক্ষয়া চাঁদ উঠবে। হ্যাঁ, গোটা তুয়েক মন্দির-ঝাউ বসাব। হাওয়া লেগে যে ঝাউয়ের একটা তুটো পাতা নয়, সারা গাছটাই তুলতে থাকে ষোড়শী নর্তকীর ছন্দে। তারপর যেদিন ছেলের বিয়ে দোব। ভাবা যায় না। হলদে আর নীল রঙের ফুটকি ফুটকি আলোর মালা ঝোলাব সারা বাড়িতে। হাল্কা হলুদ রঙের দেয়ালে স্বপ্নের যায়া গড়াতে থাকবে চুঁইয়ে চুঁইয়ে। আলোর মালা দিয়ে গাছ সাজাব। মনে হবে কলকাতার উপকণ্ঠে বসে নেই, বসে আছি হাওয়াই দ্বীপের মায়ালোকে। অদৃশ্য সুন্দরীরা গাছের ফাঁকে ফাঁকে নেচে চলেছে। বেনারস থেকে সবচেয়ে বড় ওস্তাদ আনাব। সানাইয়ের মিঠে সুর ধূপের ধোঁয়ার মত ছড়িয়ে পড়বে। অবশেষে একদিন দক্ষিণের জানালা খোলা শোবার ঘরে, ধবধবে সাদা বিছানায়, আমি চললুম গো বলে শুয়ে পড়ব। কোনও ব্যথা নেই, যন্ত্রণা নেই, শ্বাসকষ্ট নেই, সজ্ঞানে স্বর্গে গমন। স্বর্গেই যাব, জীবনে আমি কোনও পাপকর্ম করিনি। আমি মধ্যবিত্ত বাঙালী হলেও আমার স্বভাবটি ভাল। প্রতিবেশীর ভালো দেখলে বুক ফেটে যায় ঠিকই, তবে সেই সাবেক কালের বধূদের মত, বুক ফাটে তবু মুখ ফোটে না। নিয়মমত দেবালয়ে যাই। নিজের ভালোর সঙ্গে অন্যের ভালোও কামনা করি। সুন্দরী মহিলাদের দিকে আড়ে আড়ে তাকালেও, চোখ ফিরিয়ে নিয়ে গর্জন করতে থাকি—মা মা।

কথায় বলে, ইচ্ছে থাকলেই উপায় হয়।

সঞ্চয়ের দিকে ষোল আনা নজর দিলুম। যেটুকু খরচা না করলেই নয়; সেইটুকু বজায় রেখে বাকি সব ছাঁটাই। রাজনৈতিক নেতাদের মত একটা স্লোগানই তৈরি করে ফেললুম—ইকনমি, ইকনমি, মাথা গোঁজার ঠাঁই চাই। আগে একটা বাড়ি, তারপর অন্য সব।

বাড়িতে শিশু যখন কেউ নেই তখন দুধেরও কোনও প্রয়োজন নেই। চায়ের জন্যে ছোট এক টিন গুঁড়ো দুধেই এক মাস চলে যাওয়া উচিত। না চললে র চা। গৃহিণী মাসখানের মধ্যেই রব তুললেন, পড়ুয়া ছেলেরা দুধের অভাবে রোগা হয়ে যাচ্ছে। বুদ্ধি কমে যাচ্ছে। অঙ্ক কষতে পারছে না। স্মৃতিশক্তি কমে আসছে।

আমি বললুম, ওসব কিছু না। ও ব্যাটা মায়ের দিকে গেছে। তোমার মোটা মাথাটাই উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে। ও মগজের গোড়ায় জোলো দুধ যতই ঢাল, কিস্যু হবে না। একটা বাছুরকে দুধ খাওয়ালে সে কি আইনস্টাইন হবে! অকাট্য যুক্তি। এ যুক্তি জজেও মানবে। উঠতি বয়সের ছেলেদের শরীরের জন্যে এক মুঠো ভিজে ছোলা, দু'এক কুঁচি আদাই যথেষ্ট। ছোলাপোষ্য ওয়েলার ঘোড়া দেখেছ! বড়বাজারের পাতাখেকো ষাঁড় দেখেছ!

মাছিও বাতিল। আমরা মানুষ, বেড়াল নই। পচা মাছ ছাড়া ভাত উঠবে না, তা তো নয়। নিরামিষের মত আহার নেই। দেহ পবিত্র থাকে, মন পবিত্র থাকে। বই খুলে দেখালুম। মাছ, মাংস, ডিম খেলে আমাদের কোলনে এমন সব জীবাণু জন্মায় যা আমাদের শত্রু। শরীর বিষিয়ে তোলে নিরামিষ আহারে যে-সব জীবাণু জন্মায় তারা আমাদের বন্ধু। তলপেট শত্রুর দখলে চলে যাক, এই কি তোমরা চাও?

গৃহিণী বললেন, কোলন কাকে বলে?

তলপেটের ডানপাশ খাবলে ধরে দেখিয়ে দিলুম, এই সেই বিখ্যাত কোলন যার প্রদাহকে বলে কোলাইটিস। হলে সারে না। ধীরে

ধীরে মৃত্যু। শাকপাতা খেয়ে নিজের বাড়িতে দীর্ঘজীবী হবে, না পচা মাছ খেয়ে পটল তুলবে!

মৃত্যুভয়ের চেয়ে বড় ভয় আর কিছু নেই। মাছ বাতিল হল। বেশ বড় তুটো খরচ বাঁচানো গেল। এইবার তেল। খাওয়ার আর মাখার। মেয়েদের চুল সাংঘাতিক তেল খায়। ভাল করে মাখলে, এক এক খেপে তুশো গ্রাম। শরীরে আজকাল আর তেমন তেল কেউ মাখে না। কুস্তির পালোয়ানরা মাখে। আমাদের পালোয়ান হবার শখ নেই। আমরা বাড়িওয়ালা হতে চাই।

গৃহিণীকে শোবার ঘরে ডেকে, ম্যাগাজিন খুলে চিত্রতারকাদের চুল দেখালুম!

রেশমের চামর তুলছে পিঠের ওপর। তোমার ইচ্ছে করে না, অমন চুলের মালিক হতে?

লাজুক লাজুক মুখে বললে, ওরা কত যত্ন নেয়!

তুমি নাও। তেল মাখা বন্ধ করে মাঝে মাঝে চুলে ব্যাসন ঘস, তোমার চুলও ওই রকম হয়ে যাবে। তোমার লজ্জা করে না?

মাথার বালিশের খোলটা দেখালুম। খুনের মামলায় কোর্টে যেভাবে অপরাধের চিহ্ন এক, তুই করে দেখানো হয়।

এই দেখ তোমার বালিশ! এই বুড়ো আঙুল টিপসই দেবার মত চেপে ধরলুম। কেমন? এইবার তুলছি দেখ! এত আঠা, বিছানা ছেড়ে আধ হাত ওপরে উঠে আসছে। উচ্চ সমাজের ফ্যাশানেবল মহিলারা এই জিনিস দেখলে ছি ছি করবেন!

একে বলে শকথেরাপি। এই চিকিৎসায় পাগল ভাল হয়। স্ত্রী তেল মাখা ছাড়লেন! দেখতে, দেখতে ভৈরবীদের মত চেহারা হল। তা হোক। এ তো ঘরের বউ। বিশ্বসুন্দরী হবার জন্যে তো আর হুলুলুলু ছুটবে না।

হার্টের ভয় দেখিয়ে তেল খাওয়াটাও বন্ধ হল। ঝাল, ঝোল, ভাজা খেয়ে বিধবা হতে চাও, না সেদ্ধ খেয়ে সধবা?

নেচার কিওরের বই খুলে দেখিয়ে দিলুম, ভারতবর্ষের জনৈক প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী কি বলছেন! সাবান চামড়ার পক্ষে ভীষণ ক্ষতিকারক। জল আর হাত, এর চেয়ে উত্তম জিনিস আর কিছু নেই। চামড়া উজ্জ্বল আর মসৃণ থাকবে। সহজে বুড়ো হব না। আমার কথা নয়। ভারতের একজন প্রধানমন্ত্রীর কথা। যিনি নব্বই বছরেও যুবক।

সাবানের খরচও কমে গেল। চল্লিশ পাওয়ারের বেশি আলো কোথাও রাখলুম না। বাঙালীর চোখে চালসে ধরবেই, চশমা নিতেই হবে। ষাটের পর ছানি অপারেশন! ইলেকট্রিক বিল যতটা কমে ততই ভাল। মাসে দশ টাকা বাঁচা মানে কুড়িখানা ইট। যা বাঁচবে তাকে বাড়ি তৈরির মাল মশলায় নিয়ে এলে কষ্টকেও আনন্দ মনে হবে। যেমন কাজের মহিলাটিকে ছাড়িয়ে দিলে মাসে ষাট টাকা বাঁচবে। তার মানে এক বস্তা সিমেন্ট। এক বছরে বারো বস্তা। তার মানে একতলার গাঁথনি।

বাথরুমে একদিন মাথা ঘুরে পড়ে গেলুম ডাক্তারবাবু বললেন. ভয়ঙ্কর লো-প্রেসার মশাই। খাওয়া-দাওয়া ঠিক হচ্চে না। একটু প্রোটিন খান। সকালে হাফবয়েল। রাতের দিকে হোয়াইট মিট স্ট্যু করে। এক গেলাস দুধ। কাজকর্ম করে খেতে হবে তো। আজ বাথরুমে পড়েছেন, কাল যদি পথে উল্টে পড়েন, বাঁচবেন?

এ কান দিয়ে শুনলুম ও কান দিয়ে বের করে দিলুম। যত সব কেতাবী কথা। সারা ভারতের নব্বই ভাগ মানুষই তো তাহলে উল্টে পড়বে! উল্টে উল্টে, কেতরে কেতরেই এদেশ চলবে! এটা কি বিলেত! রিডার্স ডাইজেস্টে পড়লুম, স্রেফ জোরে জোরে নিশ্বাস নিয়ে মানুষ সুস্থ সবল থাকতে পারে। আমরা শ্বাস-প্রশ্বাসের কায়দাটাই জানি না, ল্যাদাড়ুসের মত বেঁচে আছি। সাঁ করে টান, সিঁ করে ছাড়। আসলে রাতের খাওয়াটা বদহজম হচ্ছে' একাহারী হলে শরীর ঠিক হয়ে যাবে। যে বয়েসের যা। খরচও বাঁচবে। দু' টাকা বাঁচা মানে একটা ভেনটিলেটার।

জগাছার কাছে চার কাঠা পোড়ো জমি ওরই মধ্যে সস্তায় পাওয়া গেল। তিন হাজার টাকা কাঠা। একটু একটেরে। স্টেশান থেকেও যেমন দূর, বাস স্টপ থেকেও তেমন দূর। মাইল দেড়েক হাঁটতেই হবে। তা হোক। হাঁটলে শরীর ভাল থাকে। কত লোক শখ করে হাঁটে। কত বীর হেঁটে বিশ্ব ঘুরে আসছে। বীরভোগ্যা বসুন্ধরা।

এদিকে ভিটামিন আর প্রোটিনের অভাবে কর্তা গিন্নির গোহাড়গিলের মত চেহারা হয়ে গেছে। তা যাক। ভুঁড়ো নাদা হয়ে সারা জীবন পরের বাড়িতে বাস করার চেয়ে কঙ্কাল হয়ে নিজের ভিটেয় ঘোরা ঢের ভাল। এই যে রোববার রোববার যখন সস্ত্রীক নিজের জমিতে যাই, মন ভরে ওঠে। মনে হয় টাকে চুল গজিয়ে উঠছে আনন্দে। সত্যিই কি আর গজায়! মনে হয় জায়গাটা আগাছায় ঢেকে আছে। মনুষ্যাকৃত্যের গন্ধও পাওয়া যায়। তা যাক। কল্পনায় মানুষ কত কি দেখতে পায়! আমি বাগান দেখি, গোলাপ দেখি, ঝাউ দেখি। আমার বাংলো প্যাটার্নের হলুদ বাড়ি দেখি। আমার স্ত্রী অবশ্য এ সব দেখতে পায় না। মেয়েরা বড় বস্তুবাদী।

জগাছা থেকে একদিন ফিরে এসে আমার স্ত্রী দাঁত ছিরকুটে পড়লেন। ডাক্তার বললেন, কি করেছেন মশাই অ্যাকুট অ্যানিমিয়া! ডাক্তারদের যা ধর্ম। তিলকে তাল করেন। কোন্ বঙ্গললনার অ্যানিমিয়া আর অম্বল নেই! জনৈক কবিরাজ আমাকে অ্যানিমিয়ার টোটকা শিখিয়েছিলেন, নতুন কড়ায় থোড় বেঁধে খাওয়া। এমন কিছু খরচ নয়। এই সময় অ্যালোপ্যাথি করতে গেলে, বাড়ির স্বপ্ন চুরমার হয়ে যাবে। বারো হাজার জমিতে গেছে। বর্ষার আগে লিণ্টাল অবধি তুলে ফেলে রাখব। তারপর লোন পেলে বাকিটা শেষ করব। দোতলা আমি করব না। একতলা করব, তবে সম্পূর্ণ করব। আধখ্যাঁচড়া নয়।

বোশেখে ভিতপুজো হয়ে গেল। আমার স্ত্রী কোনরকমে গেলেন। বাড়ি করার চিন্তাটা আমার কাছে ভিটামিনের মত হলেও

আমার স্ত্রীর শরীরে তার কোনও প্রভাব দেখছি না। সব সময় যেন ধুঁকছে। অসুখ তো মনে। মনটাকে শক্ত কর। বলে বলে আর পারলুম না।

মার খাওয়া কুকুরের মত ফিরে এল। আসার পথে যত মন দুর্বল করা কথা। আমার আর বাড়ি দেখা হল না। যাক, তোমরা সুখী হও। আমি ওপর থেকে দেখব। কথা শুনে নিজের চোখেই জল এসে যাবার জোগাড়।

মাসখানেক ছুটি নিলুম। বাড়ি বেশ তরতর করে উঠছে। আমার স্ত্রীর শরীরও তরতর করে ভাঙছে। হাত-পা মুখ ফুলছে। অনেকের বাড়ি সহ্য হয় না। কি জানি বাবা! সত্যি সত্যিই চলে যাবে নাকি! আত্মীয়-স্বজনরা বলতে লাগলেন কি বাড়ি বাড়ি করছ। আগে স্ত্রীকে বাঁচাও। ছেলে বড় হচ্ছে। সে একদিন স্পষ্টই বলে বসলে, সত্যি মিথ্যে জানি না, আগে ব্রিজ তৈরির সময় প্রত্যেক পিলারের তলায় একজন করে মানুষ বলি দেওয়া হত। বাবার হয়েছে তাই। মায়ের সমাধি তৈরি করছে।

মনে বড় আঘাত পেলুম। বাড়ি কি শুধু আমার জন্যে। ঠিক আছে, তোমরা যখন চাইছ না, তখন কাজ বন্ধ থাক। চিকিৎসাই হোক। জীবন আগে তারপর বাসস্থান। আজকাল চিকিৎসার খরচ তো কম নয়। এই পরীক্ষা, সেই পরীক্ষা, ওষুধ, ইনজেকসান। শেষে বায়ু-পরিবর্তন।

এদিকে বর্ষা এসে গেল। ইটের গায়ে শ্যাওলা পড়ে এল। আগাছা মাথা তুলেছে। কি আর করা যাবে! রেস্ত ফাঁক। এখনও পাঁচ ছ' ফুট তুললে তবে লিণ্ট্যাল। তবে ঋণের আবেদন। হাঁটাহাঁটি, ধরাধরি, তবে লোন। শরীরে আর সে শক্তি নেই।

অ্যানিমিয়ার রুগী ক্রমশ সেরে উঠছে। উঠলে কি হবে, বয়েস তো বেড়েছে। এ বয়েসের শরীর একবার ভাঙলে আর আগের মত হয় না। পুরনো বাড়ি যতই রিনভেট কর না, মনের মত হয় না।

রবিবার একা একা জগাছায় যাই। হাঁটুভর জঙ্গল। গাঁথনির ওপর বসে বসে ভাবি এটাই হবে বসার ঘর, বসার ঘর থেকে বেরিয়ে পুব-পশ্চিমে লম্বা করিডর। দক্ষিণে শোবার ঘর, একটা দুটো। সব ডবল জানালা। ফুল ফুল গ্রিল বসানো। উত্তরে স্টোর, রান্নাঘর, বাথরুম। বেশ খোলামেলা একটা ডাইনিং স্পেস। দুপাশে চওড়া বারান্দা। পশ্চিমে উঠোন। উঃ, যা হবে না!

ভাবতে ভাবতে ঘোর লেগে যায়। দিনের আলো নিবে আসে। পায়ের কাছে কাঠবেড়ালী খেলতে আসে, একজোড়া ঘুঘু চরতে আসে, পোকামাকড় লাফায়, সরীসৃপ সরসর করে বেড়ায়। আমার ভয় করে না।

আমি উঁচু গলায় বলি, আমি তোদের বাড়িঅলা রে ব্যাটা। তিনমাস ভাড়া বাকি পড়েছে। এবার কেস করব।

কিন্তু কোন্ আদালতে!

প্রেসার কুকার

আগেকার দিনে নীলকর সাহেবরা বেগার ধরতে বেরোতেন। সাহেব চলেছেন ঘোড়ায় চেপে। হঠাৎ নজরে পড়ল এক পুরোহিত চলেছেন নামাবলি গায়ে। হাতে শালগ্রাম শিলা। রাস্তার মাঝখানে আড়াআড়ি ঘোড়া দাঁড় করিয়ে সাহেব বললে, 'পালাইতেছ কোথা, বেগার ডিটে হইবে।' ব্যাস হয়ে গেল। যজমানের বাড়ি পড়ে রইল দু' ক্রোশ দূরে। সত্যনারায়ণ মাথায় উঠল। পুরোহিত চললেন, সাহেবের নীল চাষে বেগার খাটতে। না গেলেই সপাসপ চাবুক।

যুগ অনেকদূর সরে এলেও আমার সংসার চলছে বেগার প্রথায়। আমার স্ত্রী বেশ ভালো কায়দা বের করেছে। মহিলার ক্ষমতা আছে। পূর্ব জন্মে হয় নীলকর সাহেব ছিল, না হয় সাহেবের হারেমের কোনও দেশি বিবি।

আমি একটা গ্রাম গ্রাম অঞ্চলে থাকি। বাড়ির চারপাশে একটা বাগান-মত ব্যাপার আছে। প্রথম দিকে বাগানই ছিল। প্রতিবেশীদের সহৃদয় উৎপাতে সাধের বাগানে এখন নৈরাজ্য চলেছে। কিছু ফুলের গাছ স্ট্যামিনার জোরে এখনও টিঁকে আছে। আর ক'দিন থাকবে বলা শক্ত। বহুকাল নতুন কোনও গাছ বসানো হয়নি। এখন পাখিরাই বাগান করছে। ঠোঁটে করে বীজ এনে ফেলে। অনেক সময় পক্ষীকুত্যের সঙ্গে দুচারটে বদহজমের মাল বেরিয়ে আসে। জমির স্বাভাবিক ধর্মে দু' একটি নতুন গাছ গজিয়ে ওঠে। ওইভাবে বেশ ঝাঁকড়া একটি ফলসা গাছ হয়েছে। মোরগ ফুল হয়েছে। একটা জাম গাছ হয়েছে। জাম মনে হয় পাখিতে করেনি। কোনও লিভারঅলা কুকুরেও করতে পারে, অথবা হনুমানে।

সে যাই হোক। এবার মহিলার একটু বর্ণনা দেওয়া যাক। কারণ, এই কাহিনীর তিনিই হলেন নায়িকা। এককথায় বলা চলে, একটু চেষ্টা করলে তিনি নির্বাচনে জিতে সহজেই স্বাস্থ্যমন্ত্রী হতে পারতেন। আর হলে, আমাদের দেশের হাসপাতালে এই অব্যবস্থা চলতে পারত না। চাবকে ঠাণ্ডা করে দিতেন। দেশের দুর্ভাগ্য, এমন একটি প্রতিভা গৃহকূপে ছাই চাপা হয়ে আছে।

চেহারায় বেশ একটা কম্যাণ্ডার কম্যাণ্ডার ভাব আছে। হিটলার বেঁচে থাকলে ধরে নিয়ে গিয়ে মহিলা গেস্টাপো করে রাইনল্যাণ্ডে ছেড়ে দিতেন। এঁর সমস্ত কথাবার্তাই যেন মিলিটারি কম্যাণ্ডের মত। অ্যায় বললে জগৎ থমকে দাঁড়ায়। দেয়ালঘড়ি বন্ধ হয়ে যায়, এ আমার নিজের দেখা। টুলে উঠে পেণ্ডুলাম ঠেলতে হয়। রেডিওর গান থেমে যায়। শিল্পী বলে ওঠেন একটু আস্তে ম্যাডাম। আমি স্পষ্ট শুনেছি। প্রথমদিকে আমার সঙ্গে মাঝরাতে যখন দুচারটে প্রেমের কথা হত, পরের দিন সকালে প্রতিবেশীরা আমাকে দেখে মুচকি মুচকি হাসতেন। কেন হাসছেন, বুঝতে পারতুম না। একদিন পাশের বাড়ির রসিক বউদি বললেন, কি ঠাকুরপো, কাল লুকিয়ে লুকিয়ে খুব কাটলেট খাওয়া হয়েছিল ?

কি করে বুঝলেন ?

রাত আড়াইটের সময় ঘুম ভেঙে গেল। শুনলুম, আপনার স্ত্রী বলছেন, সরে শোও, তোমার মুখে ভক ভক করছে পেঁয়াজের গন্ধ। এবার থেকে বাইরে কিছু খেলে, একটা করে বড় এলাচ খাবেন। পেঁয়াজের মুখে হাম খেলে প্রেম কেঁচে যায়। জর্দা দিয়ে পানও খেতে পারেন। প্রেমিকারা প্রাণের দায়ে সহ্য করলেও, স্ত্রীদের করা উচিত নয়।

সেই দিন বুঝেছিলুম, জীবনের অনেক কথাই গলার গুণে লিক করে বসে আছে। একদিন মাঝরাতে ভীষণ মেঘ করে ঝোড়ো বাতাস বইছিল। উঠো-উঠো, ঝড় উঠেছে, বলে কম্বুকণ্ঠে এমন একটি হাঁক

ছাড়লেন, যেন কুরুক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে ম্যাডাম কৃষ্ণ পাঞ্চজন্য বাজাচ্ছেন। সারা জনপদ জেগে উঠে চিৎকার করতে লাগল, কি হয়েছে, কি হয়েছে? 'জানালা বন্ধ করে পাখাটা খুলে দাও,' বলে তিনি পাশ ফিরে শুয়ে পড়লেন।

এ সবই তাঁর চরিত্রের গুণ। ঈশ্বর বেশ বড়সড় কিছু একটা করতে চেয়েছিলেন, প্রোডাকসান লাইন থেকে মাল হাত ফসকে মহিলা হয়ে বেরিয়ে এসেছে। বাড়িতে একবার চোর পড়েছিল। চোরের আর দোষ কি। অসময়ে বাড়ি বাড়ি ঢোকাই তার ব্যবসা।

চোর দিয়েই শুরু করা যাক।

চোরদের নিয়ম হল, চুরি করার আগে বাড়ির চৌহদ্দিতে একটু বড় বাইরে করা। ঠিকমত হলে বুঝতে হবে নার্ভ ঠিক আছে। এইবার পাইপ বেয়ে ওঠো, কি তালা ভাঙো অথবা গ্রিল ওপড়াও। হাত-পা কাঁপবে না, দিল হেলবে না। নিজের ওপর নিজের কনট্রোল।

আমার স্বভাব হল জেগে আছি তো বেশ আছি। একবার শুয়ে পড়লে মড়া। তখন জাগাতে হলে ঢাক ঢোল বাজাতে হবে। কিংবা ঠ্যাং ধরে খাট থেকে ফেলে দিতে হবে। কখন চোর ঢুকেছে জানি না। কিভাবে ঢুকেছে তাও জানি না। শুনেছি খোলা জানালা দিয়ে চোরেরা প্রথম গাঁজাপক্ক বিড়ির ধোঁয়া ছাড়ে। তাতে গেরস্থর ঘুম বেশ পেকে ওঠে। তার মানে আমার পাকা ঘুম আরও পাকা হয়েছিল।

আমার যখন ঘুম ভাঙল, চোর তখন মহিলার খপ্পরে। আমাদের একটা বাঘা কুকুর আছে। তার হাঁকডাকও পালিকার কনট্রোলে। যখন ডাকের দরকার নেই, তখন তাকে ঘুমের বড়ি খাওয়ানো হয়। বাঘা তখন হাত-পা ছড়িয়ে ভোঁস ভোঁস ঘুমোয়। নেশা কেটে গেলে ওঠে, উঠে ভুক্ ভুক্ ডাক ছাড়ে। তখন তার জন্যে বিস্কুট আসে, দুধ আসে। তার খাতিরই আলাদা। সংসারে তার যত্ন আমার চেয়েও বেশি। হিংসে হয়। হলে কি করব। সে কুকুর। পেয়ারের

কুকুর। আমি মানুষ। হতচ্ছেদার স্বামী। না মরলে আমার কদর হবে না। মরে যেদিন ছবি হয়ে ঝুলব, সেইদিনই হয়তো প্রাপ্য সম্মান পাব। দু ফোঁটা অশ্রুজল। তখন আমি গাইব, জীবনে যারে তুমি দাওনি চা-বিস্কুট, মরণে কেন তারে দিতে এলে মশামারা ধূপ। শুনতে পাবে না। না শোনাই ভালো। শুনলেই তেড়েফুঁড়ে উঠবে, কি বললে? ভুলেই যাবে, আমি মরে ভূত হয়েছি।

না, অন্য প্রসঙ্গে সরে যাচ্ছি। এসব হল পুরুষ মানুষের অভিমানের কথা। পুরুষ বললে প্রতিবাদের ঝড় বইবে। এ হল খোকাপুরুষ। কুকুরের কথায় ফিরে আসা যাক। কুকুর এমন ট্রেনিং পেয়েছে, আমাকেও ধমকায়। মহিলার ওপর হয়তো একটু হম্বিতম্বি করে ফেলেছি, কুকুর অমনি প্রতিপক্ষের গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে গরর্ গরর্ করে জানান দিলে, বেশি বাড়াবাড়ি করেছ কি, খ্যাক। আধপো মাংস নিয়ে নেমে যাব। সেই সময় স্ত্রী যদি আমার মাথার পেছনে সোহাগের হাত না রাখে, সারাদিন আমাকে এক জায়গায় স্ট্যাচু হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। নড়াচড়া করলেই কুকুর গরগর করবে। আচ্ছা দাওয়াই পাকড়েছে যা হোক। দাম্পত্য কলহের পরিণতি, আমার করুণ মিনতি, ওগো আর করব না, এই নজরবন্দী অবস্থা থেকে আমাকে মুক্ত কর্ মা এলোকেশী, ভবে যন্ত্রণা পাই দিবানিশি।

কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙাবার নানারকম ব্যবস্থা ছিল। কুকুরের ঘুম ভাঙাবার ব্যবস্থা খুব সহজ। নাকের কালো অংশে একটু কাঁচা লঙ্কার রস। সেই পদ্ধতিতেই কুকুরকে জাগানো হয়েছে। চোর ঢুকেছিল খাবার ঘরে। বাসনকোসনের লোভে। বাইরে থেকে শেকল তুলে তাকে বন্দী করা হয়েছে। জানালা দিয়ে কথাবার্তা চলছে। মহিলা হাতে একটা খেঁটে লাঠি নিয়ে জানালার বাইরে। চোর ঘরের মেঝেতে উবু। বাঘা সামনের দুটো পা জানালার গ্রিলে তুলে দিয়ে ফোঁস ফোঁস করছে। এবার কি হবে বাছাধন। চোর আমাদের

পরিচিত। তার নাম সোনা। সোনার চাঁদ ছেলে। সকালে খুব টেরি বাগিয়ে ঘোরে।

সেই চোর ঘর থেকে বেরিয়ে এলো নাকখত দিতে দিতে। কোমরে দড়ি বাঁধা হল। এমন বুদ্ধি আমার মাথায় আসত না। মহিলা বললেন, বল কোথায় কি করেছিস ?

কেঁদে বললে, পাতকোতলায়।

সেই মাল নিজে হাতে তুলে পরিষ্কার করতে হল। তারপর ঝাঁটা আর ফিনাইল। ভোর হয়ে এল। নিষ্কৃতি পাওয়া অত সহজ নয়। বেলা বারোটা অবধি চোর বাঁধা রইল বারান্দার থামে, বাঘার পাহারায়। জনে জনে আসে আর ত্থাখে। ওমা ! এ যে আমাদের সোনা !

মহিলা সোনাকে একটি সাইকেল রিকশা কিনে দিয়েছেন। সোনা এখন রিকশা চালায়। রোজ তিন টাকা জমা দিয়ে যায়। আর মালকানকে হিঁয়া হুঁয়া ঘোরায়। সে বেচারা চোর থেকে সাধু হয়ে বেগার খেটে মরে। বেলা দেড়টার সময় কটকটে রোদে লাইন দিয়ে ম্যাটিনি শোয়ের টিকিট কেটে এনে মহিলা দারোগাকে সন্তুষ্ট রাখে। যিনি সোনার মত পাকা চোরকে কলুর বলদের মত নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাতে পারেন, তাঁর যে অসীম ক্ষমতা এ-কথা রাষ্ট্রপতিও মানবেন।

একবার হাত খুলে গেলে তাকে আর পায় কে।

ফুলগাছের কিছু অংশ পাঁচিলের বাইরে যাবেই। রাজা ক্যানি-উটও শাসনে রাখতে পারবেন না। ভোরের দিকে সাজি হাতে বাচ্চা একটি মেয়ে, সবে একটা ডাল ধরে টান মেরেছে, মালকান পাঁচিলের এপাশ থেকে আদুরে গলায় বললেন, কি রে, ফুল নিবি বুঝি ?

আদরে গলে গিয়ে মেয়েটি বললে, হ্যাঁ মাসিমা।

আয় ভেতরে আয়।

আমি ভাবছি, বাবা, শরীরে বাতের মত হঠাৎ এত দয়া হলো কোথা থেকে। গাঁটে গাঁটে দয়া। মুখে টুথব্রাশ। সান্টাক্রুজের

গোঁফের মত চারপাশে পেস্টের ফেনা ! মেয়েটি হাসিমুখে ভেতরে এসে দাঁড়াল। ফুল চুরি করতে গিয়ে এমন অভ্যর্থনা সে কোথাও পায়নি।

দে, সাজিটা দে। মহিলা বাঁ হাতে সাজিটা নিয়ে ভেতরে চলে গেলেন। ফিরে এলেন এক কুলো র‍্যাশানের চাল নিয়ে।

আয়, এই বকে বোস।

মেয়েটি অবাক হয়ে বললে, বোসবো কেন মাসিমা ? আপনি যে বললেন, ফুল দেবেন, চাল দিচ্ছেন কেন ?

চাল দেবো কেন ? চাল ক'টা এখানে বসে বেছে দে। তারপর ফুল পাবি।

মেয়েটি কাঁদো কাঁদো মুখে বললে, আমার ফুল চাই না মাসিমা ! সাজিটা ফেরত দিন।

মাসিমা উত্তরে চ্যাপ, বলে অ্যায়সা এক ধমক দিলেন। বোস এখানে. চাল বাছ, তবে সাজি পাবি।

বেচারার কি গেরো। খোল নলছে তুই-ই গেল। করুণ মুখ দেখে আমি একটু সালিশি করতে গিয়ে এক ধমক খেলুম, তুমি চুপ করো। তোমার চরকায় তেল দাও, আমাদের ব্যাপারে নাক গলাতে এসো না।

মেয়েটির মাথায় হাত বুলিয়ে বেশ মিহি সুরে বললেন, কতক্ষণ আর লাগবে, টুকটুক করে বেছে ফেল, এক সাজি ফুল পাবি।

ঘণ্টাখানেক লাগল সেই চাল বাছতে। তারপর হুকুম হল, নে, সব গাছে উঠে এক সাজি ফুল পাড়। সেই ফুল তিন ভাগ কর। এক ভাগ আমার, এক ভাগ তোর, আর এক ভাগ কালীবাড়িতে দিয়ে আসবি।

কালীবাড়ি যে অনেক দূরে মাসিমা। দেরি হয়ে যাবে। আমার মা বকবে !

চুউপ। একটা কথা নয়। যা বলছি তাই শুনবি। তা না হলে

সাজি কেড়ে রেখে দোব, কুকুর লেলিয়ে দোব। পাঁচিলের বাইরে লকলক করে দুলছে ফুলগাছের ডাল। বড়ই লোভনীয়। তবে হাত দিয়েছ কি মরেছ। এক-একটি অক্টোপাশের শুঁড়। ভোরের বাগানে অক্টোপাশ চটি পায়ে ঘুরছেন। মুখে টুথব্রাশ। ডাল ধরে কেউ না কেউ টানবেই আর সঙ্গে সঙ্গে জড়িয়ে যাবে সেপটোপাসের জালে। বাছো এক কুলো চাল, তবেই মিলবে একমুঠো ফুল, নয় তো সাজিটাও যাবে।

আমাদের বাড়িতে তিন-চারটে জলের কল। একটা কল কুয়োতলায়, সেখানে দুটো চৌবাচ্চা। একটা বিরাট আর একটা মাঝারি। লোডশেডিং-এর পর প্রথম যে জল আসে সেটা টালার মিষ্টি জল। মিনিট পনের থাকে। তারপরেই আসে ডিপটিউবওয়েলের কষা জল। এই মিষ্টি জল নেবার জন্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। বালতি, ডেকচি, গামলি নিয়ে যত কুঁচো-কাঁচা ঢুকে পড়ে বাড়িতে।

এই জল হল বেগার ধরার ফাঁদ। দৃশ্যটি বড়ই মনোরম। ফাঁদে এক সঙ্গে এত শিকার? মাকড়সার প্রাণ নেচে ওঠে। খেলা শুরু হয় বালতি ভরে ওঠার পর। জল-টলটলে বালতিটি তুলে নিয়ে সরে পড়ার তালে ছিল একটি কিশোর। ঘাড়ে যেন বাঘ পড়ল।

জগো, বালতি রাখ। চৌবাচ্চা দুটোর ফুটো খুলে সব জল বের করে দে।

জগো ভাবলে, বাঃ, এ বেশ খেলা! কলকল জল বেরচ্ছে। চৌবাচ্চা খালি হচ্ছে। জানা ছিল না ওস্তাদের মার শেষ রাত্তিরে। এই এতখানি একটা বুরুশ হাতে মালকান এসে সামনে দাঁড়ালেন, কোমর বেঁধে, নে, এইবার ঘসে ঘসে ভেতরের শ্যাওলা পরিষ্কার কর।

জগোর চক্ষু চড়কগাছ, ও ঠাম্মা, এ আমি পারব না।

তোর ঘাড় পারবে। জল নেবার সময় মনে থাকে না। পরিষ্কার করলে তবেই জলের বালতি নিয়ে যেতে দোব।

এক ঘণ্টা লাগল জগোর চৌবাচ্চা সাফ করতে। তাতেও নিষ্কৃতি নেই। হুকুম হল, ভালো করে ফুটো বন্ধ করে পাইপ লাগা। চৌবাচ্চায় পাইপ লাগাবে কি, ঘসে ঘসে জগোর নড়া ছিঁড়ে গেছে। তার নাকে অকসিজেনের নল গুঁজতে পারলে ভাল হয়। জগোর সঙ্গে জল নিতে এসে ফাঁদে পড়েছে উমা। সে আর একপাশে চিঁচিঁ করছে। বাজার থেকে চুনো মাছ এনেছিলুম। বঁটি, ছাই আর চুনো মাছ নিয়ে সে বসে আছে ছলছলে চোখে। ওই মাছ শেষ করে উঠলে তবে সে জলের গামলা তুলে নেবার ছাড়পত্র পাবে।

সামনের রাস্তা দিয়ে সনাতন চলেছে নেচে নেচে। এই শোন্, কোথায় যাচ্ছিস ?

পাশের একটা ছোট কারখানায় সনাতন কাজ করে। কারখানার কি একটা কিনতে বাজারে ছুটছিল। হাতে লোহালক্কড়। ছেলেটা সব সময় হাসে। হাসতে হাসতে পাঁচিলের পাশে এসে বললে, বাজার যাচ্চি মাসিমা।

তোর ওই সব লোহালকড় রাখ এখানে।

কেন মাসিমা ?

এই নে কেরোসিনের টিন আর টাকা। ওদের দোকানে তেল দিচ্ছে। এনে দে পাঁচ লিটার।

আমি কারখানার কাজে যাচ্ছি যে।

গোলি মার তোর কাজে। এক ফোঁটা তেল নেই বাড়িতে। আমরা কি অন্ধকারে থাকব !

বিরাট লাইন মাসিমা। আমি পরে এনে দোব।

হ্যাঁ, তেল তোমার জন্যে বসে থাকবে।

এখন আমি পারব না।

ঠিক আছে মনে থাকে যেন। আজ বাদ কাল শনিবার, তুমি টিভি দেখতে এসো। সরস্বতী পুজোর সময় লাইটের কানেকসান চেয়ো, তখন ভাল করে দোব।

কুইনিন খাবার মত মুখ করে সনাতন ছুটলো তেল আনতে।

ইতিমধ্যে গৌর পালাচ্ছিল পাশ দিয়ে। সেও ফাঁদে পড়ে গেল। তার ঘাড়ে চাপল র‍্যাশান। গুঁইগাঁই করছিল। যেই শুনলে, আমাদের ছেড়ে-দেওয়া পামতেল ভবিষ্যতে আর পাবে না, ঘাড় হেঁট করে ছুটল র‍্যাশান তুলতে। মাঝে মাঝে আমরা চাল গম আর তেল ছেড়ে দি। গৌরের মা সেই সব পায়। গৌরের টিকি তাই মহিলার হাতে। টানলেই মাথা চলে আসে।

দাদারও দাদা আছে। এমন চেলা আছে যে গুরুকে চা বাগানে বেচে দিয়ে আসতে পারে। ক'দিন থেকেই লক্ষ করছি মহিলার দাপট যেন একটু কমে এসেছে। সামান্য উদাস উদাস ভাব। মাঝে মাঝেই পাঁচিলের ধারে গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন। গলা তুলে তুলে কাকে যেন খুঁজছেন। যৌবন উতরে গেল, এ বয়েস তো প্রেমে পড়ার নয়। বলা যায় না, পরকীয়া কখন কিভাবে এসে পড়ে। যদি আসে মন্দ হয় না। কেউ ইলোপ করে নিয়ে চলে যায়, দিনকতক একটু শান্তিতে থাকা যায়।

পাঁচিলের কাছ থেকে হতাশ হয়ে ফিরে আসছেন, মুখে চুকচুক শব্দ। একেবারে আমার মুখোমুখি।

কি হল ম্যাডাম?

থাক আর রসিকতা করতে হবে না। আমার বলে নিজের ঘায়ে কুকুর পাগল অবস্থা!

কেন, কি হল?

সনাতনকে ক'দিন হল দেখতে পাচ্ছি না।

তেল ফুরিয়েছে বুঝি?

তেল ফুরোলে তো বুঝতুম, আমাদের প্রেসার কুকারটা সারিয়ে আনতে বলেছিলুম! সেই যে নিয়ে গেল, আজ সাতদিন হয় গেল টিকির দেখা নেই। এদিকে একটা গুজব শুনছি, সত্যি-মিথ্যে জানি না।

কি গুজব ? ছেলেধরার !

আরে ধুর, ও দামড়াকে কে ধরবে ! শুনছি, ওই নাকি একটা মেয়েকে ধরে নিয়ে পালিয়েছে।

সে কি গো, একটা প্রেসার কুকারের যে এখন অনেক দাম।

তাই তো রাগে নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করছে। তুমিও একটু সন্ধান করো না। ধরতে পারলে বাপের নাম ভুলিয়ে দোব।

এ পাড়ার দুজন মানুষ এখন হন্যে হয়ে দুটো জিনিস খুঁজে বেড়াচ্ছে। একজন তালাশ করেছেন তাঁর একমাত্র মেয়ের। আর একজন সন্ধান করছেন প্রেসার কুকারের। সংসার বড় মিইয়ে পড়েছে। 'জোড়া হিস্ না হলে তেমন জমে না। প্রেসারেরও মেল-ফিমেল আছে। মেলটা গেছে, ফিমেল তাই বড় মন-মরা। এই বিরহে আমি কিন্তু বড় মধুর আছি।

সাত টাকা বারো আনা

বেশ পাকা পকেটমাররাই মৃত্যুর পর আমাদের স্ত্রী হয়ে জন্মায়। এই মহাসত্য আমার অজানাই থেকে যেত যদি না আমি বিবাহ করতুম। এর মধ্যে আবার আর একটি সত্য আছে। সেটাও আমার আবিষ্কার। পেনিসিলিন আবিষ্কারের মতই আকস্মিক। অথচ সাংঘাতিক। বেদান্ত বলেছেন সত্য গুহায় গা ঢাকা দিয়ে থাকে। হামাগুড়ি দিয়ে বের করে আনতে হয়। যে স্বামী নাড়ুগোপালের মত হামা দিয়ে প্রাক-বিবাহ পর্বে স্ত্রীরূপী নাড়ুটিকে ধরার চেষ্টা করেছিলেন, তাঁরই এই ফাউ সত্যটি লাভ হয়। কি সেই সত্য। প্রেমিকা যদি স্ত্রী হয়ে জীবন-আঙিনায় নৃত্য করতে আসেন, তাহলে তিনি তো নেত্যকালী হবেনই, সেই সঙ্গে 'গোদের ওপর বিষফোঁড়া'র মত শুধু পকেটমার নন, চোরও হবেন। অনেকটা অ্যালসেসিয়ান চোরের মত। অ্যালসেসিয়ান চোর জিনিসটা কি? একটু ব্যাখার দরকার। ছিঁচকে চোর আছে, সিঁদেল চোর আছে, যে বস্তুটি বলছি সেটি কি? অ্যালসেসিয়ানের ঘ্রাণ আর শ্রবণশক্তি খুব প্রখর এবং বিশ্বস্ত। সেই অ্যালসেসিয়ান যদি চোর হয় তাহলে প্রেম করে বিয়ে করা বউয়ের মত হবে। এমন বউয়ের ঘ্রাণেন্দ্রিয় আর শ্রবণেন্দ্রিয় বড় সাংঘাতিক।

বুক পকেটে সাত টাকা আর পাশ পকেটে বারো আনা। জামা ঝুলছে হ্যাঙারে। সংসার খরচের টাকা, আলুকাবলি, ঘুগনি, ফুচকা খাবার টাকা, সিনেমা দেখার টাকা, সবই সেই মহীয়সীর হাতে জমা করে দিয়ে অবশিষ্ট কয়েকটি টাকায় লেংচে লেংচে আমার মাস চলে। লোকলৌকিকতা হলে সেই অর্থেও সংসার থাবলা মারে।

তখন টিফিনে মুড়ি আর গুটিকয়েক বাদামদানা খেয়ে দিন চালাতে হয়। প্রেমের তুফানে অর্থনীতির নৌকোর তলা ফেঁসে গেছে। মনকে বোঝাই, ওরে মন, পস্তাও মাৎ, প্রেম বড় পবিত্র মাল। লায়লা-মজনুর কথাই স্মরণ কর। রামী-চণ্ডীদাসের কথা ভাব। বিল্বমঙ্গলের উদ্দেশে প্রণাম কর। প্রেম যুগে যুগে। পচা বাদাম চিবিয়ে মুখের বারোটা বেজে গেছে। কুছ পরোয়া নেহি। অধরসুধা পানে চাঙ্গা হয়ে যাবে।

অফিসবারে সকালের দিকেই যত ফ্যাঁকড়া বেরবে। হঠাৎ জগন্নাথবাবু আসবেন। বললেন,, আচ্ছা মশাই সিমেন্ট ডিপার্টমেন্টে আপনার কেউ জানাশোনা আছে? নেই। হেলথ ডিপার্টমেন্টে? তাও নেই! মোটর ভেহিকলস্? তাও নেই! কি আছে আপনার? খালি আপনি আছেন আর আপনার ছায়া আছে? সমাজের কোনও কাজেই লাগবেন না? সমাজবন্ধু হতে পারেন না? ওয়ার্থলেস বাঙালী।

অথবা কাকে স্টেনলেস স্টিলের চামচে ঠোঁটে করে নিয়ে নিম গাছের বাসায় গিয়ে ছেলেকে পুডিং খাওয়াচ্ছে। একটু পেড়ে এনে দাও না গো। জীবনে যে টুলে উঠে বাল্‌ব পরাতে গিয়ে মাথা ঘুরে পড়ে যাবার ভয়ে মরে, সে উঠবে নিম গাছে! বলো কি ম্যাডাম! আহা তুমি উঠবে কেন? রকে গোবিন্দ বসে আছে। তাকে গোটা দুই টাকা দিলেই পেড়ে এনে দেবে।

বারো আনা দামের চামচের জন্যে দু'টাকা খরচ।

তা তো বলবেই। তুমি যে সোনার চামচে মুখে দিয়ে জন্মেছিলে! আমি বলে কত কষ্ট করে পাঁচ কেজি কাপড় কাচার গুঁড়ো কিনে চামচেটা ফিরি পেয়েছিলুম। সুন্দর চামচে! আমার চামচে!

তোমার চামচে তো কি হয়েছে। ওটা তো নেতার চামচে নয়, যে কাকে নিয়ে গেছে বলে, চলবে না, চলবে না করার লোক কমে যাবে।

মাদ্রাজী মহিলা হলে আমি তোমাকে আজই তালাক দিতুম।

জান কি, তাদের স্টেনলেস স্টিলের প্রাণ। কিংবা, আমার সেই প্রেমাঙ্গিনী বাথরুম থেকে বিকচ্ছ অবস্থায় বেরিয়ে এলেন, ওগো শুনছ!

একি? তুমি যে হিন্দী ছবির নায়িকা হয়ে আছ, একেবারে সত্যম শিবম সুন্দরম্। সেনসার না কেটে ছেড়ে দিলে কি করে? এখুনি সামনের আসনের দর্শকরা যে সিটি মারবে!

আঃ রসিকতা রাখ। কি হবে?

হাউসফুল হবে।

রসিকতা কোরো না। সর্বনাশ হয়ে গেছে, আমার আঙুল থেকে এক ভরির আঙটিটা সিলিপ করে প্যানে পড়ে গেছে।

বাঁচা গেছে।

ওমা সে কি! আমার বিয়ের আঙটি! একবার দেখ না, হরিয়াকে যদি ধরতে পার। হাত ঢুকিয়ে বের করে এনে দিতে পারে কিনা দেখুক।

আজ সেই রকম একটা দিন। শ্যালক আসছেন শোলাপুর থেকে। তিনি চিংড়ির মালাইকারি ছাড়া আর কিছু খান না। ক্ষীর সহযোগে খানছয়েক ফুলকো লুচি চলতে পারে। আর নতুন ফুলকপি উঠেছে। ভাপিয়ে দিলে চেষ্টা করে দেখতে পারেন। শ্যালকের মালমশলা জোগাড় করতে গিয়ে ঘড়ির কাঁটা ঝুলে গেল। তেড়েফুঁড়ে রাস্তায় বেরোতেই পিতার বয়সী শশাঙ্কবাবু গুপ্ত প্রেস আর বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত নিয়ে এক কূটকচালে প্রশ্ন করে বসলেন। গাদি খেলার কায়দায় ঝুল কেটে পালাতে চাইছি। পথ পাচ্ছি না। সাবেক কালের মানুষ, আমার চেয়ে ভালো খেলেন। কিছুতেই ঘর ছেড়ে বেরোতে দিচ্ছেন না।

মুক্তি যখন পেলুম, তখন আর বাসে যাবার সময় নেই। এদিকে আজই ইনকাম ট্যাক্সের হিয়ারিং-এর দিন। অনেক চেষ্টায় একটা ট্যাকসি ধরে ফেললুম। আগে চাকরি, পরে খরচের হিসেব।

গাড়িতে উঠেই মনে পড়ল, পকেটে পড়ে আছে সাত টাকা বারো আনা। সাত টাকা বারো আনায় চার চাকায় চাপা যায় না। ঝাঁকামুটের চার্জও অনেক বেশি।

গাড়ি ঘুরিয়ে আবার বাড়ি ফিরে এলুম। গোটা পঞ্চাশ টাকা পকেটে রাখা উচিত। যেতে হবে বাম্বুভিলা! সেখানেও কিছু পূজা-অর্চনা আছে। আসতে আসতে পকেটটা একবার চেক করার ইচ্ছে হল। সাত টাকা আছে না গেছে। বুকপকেটটাকে আমি ইচ্ছে করেই হরেক রকম কাগজে ঠেসে রাখি। একে বলে 'অ্যান্টি-পকেটমার ডিভাইস।' টুক করে টাকা তুলে নোব, তা হবে না। বিশল্যকরণীর সন্ধানে জাম্বুমানের মত গন্ধমাদন ঘাড়ে করতে হবে। স্ত্রী মোরে করিয়াছে জ্ঞানী।

লণ্ড্রির বিল বেরুচ্ছে, র‍্যাশানের ক্যাশমেমো, কোষ্ঠীর ছক; বাজারের হিসেবে, যাবতীয় ভেজাল সবই ঠিকঠাক বুক পকেটে বহাল, টাকা সাতটাই নেই। সর্বনাশ! পাশ পকেটেও তেমন ঝঙ্কার উঠছে না। আধুলি আর সিকি সরব দম্পতির মত সাড়া দিচ্ছে না। সিকি আধুলিকে ছেড়ে বাপের বাড়ি চলে গেছে! তার মানে পঞ্চাশ পয়সা নিয়ে কলকাতা শহরকে চ্যালেঞ্জ জানাতে বেরিয়েছিলুম। আমি কি নাগা সন্ন্যাসী। কুম্ভমেলায় নাঙ্গা হয়ে ঘুরে বেড়াব। মেজাজের এই অবস্থাকেই বলে, বাবু একেবারে ফায়ার।

যে কেশদামে একদা হাত বোলাতে বোলাতে বলতুম চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা, সেই কেশভারে তিনি চিরুনি চালাচ্ছিলেন বেশ আয়েস করে। আমাকে দেখেই ভূত দেখার মত চমকে উঠলেন, এ কি ফিরে এলে?

ক্রোধে কণ্ঠ রুদ্ধ। হুম করে গলা দিয়ে বাঘের মত গর্জন বেরুল।

কি, বড় বাইরে পেয়েছে!

মাঝে মাঝেই আমাকে অসময়ে নিম্নচাপে কাহিল হয়ে ফিরে

আসতে, হয় ঠিকই, তবে আজ যে অন্য কারণ। দাঁত চেপে বললুম আজ্ঞে না। সব ঝেড়ে ফাঁক করে দিয়েছ, তোমার কি কোন কালেই আক্কেল হবে না, বলতে কি হয় যে, তোমার পকেট সাফ করে দিয়েছি।

বাইরে ট্যাকসি দাঁড়িয়ে আছে, শোবার ঘরে ঢুকে গুপ্তধন খুঁজছি। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এক একদিন এক এক জায়গায় টাকা রাখি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রোমেলের ট্যাকটিস। একে বলে ম্যানুভার। যুদ্ধক্ষেত্রে আর সংসারে কোনও তফাত নেই। তিন পাট বিছানার যে-কোনও এক পাটে খামে ভরা গোটা কতক কুড়ি টাকার নোট থাকা উচিত। খাটের চার পাশ। চার পাশের কোন পাশে আছে? মাথার দিকে না পায়ের দিকে? ডান পাশে না বাঁ পাশে। প্রথম পাটে, না দ্বিতীয় পাটে, না তৃতীয় পাটে। সাত ঝামেলায় স্মৃতি এখন এতই বিপর্যস্ত, কিছুই মনে থাকে না। কোথায় টাকা রাখলুম ডায়েরিতে লিখে রাখতে হয়। কম্বিনেশান তালার কোডের মত। এক জায়গায় পর পর দুদিন তো আর রাখা যাবে না।

—কি খুঁজছ অমন হন্যে হয়ে, বল না। হয়ত সাহায্য করতে পারি।

—থাক তোমাকে আর সাহায্য করতে হবে না। যে ভালো করেছ কালী, আর ভালোতে কাজ নাই, তুমি এখন সরে পড়।

—বিছানাপত্তর অমন ওলট-পালট করছ কেন? বিছানায় ছারপোকা নেই।

—কি খুঁজছি তুমি ভালই জান। যদি সরিয়ে থাক, দয়া করে খামটা দিয়ে দাও। বাইরে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, দেরি হয়ে যাচ্ছে।

—মাইরি বলছি আমি নিইনি। আমি নিলে বলে নি।

ভাল মানুষের মত মুখ করে তিনি সরে পড়লেন। এখন ডায়েরি ভরসা। সাত তারিখে রেখেছিলুম মায়ের ছবির পেছনে। আট তারিখে বিভূতি গ্রন্থাবলীর তৃতীয় খণ্ডের আঠাশ পাতায়। ন'তারিখে দেরাজের তলায়। দশ তারিখে কাপড়ের আলমারির তৃতীয় তাকে হলদে শাড়ির ভাঁজে। মাঝে মাঝে শত্রুপক্ষের এলাকায় ঢুকতে হয়।

ভুলেও ভাবতে পারবে না, তস্করের ডেরায় মাল সাজানো। এগার তারিখে বাথরুমে সেভিংসেটের ভেতরে। বারো তারিখে পুরানো খবরের কাগজের গাদায়। তেরো তারিখে রেকর্ডপ্লেয়ারের স্পিকারের তলায়। কাল কোথায় রেখেছি। মরেছে, কোনও এনট্রি নেই।

সারা ঘর তোলপাড়। হিঁয়া কা মাল হুঁয়া। গাড়ি হর্ন দিয়ে অধৈর্য প্রকাশ করছে। এখন তিনিই ভরসা। আমারই টাকা আমাকে চাইতে হবে ভিখিরির মত। এখন আর খোঁজার সময় নেই। পরে এক জায়গায় চোখ বুজিয়ে বসে ধীরে ধীরে ভাবতে হবে। অফিস থেকে এলুম, জুতো খুললুম, অবিনাশ বাইরের ঘরে বসেছিল, তার সঙ্গে কথা বলতে বলতে লোডশেডিং। তারপর, তারপর কি হল! দেশলাই কোথায়, বাতি কোথায়? হই হই, রই রই। তারপর? আর মনে পড়ছে না।

হ্যাগা, কোথায় গেলে?

বলো, কি বলছ?

গোটা কুড়ি টাকা দেবে?

কোথায় পাব?

কোথায় পাব মানে! আজ তো সবে পনের তারিখ। সংসার খরচের টাকা নেই।

তোমাকে আমি টাকা দোব না। তুমি নিলে আর দিতে চাও না। শেষ মাসে বড় বিপদে পড়তে হয়। আগে দু'চার টাকা এদিক ওদিক থেকে সরাতুম, পুষিয়ে যেত। এখন কোথায় যে রাখ খুঁজে পাই না।

ও এখন আর সরাও না! আমার দু'টাকার নোটের বাণ্ডিল থেকে রোজই সরছে। জান কি, আমি নম্বর লিখে রাখি!

তোমার সন্দেহ বাতিক।

ও তাই নাকি। তাহলে সকালে সাত টাকা চার আনা সরল কি

করে। ক্লিন হ্যাপিস্‌। একবার বলার ভদ্রতাটাও হল না। পথে বেরিয়ে বিপদের একশেষ।

ভুলে গেছি। তুমি সব আনলে, একটু মিষ্টি আনলে না। ওই টাকায় মিষ্টি আসবে।

আবার হর্নের শব্দ। কি, টাকা তাহলে দেবে না?

দিতে পারি এক সর্তে।

ঘড়ি বাঁধা দিতে হবে?

ও তো তোমার ঘড়ি নয়। বাবার দেওয়া।

বেশ, তাহলে আমার বাবার দেওয়া এই সোনার তাবিজ।

ওসব তাবিজ-মাবিজ নয়, কথা দাও আজ রাতেই ফিরিয়ে দেবে। আজ নয় কাল, কাল নয় পরশু, তোমার ওই ন্যাজে খেলা চলবে না।

বেশ তাই হবে। ফিরে এলে কান ধরে আদায় করে নেবে।

ট্যাকসিচালক বললেন, কি মশাই ঘুমিয়ে পড়েছিলেন নাকি?

না, না, ঘুমবো কেন? টাকা খুঁজছিলুম। কোথায় যে রেখেছি কিছুতেই মনে করতে পারছি না।

আপনি ব্যাগ ব্যবহার করেন না?

না।

ভালই করেন। ব্যাগ মানেই পকেটমার। ও হবেই হবে।

আমার আবার দু-জায়গাতেই ভয়, ভেতরে বাইরে।

আরে মশাই, ভেতরের পকেটেই রাখুন, আর বাইরের পকেটেই রাখুন, পকেটমারের হাত থেকে রেহাই নেই। আমার বাড়িতেও পকেটমার হয়।

ছেলে বুঝি বড় হয়েছে। হিন্দী সিনেমা যতদিন না দেশ থেকে যাচ্ছে ততদিন বাপের পকেট গড়ের মাঠ হবেই।

ছেলে নয় মশাই, স্ত্রী। সবচেয়ে মারাত্মক জিনিস।

হ্যাঁ, তা যা বলেছেন। ওকেই বলে খাল কেটে কুমির আনা। আপনি আমার মত করতে পারেন।

কি বলুন তো ?

সেরেফ চোরের ওপর বাটপাড়ি

যেমন ?

আপনিও চুরি করে ফাঁক করে দিন।

ও বাব্বা, সে একবার দুবার চেষ্টা করে দেখেছি। কোথায় যে রাখে! রান্না ঘরে শ' খানেক কৌটো। কোন্‌টার মধ্যে যে মাল আছে, কে জানে ?

ওদের টাকা রাখার ফিকসড কতগুলো জায়গা আছে, যেমন মিটসেফ, চালের টিন। ছাড়া শাড়ির আঁচল। বালিশের খোল। একটু চেষ্টা করলেই সন্ধান পেয়ে যাবেন!

আমি তো খুচরো পয়সা কোনোদিন চোখেই দেখতে পাই না। এই আছে, এই নেই।

খুচরো বাড়িতে ঢোকাবেন না। শেষ নয়া পয়সা শেষ করে বাড়ি ঢুকবেন। অন্যের হাতে যাওয়ার চেয়ে নিজের হাতেই যাওয়া ভাল! খরচ করার আর কোনও রাস্তা না পেলে শেষ দশ পয়সায় একটা ওজন নেবেন।

সময়বিশেষে অন্যের কাছে নিজের স্ত্রীর নিন্দে করতে পারলে মনটা বেশ হালকা হয়ে যায়। সর্বক্ষণ আমার সেই এক কাজ, নিজেকে অনুসরণ করা। অবিনাশ। কথা বলতে বলতে লোডশেডিং। দেশলাই,বাতি, আমার জামা ছাড়া, তারপর পকেট থেকে টাকার খাম বের করে কোথায় যেন রাখলুম। কোথায় যেন রাখলুম। বাথরুমে ?

ইনকাম ট্যাকস অফিসার কি একটা প্রশ্ন করেছিলেন, খেয়াল করিনি। বেশ বিরক্ত হয়ে বললেন, কি মশাই ভাবসমাধি হয়ে গেল নাকি ?

কি বলতে কি বললুম। কোথায় রেখেছি বলুন তো ?

কি রেখেছেন ? কালো টাকা ? ধমকের সুর।

আজ্ঞে না, সাদা টাকা।

সাদা টাকা আর নেই। সবই কালো। কই দেখি, রেন্ট রিসিটটা দিন।

বাসুভিলা থেকে বেরিয়ে অফিসে আসার পথে চটির স্ট্র্যাপ ছিঁড়ে গেল। নাও, বোঝো ঠ্যালা। ট্যাক্সি ভাড়া মেটাবার পর পকেটে মাত্র ছটা টাকা পড়ে আছে। যাই হোক চটিটাকে টানতে টানতে এক মেরামতঅলার কাছে নিয়ে এলুম। আজকাল যা বাজার পড়েছে, দেড়টা টাকা খসে গেল। কোন কোন পেশায় মানুষের বিপদটাই হল মূলধন। চাপ দিয়ে রস বের করার মত নিঙড়ে টাকা বের করে নাও। ট্যাকসের ফাঁড়া কাটতে না কাটতেই আর এক ফাঁড়া। ছেঁড়া চটি। চটি সারাতে বিদ্যুৎ-চমকের মত পূর্ব রাতের স্মৃতি ফিরে এল। মনে পড়েছে, কোথায় রেখেছি টাকা। মোক্ষম জায়গা। কারুর বাবার ক্ষমতা নেই খুঁজে বের করে। আমার নিউকাট জুতোর শুকতলার ভেতরে এমন একটা জায়গা অন্য কারুর কল্পনায় আসবে না। যাক, এখন আমার কাজে মন আসবে। ঘিনঘিনে চিন্তাটা চলে গেল। সারা মাসের রসদ। হারালেই হাতে হারিকেন।

সন্ধের পরে নাচতে নাচতে বাড়ি ফিরে এলুম। আসতে আসতে ভাবছি, শ্যালক মহারাজ এতক্ষণে তোফা চিঁড়ে, বাদাম ভাজা খাচ্ছেন। একটু পরেই ফুলকো লুচি চিংড়ির মালাইকারি। কিন্তু কোথায় সেই দশাসই ঘরজোড়া নয়নলোভন, ব্যাঘ্রলালা-উৎপাদনকারী শ্যালক মহোদয়! আমার স্ত্রী রত্নটিই বা কোথায় গেলেন!

মানুর মা বললে, জামা কাপড় ছাড়ুন, চা করে দিচ্ছি।

ওরা কোথায় গেল?

বউদিরা দক্ষিণেশ্বরে গেছেন। বেলাবেলিই গেছেন। ফিরে আসার সময় হয়েছে।

যাক বাবা, ওরা আসার আগে গুপ্ত স্থান থেকে টাকাটা বের করে রাখি। দেখতে পেলে হাসাহাসি করবে। জুতোর র‍্যাকে ছেঁড়া

খোঁড়া জুতো, জুতোর বাকসের অভাব নেই। এক জোড়া বাইশ শো বাইশ হাফ-বুট শ্যালকের মতই খুশ মেজাজে বসে আছে। কিন্তু আমার নিউকাট-জোড়া কোথায়? জুতো কি মালিক ছাড়াই বেড়াতে বেরিয়ে গেল।

মান্নুর মা, এখানে আমার এক জোড়া জুতো ছিল, কোথায় গেল জান কি?

জুতো! মনে হয় দাদাবাবু প'রে গেলেন। বউদি আপনার ধুতি-পাঞ্জাবি বের করে দিলেন, তারপর জুতোটা পায়ে গলিয়ে দাদাবাবু বললেন, বেশ ফিট করেছে। বউদি বললেন, তাহলে ওইটাই প'রে চল। বেশ জামাই জামাই দেখাচ্ছে।

সে কি! জুতো আর চশমা, হ্যাঁ আর একটি বস্তু, স্ত্রী, যার যার, তার তার, এই রকমই তো শুনে এসেছি এতকাল। নয়া জমানায় স্ত্রী হাত-পালটাপালটি হয়, আজকাল হামেশাই হচ্ছে। জুতোটা ফিট করেছে বলে প'রে চলে গেল। যেমন বউ তার তেমনি ভাই। সব যেন গামছা হাতে জন্মেছে। গামছাবতার। লম্বা গলা দেখলেই লাগাও আর মারো টান। পঁয়তাল্লিশ টাকার জুতোর শুকতলায় পাঁচখানা কুড়ি টাকার নোট। জুতো ছেড়ে মন্দিরে ঢুকবে। জুতো-চোর মুখিয়ে থাকবে। ধর্মের স্থানেই যত অধার্মিকের উৎপাত। হয়ে গেল। একেই বলে গ্রহ। পেয়েও হারালুম।

সাতটা বাজল, সাড়ে সাতটা বাজল। খবর শেষ হয়ে গেল। তুই মালের তবু দেখা নেই। গেছে তো গেছেই। মান্নুর মা বসে বসে ঢুলছে। দুধ ওতলানোর মত একশো টাকার শোক মনে উতলে উতলে উঠছে। উদাসীনতার পাখার বাতাস মারছি। কিছুতেই কিছু হচ্ছে না।

পৌনে ন'টা নাগাদ গাড়ি থামার শব্দ হল! উৎকণ্ঠার শেষ সীমায় পৌঁছে গেছি। শ্যালকের জন্যে নয়, জুতোর জন্যেই উতলা হয়ে দরজা খুলে বাইরে ছুটে গেলুম। রোমান্সের সবুজ পাতা কবে

শুকিয়ে ঝরে গেছে জীবন-তরু থেকে। চলতে গেলে মচমচ শব্দ হয়! জীবনসঙ্গিনী না ফিরলেই সুখী হতুম। কেউ প'রে চলে যাক না। দিন কতক পরেই বাপ বাপ বলে ফিরিয়ে দিয়ে যাবে। আমার সেই জুতো-জোড়ার মত। পরলেই ফোসকা। ভেসলিন, গ্লিসারিন, তুলো, সব হার মেনে গেল। জুতোয় টক দই, কেরোসিন, স্বভাব আর কিছুতেই নরম হয় না। প্রেমের কোন লক্ষণই নেই। যে জগাই মাধাই, সেই জগাই মাধাই। দেখলেই কলসির কানা ছোঁড়ে। শেষে জুতো-বিশেষজ্ঞরা বললেন, ও মশাই খাঁটি গণ্ডারের চামড়া, কিছুতেই কিছু হবে না। পা গলিয়ে আর পিরিতের দরকার নেই। স্বভাব না যায় মলে। পরম ভট্টারকের জুতো করে তাকে তুলে রাখ। শান্তি পাবে। এক জোড়া চপ্পল কিনে নাও, আর লেংচে লেংচে চলতে হবে না। তোমার দুঃখে আমাদের বুক ফেটে ভেঙে যায় মা। জুতো তাকে তুলে রাখা যায়। বউকে তো আর তুলে রাখা যাবে না, ঠিক নেমে আসবে।

শ্যালক সূর্যবাবু নেমে আসছেন। আমার ধুতির ফুলপাড় কেমন ঝিলিক মারছে! আমার নজর পায়ের দিকে। যাক জুতো-জোড়া পায়েই আছে। শ্যালকের পেছনে পেছনে আমার সহধর্মিণী নামছেন। চলন-বলন দেখে মনে হচ্ছে, বেশ বল পেয়েছেন। এমনিই খুব বলবতী। যখন বলতে শুরু করেন তখন আর সহজে থামানো যায় না। এ তো আর প্রেস ফ্রীডাম নয়, যে অর্ডিনানস্ করে চেপে যাবে! এ হল নারী স্বাধীনতা, যার শুরু আছে, শেষ নেই। বাপের দেওয়া বাড়ির লোক পেয়ে আজ একটু বেশি খরখর করছেন।

গাড়ি থেকে মালপত্তর নামছে তো নামছেই। বাবা কত কি কিনেছে। সারা দক্ষিণেশ্বরটাই কিনে এনেছে। ক্লিং করে মিটার তুলে গাড়ি চলে গেল। অন্ধকারে এবার তেমন দেখতে পাচ্ছি না। শ্যালকের পায়ে সেই জুতো-জোড়াই তো?
সূর্যবাবু বললে, কি দেখছেন অমন করে! আপনার জুতো আমার

পায়ে দারুণ ফিট করেছে। সেম সাইজ। আপনি বাঁ দিকে কেতরে চলেন, আমিও বাঁ দিকে কেতরে চলি। আপনিও প্রেমিক, আমিও প্রেমিক। আপনি ফেঁসেছেন, আমি ফাঁসিনি।

স্ত্রী বললেন, ধরো, ধরো।

কাগজে মোড়া বেশ ভারী একটা কি হাতে এসে গেল। স্পর্শে মনে হচ্ছে, কাপ ডিশ। অনেক স্বামীই তোয়ালে জড়ানো ছেলে ধরে, বোকা বোকা মুখে স্ত্রীর পেছন পেছন সিনেমা হল থেকে বেরিয়ে আসেন। সামনে বেটার হাফ চলেছেন বুক ফুলিয়ে। বেশ মূল্যবান উপহার দিয়ে লোক যেভাবে বিয়ে বাড়িতে খাবার টেবিলের দিকে এগিয়ে যান। ইনিও সেই ভাবেই চলেছেন। আয়না নেই, থাকলে দেখতে পেতুম, আমাকেও নিদারুণ বুদ্ধুর মত দেখাচ্ছে। মন কেবলই উসখুস করছে, কখন তুমি জুতো-জোড়া খুলবে, আমি অমনি তাক বুঝে নোট ক'খানা বের করে নোব। পায়ের চাপে ভেপ্‌সে কি অবস্থা হয়েছে কে জানে!

খাবার টেবিলের ওপর একে একে কেনা জিনিস সাজাতে সাজাতে আমার শ্যালকের বোন বললেন, আজ একেবারে প্রাণ খুলে কিনেছি। তোমার সঙ্গে বেরলে কেনাকাটা করে তেমন সুখ হয় না। যা কিনতে যাব তুমি অমনি বলবে, উঁহু উঁহু, বাজে খরচ। এই দেখ কেমন কাপডিশ কিনেছি। পাথরের চাকি-বেলন। আঃ লুচি বেলেও সুখ। আজই উদ্বোধন হবে। এই নাও তোমার অ্যাশট্রে। আর এখানে সেখানে ছাই ফেলবে না। বুদ্ধমূর্তিটা দেখ, আহা, তুমি যদি ওই রকম শান্তশিষ্ট, ধ্যানস্থ হতে! সংসারের চেহারাই পাল্‌টে যেত। অমন গুলিখোরের মত মেজাজ করেছ কেন? বাইরে মনে হয় তোমার কোনও মেয়েছেলে আছে!

হ্যাঁ, এক মেয়েছেলেতেই চক্ষু চড়কগাছ!

আমার মত মেয়ে তুমি পাবে না গো! পড়তে অন্যের পাল্লায়, হৃদয়ে হাফশোল লাগাতে হত। এই দেখ, দু ডজন চুড়ি কিনেছি,

শাড়ির সঙ্গে রঙ মিলিয়ে। এবার যখন তোমার সঙ্গে সেজেগুজে বেরব না, তখন দেখবে, চড়চড় করে সকলের বুক ফাটবে। ফিস ফিস করে বলবে, ছ্যাখ, ছ্যাখ, বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা।

আমি বাঁদর !

মানুষের মত তো কিছুই দেখি না, সব সময় দাঁত খিঁচোচ্ছ।

স্বামীকে বাঁদর বললে কি হয় জান ?

নরকে যেতে হয়। তোমার সঙ্গে সংসার করার চেয়ে নরকে গিয়েও সুখ। তোমার ড্যাভোস আর খেতে পারি না। এই নাও তোমার ফুলদানি আর ধূপদানি। নাও হাত পাত। ভক্তিভরে মায়ের প্রসাদ খাও, মনে মনে বলো, মা আমার স্বভাবটা একটু ভাল করে দাও মা। বলো, আমি যেন একটা মানুষ হতে পারি। অমানুষ করে রেখেছ মা !

হাতের তালুতে গোল মত একটা প্যাঁড়া বসিয়ে দিয়ে, তিনি ছুট-পাট করে হেঁসেলে গিয়ে ঢুকলেন। আমার নয়, শ্যালকের বড় খিদে পেয়েছে।

শ্যালক সূর্যকান্তের জামা, কাপড়, জুতো ছাড়ার তেমন কোনও ইচ্ছেই দেখা যাচ্ছে না। এলিয়ে বসে আছেন সোফায়। বড় ক্লান্ত। মনটা বড় ছটফট করছে। জামা কাপড় না ছাড়ুক, জুতোটা অন্তত খোল ! তোমার পদতলে আমার অর্থ দলিত হচ্ছে।

সূর্য জামা-কাপড় ছেড়ে, পাজামা পরে, মুখে হাতে জল দিয়ে বেশ ফ্রেশ হয়ে বোসো না। ভাল লাগবে। সূর্যকান্ত ডান থেকে বাঁ পাশে এলিয়ে পড়ে বললেন, আপনি ব্যস্ত হবেন না জামাইবাবু। গেলুম ট্যাকসিতে, এলুম ট্যাকসিতে, কি আর এমন পরিশ্রম। আপনি ব্যস্ত হবেন না। এ তো আমার নিজের বাড়ির মত।

প্রথম দিনেই তোমার তা হলে বেশ চোট হয়ে গেল ! কি বল ?

এইভাবেই খেজুরে আলাপে মনটা ঘুরিয়ে রাখি ! কখন বাবু উঠবেন। কখন বাবু জুতো ছাড়বেন। বাবুই জানেন। বউয়ের

ভাইয়ের হালচালই আলাদা। জামাইয়ের চেয়ে আদর বেশি। একটু এদিক ওদিক হলেই কাঁধের ভূত কান ধরে মোচড় মারবে।

সূর্যকান্ত একগাল হেসে বললেন, আমার এক পয়সাও খরচ হয়নি। দিদি কার হাতে পড়েছে, দেখতে হবে তো! যেই টাকা বের করতে যাই, অমনি বলে, টাকার গরম তোর বউকে দেখাস।

মনে মনে বললুম, আচ্ছা, তাই নাকি? সখের প্রাণ গড়ের মাঠ। সারা মাসের সংসার খরচ হাওয়ায় উড়ছে! যত টানাটানি রোজ মাছের বেলায়, একটু এদিক-ওদিক খাওয়ার বেলায়।

হেঁসেল থেকে আদরের সুর ভেসে এল। সূর্য, জামাকাপড় ছেড়ে হাত মুখ ধুয়ে নে। গরম গরম ভাজছি। আমার জন্যে কোনও মধুর নির্দেশ এল না। আমি তো কাঙালি। খেতে বোস, না হাত ধুয়ে বসে আছি।

দেখতে দেখতে বেশ রাত হয়ে গেল। চারপাশ নিশুতি। বড় চাপ খাওয়া হয়ে গেল রে দিদি, বড় চাপ খাওয়া হয়ে গেল, বলতে বলতে, সূর্যকান্ত বেশ পরিতৃপ্ত বাঘের মত গোটা কতক হাই তুলে ফুলতোলা চাদরে লটকে পড়ল। বোন এলেন মশারি গুঁজতে! আমার ওপর হুকুম হল, ঘরের মশারিটা ফেলে ভাল করে গোঁজো, হাঁ করে বসে আছ কেন? দেখছ তো, আমি একটা কাজ করছি!

যো হুকুম! আমি তো আর তোমার শ্যালক নই!

দালানে ঘুটঘুট করে ঘড়ি চলছে। বাইরে সূর্যকান্তর নাক ডাকছে। আমার পাশে তার বোন যে ভাবে এলিয়ে আছে, মনে হচ্ছে জেগে নেই। এই তো সুযোগ। এই তো চোরেদের বেরবার সময়। যাই, নিজের টাকা নিজেই চুরি করে আনি।

ডান পাটির শুকতলা তুলে ফেললুম। ফাঁকা। তবে কি বাঁ পাটিতে। সে পাটিতেও বিধবার হাহাকার। ধাঃ, টাকা নেই। মহারাজ, হাঁড়ি খুলে দেখি মাংস নেই। মাঝরাতে পা ছড়িয়ে বসে

আছি, সামনে দুপাটি নিউকাট। পেছন থেকে কাঁধের ওপর দুটো হাত এসে পড়ল। কে রে বাবা, ভূত নাকি!

না, আমার সহধর্মিণী।

কি গো, মাঝরাতেই জুতো পালিশ করতে বসলে কেন?

ঘুম আসছে না। তাই ভাবলুম কাজটা একটু এগিয়ে রাখি। সকালে তো একেবারেই সময় পাওয়া যায় না। মনে হচ্ছে, যেতে আসতে সূর্য তো এই জুতোটাই পরবে। বলছিল, পায়ে বেশ ফিট করেছে।

দেখেছ, প্রসাদের কি গুণ! তুমি কি ভাল হয়ে গেছ গো, শোনো, বৃথাই খুঁজছ, মাল আর ওখানে নেই। কাপ, ডিশ, অ্যাশট্রে, চুড়ি হয়ে গেছে। এপিঠ ওপিঠ দু'পিঠ ট্যাকসি ভাড়া হয়েছে। গোটা পঁচিশ পড়ে আছে। কুড়ি টাকা আমার ধার শোধ। পাঁচ টাকা কাল সকালে তোমাকে দিয়ে দোব। জুতোর তলায় কেউ টাকা রাখে! ছিঃ! মা লক্ষ্মী। জুতোর তলায় চোরা চালানকারীরা সোনার বিস্কুট রাখে। চলো শোবে চলো। ঝাড়তে গিয়ে ভাগ্যিস দেখতে পেলুম।

তুমি জুতো ঝাড়তে গিয়ে, সারা মাসের হাত খরচ ঝেড়ে দিলে! আমার মাস চলবে কি করে?

ও তুমি ভেব না, যে খায় চিনি তারে জোগায় চিন্তামণি।

সূর্যর নাক গাঁক করে ডেকে উঠল।

আমি অদৃশ্য কাত্যায়নের দিকে কবজি তুলে ধরে মনে মনে বললুম, কাত্যায়ন নাড়িটা একবার দেখ তো, বেঁচে আছি না মরে গেছি!

আমার ভূত

আমার ছেলেকে আমি সায়েব বানাবো।

রঙে নয়। শিক্ষায়, দীক্ষায়, মেজাজে, সহবতে। আমি কালো। আমার ছেলে ঝুল-কালো। যখন হাসে, মনে হয় ভাল্লুকে শাঁকালু খাচ্ছে। বাপ হয়ে ছেলের সমালোচনা করা উচিত নয়। বউ ফর্সা, ছেলেটা এমন কেন আবলুস কাঠের মত হল? অভিজ্ঞরা বলেন, ভেব না, মেয়ে তোমার মেম হবে। ছেলেরা বাপের দিকে যায়, মেয়েরা মায়ের দিকে। কৃষ্ণ কালো, কোকিল কালো, কালো চোখের মণি! কালো জগৎ-আলো।

সায়ের পাড়ার ইস্কুলে ব্যাটাকে ভর্তি করতে হবে।

পয়সা যখন আছে, কেন করব না। কিন্তু পয়সায় তো আর নামকরা স্কুলের দরজা খুলবে না। সে অনেক হ্যাঁপা। শুনেছি, শিশু যখন মাতৃজঠরে ভ্রূণের আকারে গর্ভসলিলে হেঁটমুণ্ডু উর্ধ্বপুচ্ছ, তখনই নাকি ভাল স্কুলের ওয়েটিং লিস্টে নাম লেখাতে হয়। স্ত্রীর কানের কাছে চিৎকার করে ইংরেজি বই পড়তে হয়। পুরনো দিনের লেখকের লেখা চলবে না। হাল আমলের লেখক চাই। আমেরিকান লেখক হলে ভাল হয়। গোর ভাইডাল, সল বেলো, স্টেইনবেক। স্ত্রী ডাকলে হ্যাঁ বলা চলে না। বলতে হবে ইয়েস্! এমন কিছু বই পড়ে শোনাতে হবে যাতে ইয়াঙ্কি স্ল্যাং আছে। হ্যারলড্ রবিনস, হেডলি চেজ। এ সব করার উদ্দেশ্য, ভ্রূণের চারপাশে একটা ইংলিশ মিডিয়াম তৈরি করা। মানে বনেদটাকে বেশ শক্ত করে গেঁথে তোলা।

আমার শ্যালিকা এ সব ব্যাপারে ভারী এক্সপার্ট। আমার

বউয়ের মত গাঁইয়া নয়। বহুকাল আগেই চুলে তেল মাখা ছেড়েছে শ্যাম্পু করে করে চুলের চেহারা করেছে কি সুন্দর। ম্যারিলিন মনরোর মত। ফুরফুর করে হাওয়ায় উড়ছে। ঠোঁটে চকোলেট কলারের লিপস্টিক, তার ওপর লিপগ্লস। আজ পর্যন্ত, আমি একবারও ফ্যাকফ্যাকে ঠোঁট দেখিনি। অলওয়েজ স্মার্ট। চোখে ব্ল্যাক প্যান্থারের চোখের মত বিশাল এক গগলস। সেকস্‌কে সোচ্চার করে রেখেছে। শাড়ি পরার অসাধারণ কায়দা কোথা থেকে সে রপ্ত করেছে! যেমন কোমর, তেমনি তার কায়দার প্রদর্শনী। চীনে খাবার ছাড়া খায় না! মাঝে মধ্যে ফ্রাই খায়। স্যুপ দেখলে আমার বউয়ের মত 'মেগ্‌গে' করে ওঠে না। শুনেছি মাঝে-মধ্যে একটা দুটো বিড়ি-ফোঁকাও করে থাকে। নাইটি পরে শুতে যায়।

সেই মায়ের ছেলে পেট থেকে ড্যাডি ড্যাডি করে পড়বে, তাতে আর আশ্চর্যের কি আছে! শ্যালিকা বলে, সাজ-পোশাক, আহার-বিহারের ওপর মানুষের অনেক কিছু নির্ভর করে। বিকিনি পরলে বাঙালী মেয়েও, কিস মি কিস মি ডার্লিং বলে সি-বীচে ছুটতে থাকবে। শাড়ি পরলে, বলদ, গোয়াল, সাঁজালে, সিঁথির সিঁদুর, সন্ধের শাঁখ, এই সবই মনে আসবে। মনে আসবে ঘুঁটে, গোবর, গুল, গঙ্গাজল। দোজ ডেজ আর গন পাঁচু!

এখন বাইকের পেছনে বয় ফ্রেণ্ডের কোমর জড়িয়ে ধরে অফিসে যাবার যুগ পড়েছে। জীনসের পেছনে লেখা থাকে—Look here. সাঁঝের বেলায় আর সাঁঝাল নয়, পার্ক স্ট্রীটের আলো-আঁধারি, ঝকাঝম ঝকাঝম বারে বসে লাল ঠোঁটে, লাল পানীয়ের গেলাস।

আমার ছেলের মা সারাজীবন কি করে এল? ছাপা শাড়ি পরে এতখানি একটা খোঁপা করে শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা! সকাল থেকে রাত পর্যন্ত হেঁসেল ঠেলা। পেটে পুঁই শাক, লাউয়ের ডাল, ছ্যাঁচড়া, খোসা চচ্চড়ি। সেই মায়ের ছেলে ব্যাবা, ব্যাবা করবে না তো, কি করবে?

বউয়ের তো অনেক ধরন আছে। কেউ বউমা, মানে যার মধ্যে মা মা ভাবটা বেশ প্রবল। কেউ বধূ। যার মধ্যে কন্যাভাব প্রবল। কেউ শুধুই বউ, সাদামাটা, ঘরোয়া একটা ব্যাপার। কেউ ওয়াইফ। স্লিভলেস ব্লাউজ, অর্গাণ্ডির শাড়ি, সে এক আলাদা ব্যাপার। কেউ আবার মিসেস। একটু রঙ-চটা। দেহে তেমন বিন্যাস নেই, একটু এলোমেলো। বেঁচে থাকার ধরনটা গেলেও হয়, থাকলেও হয়। সংসার চলছে চলুক।

কথায় আছে, স্বভাব না যায় মলে, ইজ্জত না যায় ধুলে। ইজ্জত বলে না ইল্লত বলে কে জানে! একই মায়ের দুই মেয়ে। আমারটি এক রকম, শ্যালিকাটি আর এক রকম। ওই জন্যেই মানুষের উচিত শ্যালিকাকে বউ করে বউকে শ্যালিকা করা। সে তো আর হবার উপায় নেই, ভেতরে ভেতরে ফোঁস-ফোঁস করে জীবন কাটাই।

একদিন, দু'দিন ইংরেজি সিনেমায় নিয়ে গেলুম। ঘুমিয়ে ঘণ্টা পার করে দিলে। কি গো, ঘুমোচ্ছ কি, ছবি দেখ। অত বড় একজন অভিনেতা মারলন ব্রাণ্ডো।

মুখে সুপুরি ঠুসে কি যে ইংরিজি বলছে কিছুই বুঝতে পারছি না মাথামুণ্ডু।

বোঝার চেষ্টা কর।

তুমি কর। পরে আমাকে গল্পটা বলে দিও।

লাও, বোঝ ঠ্যালা।

দ্বিতীয়বার ঘুমের আয়োজন করতে করতে বললে, মোগলাই খাওয়াবে তো?

ওই এক শিখে রেখেছে, কলকাতায় এলেই মোগলাই। মোল্লার দৌড়।

কেন চাইনিজ খাবে চলো।

না বাবা আরশোলার গন্ধ।

ফিস ফ্রাই।

না বাবা, হাঙরের তেলের গন্ধ।

আমাদের পাশে এক ভদ্রলোক বসেছিলেন, তিনি বললেন, স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপার, ও সহজে ফয়সালা হবে না। এখন দয়া করে চুপ করুন, পরে বাইরে গিয়ে যা হয় করবেন।

ইস্! লজ্জার একশেষ। তারপর থেকে কোনও দিন আর বউমাকে কোনও ব্যাপারে চাপাচাপি করিনি! যা হবার তা হবে। এখন ছেলেটা বেশ চড়কো হয়েছে, তাকেই মানুষ করার চেষ্টা করি।

অনেক ধরাধরির পর বেশ নামজাদা এক সায়েবী স্কুল থেকে একটা ভর্তির ফর্ম মিলল। আমার চোদ্দপুরুষের ভাগ্য। ফর্ম জমা পড়বে, তারপর পরীক্ষা দিতে হবে। রেজাল্ট দেখে দশজনকে নেওয়া হবে।

এইটুকু ছেলের কি পরীক্ষা হবে। মুখে এখনও আধো আধো বুলি। কোমর থেকে প্যান্ট খুলে খুলে পড়ে যায়। কেউ কোনও উলটোপালটা কথা বললে আঁচড়ে-কামড়ে দেয়।

ওই আঁচড়ানো-কামড়ানোটাই ভয়ের। স্কুলের প্রিন্সিপ্যালকে যদি কামড়ে দেয়! সারা জীবনের মত হয়ে গেল। নারসারি রাইম আর পড়তে হচ্ছে না। দুলে দুলে পড়ে যাও, সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি। পাড়ার বাঙলা স্কুলে ইস্তিরি চটকানো জামা প্যান্ট পরা ছেলেদের সঙ্গে জীবন কাটিয়ে কেরানিগিরি কর। পিত্তি-চটকানো ভাত, চাঁড়স ভাতে কাঁচালঙ্কা দিয়ে বাকি জীবন গিলে মর।

ছেলেকে খুব তালিম দিতে থাকলুম মাসখানেক ধরে। পাখির ইংরেজি, বার্ড। সাহেবরা উচ্চারণ করে ব্যার্ড। টিকটিকির ইংরেজি গেকো। পাখিটি—দ্য বার্ড, স্ত্রীলোকটি, দ্য উওম্যান। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর নাম কি? মানুষ কবে চাঁদে গিয়েছিল? কি তাঁদের নাম? সুপ্রভাত, গুড মর্নিং। আমি স্যাণ্ডউইচ খাই, আই ইট স্যাণ্ডউইচেস। স্যাণ্ড মানে বালি, উইচেস মানে ডাইনীরা। আগামী কাল, টুমরো। হাড়ের ভেতর থাকে ম্যারো। টুম্যারো। গতকাল

ইয়েসটারডে। বলো বাবা, বলো। মানিক বলো! না, মানিক বড় সেকেলে, বাঙলা নাম। বলো জ্যাকি, বলো! আমি ভাল ছেলে, আই অ্যাম এ গোড, গোড না গুডই বলো, আই অ্যাম এ গুড বয়!

পরীক্ষার দিন সাত সকালে স্বামী-স্ত্রী ছেলেকে নিয়ে গেলুম পরীক্ষা দেওয়াতে। কর্মকর্তারা বললেন, আপনারা রাস্তায় দাঁড়ান, অভিভাবকদের ভেতরে প্রবেশ নিষেধ। ছেলেকে আমাদের হাতে ছেড়ে দিন। ছেলেও শালা তেমনি। নিজের ছেলেকে কেউ শালা বলে! রাগে বলে। সে ব্যাটা মায়ের কোমর জড়িয়ে ধরে আদুরে গলায় চেঁচাতে লাগল, না আমি যাব না।

বলতে চেয়েছিলুম, ডোণ্ট বি ফাসসি জ্যাকি। রাগে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল, ভুতো, মারব এক চড় রাসকেল।

সামনেই দাঁড়িয়ে ছিলেন, ফাদার কিচলু। তিনি বললেন, ও, ছাটস নট দি ওয়ে!

কি করব ফাদার। রাগে মাথায় খুন চেপে যাচ্ছে।

ওঃ নো নো, খুন চাপিলে চলিবে না। বি সফ্‌ট, বি এ ফাদার, নট এ বুচার।

কাম, মাই সান। মাই লিটল হোলি চাইলড।

ফাদার জানোয়ারটার কোমর দু'হাতে জড়িয়ে ধরে মিশনারি কায়দায় কাছে টেনে নিতে চাইলেন।

কোন্‌ মাল থেকে কি মাল বেরিয়েছে জানা ছিল না। ভুতো তার পুরনো দাওয়াই ছাড়ল। ঘ্যাঁক করে ফাদারের ডান হাতে দাঁত বসিয়ে দিল।

ও গড, হি ইজ এ লিটল সেটান, অ্যান আগলি ডাকলিং। আই নিড সাম অ্যান্টিসেপটিক, এ টেট ভ্যাক।

টেট ভ্যাক লাগবে না ফাদার। ট্রিপল অ্যান্টিজেন দেওয়া আছে।

অ্যান্টি র‍্যাবিজ দিয়েছিলেন কি?

সে তো কুকুরকে দেয় ফাদার।

হি ইজ মোর দ্যান এ ডগ।

আমি ওকে একটা কষে চড় মারতে পারি ফাদার! ভীষণ রাগ হচ্ছে।

নো নো ডোণ্ট ডু দ্যাট। একটি চড় আপনি আপনার গালে মারুন।

কামড়াবার পর ছেলে একটু শান্ত হল। ফাদারের গাউনের ঝোলা বেল্ট ধরে আমাদের দিকে তাকাতে তাকাতে স্কুলে গিয়ে ঢুকল। আহা চেহারার যা ছিরি হয়েছে। তখন অত করে বারণ করলুম, ভদ্রমহিলা শুনলেন না, চোখে কাজল পরাবার কোনও প্রয়োজন ছিল! সায়েবদের ছেলেরা কাজল পরে? সারা মুখে কাজল চটকেছে। ভাগ্যিস, ভূতের মত গায়ের রঙ, তা না হলে কি সুন্দরই না দেখাত!

স্কুলবাড়ির দিকে তাকিয়ে দু'জনে গাছতলায় বসে রইলুম পাশাপাশি। শালির ছেলেটা কি স্মার্ট! এই বয়েসেই ইংরেজি গালাগাল দিতে শিখেছে! আধো আধো ভাষায় কি সুন্দর লাগে শুনতে! ও ছেলে বিলেত যাবেই। ওই জন্যেই লোকে মেম বিয়ে করে। ছেলেটা অন্তত সায়েব হবে! আমার বউটাকে দেখ! ঠিক যেন শাড়ি-জড়ানো প্যাকিং কেস! প্যাকিং কেস থেকে ভূতই বেরবে।

সারা স্কুলবাড়িটা হঠাৎ কেঁদে উঠল। অসংখ্য শিশু কাঁদছে। হাজার রকম সুরে। ঠিক যেন শুয়োরের খোঁয়াড়ে আগুন লেগে গেছে! কি হল রে বাবা! সব অভিভাবকই চঞ্চল হয়ে উঠলেন। কান্নার পরীক্ষা হচ্ছে নাকি! পরীক্ষক হয় তো প্রশ্ন করেছেন—হাউ টু ক্রাই! একটু পরে হয় তো হাসি শোনা যাবে। যাক বাবা, এই একটা আইটেমে আমার ছেলে ফুল মার্কস পাবে। কেউ হারাতে পারবে না।

এক বাঙালী ভদ্রলোক আমার ছেলেকে চ্যাংদোলা করে স্কুল-

বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন, ব্যাটা হাত পা ছুঁড়ে চেল্লাচ্ছে দেখ ! কানের পোকা বেরিয়ে আসবে।

নিন মশাই, আপনার ছেলেকে বাড়ি নিয়ে যান। ত্রিসীমানা থেকে দূর হয়ে যান। নিজে কেঁদে সব ছেলেকে কাঁদিয়ে এসেছে। নিয়ে যান, নিয়ে যান !

এসো বাবা এসো, কে মেরেছে বাবা।

মায়ের আদিখ্যেতা শুরু হল। আদর দিয়ে বাঁদর হয়েছে। দু চোখ বেয়ে কালো জল পড়ছে। ভূতের কান্না তো, কালোই হবে !

ওটাকে নর্দমায় ফেলে দাও !

আহা, বাছা আমার ! ফুলে ফুলে কাঁদছে।

রাসকেল আমার।

কান ধরে টানতে টানতে নিয়ে চল্লুম—চল, তোর আর সায়েব হয়ে দরকার নেই। তুই বাঙালীই হবি চল।

ভূমিকা

আমরা ক্রমশই খুব সভ্য হয়ে উঠছি। শিক্ষার প্রসার ঘটেছে, চেতনার উন্নতি হয়েছে। সঙ্কীর্ণতা কমে এসেছে। সমাজ-সচেতনতা বেড়েছে। বিজ্ঞান বিস্ময়করভাবে প্রকৃতিকে জয় করতে শুরু করেছে। আমরা আর আগের মত নেই। দেবতার কাছাকাছি চলে এসেছি। সত্যই আমরা অমৃতের সন্তান। ভাল করে তাকালে আমাদের মাথার পেছনের দেয়ালে আলোর গোলাকার ছটা দেখা যাবে।

সঙ্কীর্ণতা, স্বার্থান্বেষ, লোভ যেটুকু চোখে পড়ছে, তা আমাদের পরিশীলিত আচার-আচরণের অপব্যাখ্যা ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা যদি আগের চেয়ে উদার না হয়ে থাকি, তাহলে এত মানুষ এক জায়গায় শান্তিতে বাস করছি কি করে। ষাঁড়ের দৃষ্টান্তই তুলে ধরা যাক। দুটো মাত্র ষাঁড় এক জায়গায় হলেই শিঙে শিঙে লাগিয়ে, ঠেলাঠেলি করে কিছুক্ষণের জন্যে যানবাহন বন্ধ করে দেয়। আমরা নিশ্চয়ই ষাঁড়ের চেয়ে উন্নত। হ্যারিসন রোডের কাছে কখনও কি দেখা গেছে দুটো বিশাল মানুষ মাথায় মাথা লাগিয়ে পরস্পর পরস্পরকে ঠেলছে। ট্রাফিক পুলিশ হাত নামিয়ে অসহায়ের মত তাকিয়ে আছে। গাড়ি ঘোড়া সব বন্ধ। না, এ দৃশ্য দেখা যাবে না। অথচ সেই পরশ্রীকাতর ষাঁড় মহেশ্বরের বাহন! আর মানুষ হল শয়তানের আপেল-খেকো ইডেনভ্রষ্ট জীব।

বেদান্তে ঈশ্বরের কাছে পৌঁছবার একটা সহজ রাস্তা আছে। সেই রাস্তাটি হল নেতি, নেতি। এটা নয়, ওটা নয়, সেটা নয় করতে করতে আসল সত্যটিকে ল্যাম্পপোস্টের মত জাপটে ধরে চিৎকার করে ওঠা: সোহহং। সেই নীতিই প্রয়োগ করে নিজেকে এইভাবে চেনা

যেতে পারে, যেমন আমি ষাঁড় নই, কারণ আমার শিং নেই, আমি গুঁতোই না। মাঝে-মধ্যে হাঁটুর গুঁতো মারি, কনুই চালাই, অবশ্যই বিপাকে পড়ে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে 'সরি' বলি। এক সময়কার দেবভাষা। ষাঁড় কি শিং দিয়ে গুঁতো মেরে 'সরি' বলে। বলে না। আমার গুঁতো অত্যন্ত উঁচুমানের গুঁতো। তার প্রয়োগ যানবাহনে আরোহণ, অবরোহণের সময়। ঈশ্বরলাভের জন্যে বহুপ্রকারের যোগ, মুদ্রা ও প্রাণায়াম বিধির প্রচলন আছে। সবই সিদ্ধসাধক নির্দিষ্ট পথ। এই জনভারাক্রান্ত দেবভূমিতে অফিসযাত্রী দেবতাদের জন্যে রথের সংখ্যা বড়ই কম। ওদিকে দপ্তরে দপ্তরে অপ্সরা-পরিবৃত ইন্দ্রের দেবসভায় ঠিক সময়ে হাজিরা দিতে না পারলে খোদেশ্বর ক্ষিপ্ত হবেন। রথলাভকে ঈশ্বর লাভের তুল্য জ্ঞান করলে গুঁতো এবং কনুইয়ের সুপ্রয়োগ এক ধরনের হটযোগ কিংবা মুষ্ঠযোগের পর্যায়েই পড়বে। সেই যোগে কোনও দেবতা যদি ভূতলে পতিত হন অথবা রথচক্রে নিষ্পেষিত হন, তাহলে দেবভাষায় আমরা দেবোক্তিই করতে পারি : নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য।

আমার আমিটাই যখন সব, তখন অন্যের আমি নিয়ে মাথা ঘামাবার কি বা প্রয়োজন। অন্যের আমি অন্যে সামলাক, আমার আমিকে আমি সামলাই। জীবনের পথ তো বড় সোজা নয়, দেবতার পথ আরও দুর্গম : ক্ষুরস্যধারা নিশিতা দুরত্যয়া। সুতরাং একটু নড়েচড়ে, গ্যাঁট হয়ে খেলিয়ে বসি। শ্রীকৃষ্ণ কুরুক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে আমাদেব বছিলেন, 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থঃ'। আমি ক্লিব নই। আমি ব্রহ্মা। আমার হাঁটুর ওপর ব্রিফকেস ফেলে, দুপাশে ডেঙ্গো-ডাঁটার মত ঠ্যাং ছড়িয়ে, সন্ধের পর সামান্য সোমরস পান করে, তাম্বুল চিবোতে চিবোতে লর্ডের মত বসে থাকব মিনি রথের জোড়া আসনে। অন্যের অসুবিধে। হচ্ছে হোক। তা বলে আমি অসভ্য নই। ন্যায়শাস্ত্র প্রমাণে বিশ্বাসী। আমি যে অসভ্য প্রমাণ কর। উদাহরণ দিয়ে সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠিত কর। অসভ্যেরা উলঙ্গ হয়।

আমি উলঙ্গ নই। ভারতের শ্রেষ্ঠ মিলের তৈরি জামা-কাপড় আমার পরিধানে। অসভ্যেরা সাবান, পাউডার ইত্যাদি প্রসাধন ব্যবহার করে না। আমি করি। তারা কাঁচা মাংস খায়। আমি চিকেন তন্দুরি খাই! কোনও অসভ্যের বাবাও অমন সুস্বাদু রান্না করতে পারবে না! অসভ্যেরা নখ কাটে না, দাড়ি কামায় না। আমি সপ্তাহে একবার নখ কাটি, রোজই বিলিতি ব্লেডে দাড়ি কামাই। অসভ্যরা জঙ্গলে বাস করে, আমি কলকাতা নামক শহরের সুরম্য ফ্ল্যাটে বসবাস করি। রেডিও শুনি, টিভি দেখি, রেকর্ড প্লেয়ার চালাই। ফ্রিজ থেকে ঠাণ্ডা জল বের করে খাই। হাজারটা উদাহরণ উদ্ধৃত করে আমি যে অসভ্য নই, তা প্রমাণ করে দোব। ন্যায়শাস্ত্রে একে বলে খণ্ডন। আমি এখন চলন্ত গাড়ি থেকে থুঃ করে থুতু ফেলব। একবারও পথচারীদের কথা ভাবব না। এই জন্যে ভাবব না, আমি তো পথচারী নই এখন। শুধু তাই নয়, গতি আমাকে নিমেষে নাগালের বাইরে নিয়ে যাবে। ধরা-ছোঁয়ার বাইরে নিয়ে যাবে। আমি এখন দাঁতখোঁচা দিয়ে দাঁত খুঁটে প্রাপ্ত খাদ্যাংশ সামনে ফুত করে ছুঁড়ব! কারুর গায়ে পড়বে। পড়ুক। এক আমি ভেঙে ভেঙে বহু আমি হয়েছে। যার গায়ে পড়ল সেও তো আমি। দৃষ্টিভঙ্গি পালটে ফেললে মানুষের দেবত্বের প্রমাণ দিকে দিকে!

আমি হৃদয়হীন নই। আবার সেই প্রমাণ। যারা খুন করে, তারাই হৃদয়হীন, আমি কাউকে খুন করিনি। খুন করলে জেলে যেতুম। যেহেতু জেলে যাইনি, সেইহেতু 'ল অফ দি ল্যাণ্ড' অনুসারে আমি সাধু! সাধুরা হৃদয়হীন হতে পারে না। যাঁরা বলেন কর্মস্থলে আমি চক্রান্ত করে উপযুক্ত ব্যক্তির পদোন্নতি না ঘটিয়ে তৈল প্রদানকারীরই স্বার্থ দেখি, তাঁরা ভুল ব্যাখ্যা করেন। তেল দিতে না চাওয়াটা এক ধরনের অহঙ্কার। আমি কাউকে তেল দিই না। আমি কারুর পায়ে ধরে বড় হতে চাই না। সাধনমার্গে অগ্রগতির সবচেয়ে

বড় বাধা অহমিকা। অহঙ্কারী মানুষ উচ্চমার্গে ওঠার অধিকারী নয়। আমি নিজে অহম্ বিসর্জন দিয়ে, নানাভাবে দেবতাদের সন্তুষ্ট করে ইন্দ্রের কাছাকাছি একটি আসন লাভ করেছি সাধনার জোরে। আমি জানি রামকৃষ্ণ কত বড় সত্য কথা বলেছিলেন, | অহঙ্কারের ফেঁসো উঠে থাকলে সুতো ছুঁচের গর্তে কিছুতেই ঢুকবে না। |

মানুষকে দু শ্রেণীতে ভাগ করে নিলেই সব লেঠা চুকে যায় : কর্মী আর কর্মহীন। কর্মহীনদের জাগতিক আচরণ থেকে সহজেই বাদ দেওয়া চলে। তারা হল ভাগিদার। কিছুই না করে জায়গা দখল করে বসে আছে। পরান্ন ধ্বংস করে চলেছে। কোনও এক দেশে অত্যাচারী, ক্ষতিকারক পোকা-মাকড় ও জীবজন্তু মেরে ফেলার প্রকল্প চালু আছে, যেমন চড়াই পাখি, কাক, পঙ্গপাল ইত্যাদি। সেই প্রকল্প এদেশে চালু করার অনেক বাধা। কারণ যারা কিছু করে না তারা ভোট দেয়। এরা অবশ্য দিনে দিনে ক্ষয় পাবে। প্রথমত রাজনৈতিক কামানের মানব গোলা হিসেবে ব্যবহৃত হবে। পেটের দায়ে চুরি, ছিনতাই, ডাকাতি করতে গিয়ে মার খেয়ে মরবে। নেশা-ভাঙ করতে করতে টেঁসে যাবে। ব্যাপারটা খুব ধীরে ধীরে হবে। তা হোক। তবু রাস্তা খোলা রইল। আর যারা যাবেই, তাদের অহমিকারও মূল্য নেই, বাতুলতাও কর্ণপাতের অপেক্ষা রাখে না। ওরা হল ক্ল্যামারিং মাস। একটা একটা করে না দেখে তাল হিসেবেই দেখা উচিত, দেখা হয়ও। সেই ভাবেই বস্তিতে, ঝুপড়িতে থাকে। এদের অপরাধ-প্রবণতা, এদের যৌনতা, এদের পুষ্টিহীন বেঁচে থাকা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে থিসিস লিখে ডকটরেট করা যায়। মাঝে-মধ্যে সোয়াবিন, চাপ ছোলার ডাল, গুমো আটা আর ভেলি গুড় মিশিয়ে পাউরুটি তৈরি করে নিউট্রিশানাল ব্রেড নাম দিয়ে এদের মধ্যে বিতরণ করে সমাজ-সেবীর সম্মান পাওয়া যায়, খেতাব পাওয়া যায়। সমাজসেবী সংস্থা এদের দৌলতেই দেশী বিদেশী অর্থ সাহায্য পেতে পারে। বিদেশী সাহায্যের গুঁড়ো দুধ, বাটার অয়েল ব্ল্যাকে ঝেড়ে দিয়ে নিজেদের

বিলিতির খরচ তুলে নিতে পারে। সংস্থার কর্তাব্যক্তিরা বিদেশে সেমিনার করতে যেতে পারে। সুতরাং এরা একেবারে মরে হেজে গেলে বড় অসুবিধে হবে। এদের মেয়েদের শ্লীলতাহানি করা যায় বলে হোমস বেঁচে আছে। হোমস-এ নানারকম হাতের কাজ হয়। সেই সব কাজ দিয়ে অনেকে অল্প খরচে ঘর সাজাতে পারেন। এদের পাপে ওপরতলার অনেকে পাপের সুযোগ পান। সেই সব হোয়াইট কলার ক্রাইম মাঝে-মধ্যে কাগজে হঠাৎ ফাঁস হয়ে গেলে চায়ের দোকান সরগরম হয়। মধ্যবিত্তরা বেশ আনন্দ পান। সাহস আর সুযোগের অভাবে নিজে যে পাপ করতে পারিনি, সেই পাপ অন্যে করেছে দেখলে নিজের খাই খাই আত্মার আংশিক আহার হয়। ঘ্রাণে অর্ধ ভোজনের মত। আমরা যারা কোনও না কোনও প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী, কিছু করি আর না করি মাসের শেষে মাইনে পাই, তারা তো আর তেমন গায়ে-গতরে হতে পারে না! তাদের মস্তিষ্কটাই বড় হয়। তারা বুদ্ধিজীবী। শ্রমজীবী নয়। তাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম করার জন্যে এমনকি মুখের সামনে এক গেলাস জল এগিয়ে দেবার জন্যেও একজন লোক চাই। সে আবার কেমন হবে? বামুনের গরুর মত। খাবে কম, দুধ দেবে বেশি। এমন মানুষ কারা সাপ্লাই দেবে? কেন এই হ্যাভ নটসরা। দেশটা আমেরিকার মত উন্নত হয়ে গেলে মহা-বিপদ হবে। ফোর্ড গাড়ি চেপে যদি রাঁধুনি আসে, কি সুইপার, কি ডিশ্‌ ওয়াশার আসে আর রোজ দশ ডলার পারিশ্রমিক চায়, তাহলে হোয়াইট কলারদের মুখ যে হোয়াইট হয়ে যাবে। তাই ওরা থাক। তেল দিক আর না দিক ফুটপাথে ঝুপড়িতে ওদের বংশবৃদ্ধি হোক। আমাদের রোদে বড় কষ্ট হয়, জলে ভিজলে কপালে শ্লেষ্মা জমে, ভারী কিছু তুলতে গেলে ফিক ব্যথা লাগে, নিচু হতে গেলে কোমরে স্লিপ ডিস্ক। আমাদের মহিলাদের রান্নাবান্না একঘেঁয়ে লাগে। তারা ওম্যানস লিব্‌ বলে চেল্লাচিল্লি করছে। দাস-দাসী নিয়ে গায়ে ফুঁ লাগিয়ে মুখে মেক-আপ করে সংসার করতে গেলে আমাদের বড়

দাস হতে হবে। তেল মেরে ঠাট রাখতে হবে। অহং নিয়ে লম্ফ-ঝম্ফ করতে গেলে হাতে হ্যারিকেন হবে। আমাদের তাই গৃহে কালোয়াতি, কর্মস্থলে দাসত্ব। পাড়ার প্রিন্স সেরেস্তার কৃতদাস। এতে অগৌরবের তো কিছু নেই। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, 'নিজেকে সমর্পণ কর।' শ্রীকৃষ্ণ কে? জীবনরথের সারথি তিনি। তার মানে জীবিকা।

বেঁচে থাকাটাই বড় কথা। কিভাবে বেঁচে থাকব, সেটা বড় নয়। সভ্যজগতে অনেক সভ্য জীবিকা আছে। সভ্য নামে সহনীয়। যেমন দালাল বললে রেগে যাব। মিডলম্যান বললে তেমন খারাপ শোনাবে না। চামচা বললে মুখ ভার হবে, ফলোয়ারস বা অ্যাসোসিয়েটস বললে বিগলিত হব। ষড়যন্ত্রকারী বললে প্রহার দিতে পারি। ম্যানিপুলেটারস বললে ক্ষমা করে দোব।

The life is more than the meat

বসুধৈব কুটুম্বকম এ যুগের বিধান নয়।

যে মানুষ চাকরি করে, যে মানুষ বহুতল বাড়ির একটি ফ্ল্যাটে জীবন কাটায়, সুখী পরিবারের আধুনিক নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলে তারা পাশের খুপরির মানুষের সঙ্গেই কুটুম্বিতা করতে পারে না তো বসুধা। জীবনের ওপর জীবিকার বেশ বড় রকমের একটা প্রভাব আছে। দাস আমি, সে যত বড় দাসই হোক না কেন, সংকীর্ণ আমি! প্রচুর মাইনে, অনেক সুযোগ-সুবিধে। সাজানো ফ্ল্যাট, গাড়ি, ফোন, ফ্রীজ, এয়ার কুলার, ট্রাভেল, পার্টি, সুন্দরী স্ত্রী হাই কানেকশান। জীবন একেবারে জজবজে। হলে কি হবে? সেই ছেলেবেলার যাত্রার আসর? সামনে অসংখ্য মাথা। দর্শক উচ্চতায় খাটো। একটি মাত্র বেঞ্চি। উঠে দাঁড়ালে ভাল দেখা যায়। সবাই উঠতে চায়। এ ওঠে তো ও পড়ে। ও ওঠে তো এ পড়ে। জীবিকার উঁচু মাচান থেকে প্রতিযোগীর ধাক্কায় পড়ে যাবার আতঙ্কে কেরিয়ার শিকারী রাইফেল বাগিয়ে বসে আছে। চেষ্টা করেছ কি মরেছ।

একটা জায়গায় মানুষ 'প্রটেকটিভ' হলে সাইকোলজিস্টদের ধারণা সে মানুষের পারসোনালিটি হবে 'ক্লোজড'। ক্রমশই উদারতার মৃত্যু হচ্ছে। ইংরেজের কায়দায় আমরা এখন পরস্পরের সঙ্গে 'নডিং টার্মসে' নেমে এসেছি। সম্পর্ক, কেমন আছেন, ভাল আছির। চালাক বলবেন, বেশি 'হবনবিং' ভালো নয়। প্রথমত মানুষের আর সে অফুরন্ত সময় নেই। আমার কাজ আছে। মুখে নির্লজ্জের মত বলতে না পারলেও, মনে অস্বস্তি। অ্যা, ঠিক কাজের সময় জ্বালাতে এল। কাজটা কি? কেরিয়ার পালিশ। চকচকে, আরও চকচকে। আরও ক্ষমতা। কি ক্ষমতা, কোথায় ক্ষমতা। সেরেস্তায়। পৃথিবী বিশাল। বিশালে স্থান পাওয়া কঠিন। সেখানে কে তুমি হরিদাস পাল। যাদের ওপর ডাণ্ডা ঘোরানো যায় তারা হল দাসের দাস। জীবিকা আমাদের 'স্যাডিস্ট' করে তুলেছে। এই 'স্যাডিজম' ওপর থেকে নিচের তলা পর্যন্ত চলে গেছে। রসায়নের ভাষায় যাকে বলা চলে 'পারকোলেশান'। চাকুরিজীবী মানুষ তুমি, 'মিলার অফ দি ডি'র মত, রাতে নিশ্চিন্ত আরামে নিশ্ছিদ্র ঘুমে তলিয়ে যাবে তা তো হয় না। প্রতিদিন আউনস মেপে তোমার অপমানের ঝুলি ভরা হবে। তোমার 'আমি'কে প্রতিদিন চটকে চটকে বিকলাঙ্গ করে তোলা হবে। এই সভ্যতাতেই সেই ঘটনা ঘটে। ডিকেনসের 'অলিভার টুইস্টে'র কাল থেকে সমাজ এক চুলও কি এগিয়েছে? চাইল্ড লিফটিং বেড়েছে বৈ কমেনি। শিশুকে হাঁড়ি কিংবা কলসির মধ্যে পুরে রেখে বিকৃত করে পথের পাশে বসিয়ে রাখা হয়। যে মানুষ এমন কাজ সহজে পারে, সেই মানুষই আবার পকেটে হাত ঢোকায় ভিক্ষে দেবার জন্যে। অনুকম্পায় হায় হায় করে ওঠে। এখানেই স্বর্গ, এখানেই নরক। দেবতা আর শয়তান একই আকাশের তলায় গুলতানি করছে। সিনডিকেট তৈরি করে বিকলাঙ্গ বানাবার ঘটনা অপরাধ জগতের ব্যাপার। আর যাঁরা প্রতিদিন সুস্থ মানুষের আমি চটকে ব্যক্তিত্বের নির্যাস বের করে ক্রীতদাস তৈরির চেষ্টা করছেন,

তাঁদের বিচার করার কেউ নেই। আর একবার 'আংকল টমাস কেবিন' লেখার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। গণতন্ত্র মার্চ করছে। সমাজতন্ত্র মানুষকে মানুষ করে দিয়েছে। আমরা সবাই রাজা, এই রাজার রাজত্বে। স্বর্গের জানালা খুলে অজস্র তাঁরার চোখে ঈশ্বর তাকিয়ে আছেন পৃথিবীর দিকে। মানুষের মাথা আকাশের চাঁদোয়ায় গিয়ে ঠেকেছে। কৃত্রিম উপগ্রহ সেই বিশ্বস্রষ্টার কানের কাছে বিপ্ বিপ্ করে চলেছে অষ্টপ্রহর।

তবু কেন ঘুম আসে না। ঘরের দেয়াল 'সাটিন সিল্ক'। হাল্কা রঙের খোশ মেজাজে দামী আলোর শেড বেয়ে নেমে আসা বিদ্যুতের আলোয় অবগাহন করছে। ক্যালেণ্ডারের নীল জলে রাজহাঁসের মত পাল তুলেছে ইয়ট। চির, চেনার মাথা তুলেছে, পেছনে পাহাড়ের মাথায় বরফ জমে আছে। পা ডোবানো কার্পেটে ইরানী লতাপাতা। অকালেই সেই বৃদ্ধ শিল্পীর কথা মনে পড়ে। এক মাথা পাকা চুল। নাকের ওপর ঝুলছে দড়ি জড়ানো নিকেলের গোল চশমা। হাতে ছুঁচ আর পশম। সারাজীবন যে শুধু কার্পেটে নক্সা তুলে গেল। যার দুটো পা পাথরের মেঝের শীতল স্পর্শ ছাড়া আর কিছুই পেল না। যার স্যাঁতসেঁতে ঘরের বাগিচায় বুলবুলি ডেকে যায়। বৃদ্ধ শুনতে পায় না। অপুষ্টিতে কান গেছে। দ্রাক্ষাকুঞ্জে আঙুর ঝোলে লাল হয়ে। আপেল গাছে ফুল আসে। এত বড় পৃথিবীতে তার কোনো প্রয়োজন নেই। জীবনের আয়োজন বড় সঙ্কীর্ণ। কম জোর ফুসফুস, ক্ষীণ দৃষ্টি, কয়েকটা বাজরার রুটি, ছেঁড়া, তালি-মারা পশমের জামা, গোটা কতক মোটা কম্বল আর অপরিসীম শিল্প-চেতনা, এই পথে তো জীবনের বৈভব। ভাগ্য পুরুষানুক্রমে এই ভাবেই তো বাঁচতে শিখিয়েছে। পাহাড়ের মাথা থেকে বরফ চুঁইয়ে শীত নেমে আসে। বৃদ্ধ তবু শান্তিতে ঘুমোয়। ঘুমোতে পারে না সে, সেই নরোত্তম, যার অভ্রোত্তম দেয়াল থেকে দেয়ালে মেঝে ঠাসা গালচের ওপর লোমশ কুকুর হামা দিয়ে বসে থাকে। চকচকে ফ্রিজের

কফিনে নরম আলোয় ওৎ পেতে থাকে বরফ শীতল দ্রাক্ষাসব। কৃত্রিম চামড়া বাঁধানো সার সার সোফা সেট দেয়ালে ঠেসান দিয়ে মাফিয়া নেতাদের মত সারা রাত ঐশ্বর্যের ষড়যন্ত্র করে। ডিজিট্যাল ঘড়ি আলোর অক্ষরে জানাতে থাকে, আমি তোমার সময়, অনবরতই চলেছি, চলেছি। কালের দিকে চলেছি। Which is today tomorrow will be yesterday। চাঁদের আলোয় নিচের লনে সাদা মটোরের বনেটে শিশির জমছে মাঝ রাতে। বড় একা, বড় একা। প্রেম করো। তোমার এত আয়োজন। সুকোমল শয্যা, বড় উদ্বেল করা সুগন্ধ। ভারী ভারী পর্দা। খাবার টেবিলে মুর্গমসল্লম। একটু হাসো। দিলখোলা হাসি। হাসি আসছে না। অন্তরে গুমরে ফিরছে কান্না। মানুষে মানুষে সম্পর্ক বড় ঠুনকো। সব জোড় খুলে যাচ্ছে। শিল্পের জগতে অনেক শক্তিশালী 'অ্যাডহেসিভ' বেরিয়েছে। কি না জোড়া যায় তাতে! সম্পর্ক কিন্তু জোড়ে না। মনের ফাটল বেড়েই চলেছে। স্ত্রী অসংলগ্ন। পুত্র কন্যারা কক্ষ-চ্যুত গ্রহের মত দূর থেকে দূরে চলেছে। আয়োজন সাজানো শ্মশান। শয্যাসঙ্গী ঘিনঘিনে দুশ্চিন্তা। জীবন শেক্সপীয়রের সেই কৃষক, Who hanged himself in expectation of plenty। ট্যানটেলেসের সেই কাপ। ঠোঁটের এক ইঞ্চি দূরে ঝুলে থাকে। চুমুক দেওয়া যায় না। এ যেন সেই ক্যাবারে নর্তকী। খুব সেজে পাদ-প্রদীপের সামনে এসেছে। ঘুরে ঘুরে নাচছে। মনে মনে প্রস্তুত। রোমশ হাত এগিয়ে আসবে। শুরু হবে বস্ত্রহরণের পালা। শেষ দৃশ্যে সম্পূর্ণ উদম। এ নিয়তি কেউ ফেরাতে পারবে না। এ খেলা চলে আসছে সেই মহাভারতের কাল থেকে। কৃষ্ণ কোথায়?

অনিশ্চয়তার রাজারা বসে আছেন সর্বত্র। ফৌজ তৈরি। অসংখ্য পেরেক, ক্রুশ আর কাঁটার মুকুটের আয়োজন। হাজার যীশু প্রস্তুত হচ্ছেন হাজার সিজার অশ্রুত কোরাসে বলছেন, এত তু ব্রুটাস। সিজারে আর ব্রুটাসে খেলা চলেছে। খেলাটা হল, খেয়ে

পরে বেঁচে থাক, তবে মানুষের মন নিয়ে নয়, পশুর মন নিয়ে। বাবুর বাড়ির কুকুর খুব সুখে থাকে। সকালে বিস্কুট, দুপুরে মাংস-ভাত, রাতে দুধ, ভিটামিন, ক্যালসিয়াম, নিয়মমত চান, লোমে বুরুশ ; কিন্তু ভীষণ বাধ্য হতে হবে। প্রভুকে দেখে ল্যাজ নাড়তে হবে। সামনের দুটো পা দিয়ে বুকে উঠে দাঁড়িয়ে চুকচুক করে মুখটা একটু চেটে দিতে হবে। ল্যাজ নেড়ে, মাথা নেড়ে, পাগলামি করে বোঝাতে হবে, বড় আনন্দ, বড় আনন্দ। প্রভু বললেন, হ্যাঁ এই তো আমার কুকুর, ওয়েল ব্রেড ওয়েল ট্রেনড্! পেডিগ্রিড কুকুর কি ট্রেনিং নেয় মশাই। একেবারে মানুষের মত। শুধু ভাষাটাই যা আলাদা। এ ডগ হ্যাড এভরিথিং একসেপ্ট স্পিচ। ওর পেছনে, মাসে আমার কত খরচ জানেন? ডেলি মাংস, দুধ, ওষুধ। তবে হ্যাঁ, খরচে সুখ। বেইমানী করে না।

মাসে মাইনে চার কি পাঁচ হাজার টাকা। সাজানো ফ্ল্যাট। গাড়ি আশপাশ খরচের জন্যে অ্যালাউনস। পেডিগ্রি বাজিয়ে চেয়ারে বসানো হয়েছে। সব ঠাটই বজায় থাকবে, তবে ম্যানেজমেন্টের কথা শুনে চলতে হবে। যাদের দেখে ঘেউ ঘেউ করতে হবে তাদেরই ঘেউ ঘেউ করবে, যাদের দেখে ল্যাজ নাড়তে হবে, তাদের দেখে যেন ঘেউ ঘেউ করে ফেলে না। বুল-ডগ আর নেড়ি-ডগের ক্লেভার কম্বিনেশনই হল ঠাটবাট বজায় রাখার, ওপরে ওঠার চাবি-কাঠি। চাপে থাক, চাপে রাখ। অন্য কিছু করার চেষ্টা কোরো না। বিপ্লব-টিপ্লবের কথা বলতে পার, তবে বিশ্বাস করো না। রুসো, ভলটেয়ার, লেনিন, গুয়েভার, ক্যাস্ট্রো, ও সব হল সাইক্লোনের মত। নিম্নচাপ, উর্ধ্বচাপের খেলা। প্রভাব বেশি দিন থাকে না। ল্যাজ আবার বেঁকে যাবেই। ল্যাজের স্বভাব যাবে কোথায়? সিনেমার পোস্টার দেখনি? ভাই হোতো অ্যায়সা। সেই রকম ল্যাজ হোতো অ্যায়সা। কথাটা হল 'কনট্রোল'। নিয়ন্ত্রণ। সামলে রাখ, কান ধরে টান মার, বেশ করে মোচোড় মার। রাসকিনের

কথায় মহাত্মাজীর মত চোগা-চাপকান ছেড়ে নাটালে চলে যেও না যেন। সব মহাত্মারই শেষ পাওনা একটি বুলেট। প্রমাণিত সত্য, কলমের চেয়ে টেলিস্কোপিক রাইফেল অনেক শক্তিশালী। গান্ধী রাজঘাটে, কেনেডি, মার্টিন লুথার কিং আমেরিকায়। পড়তে পার, তবে বিশ্বাস করো না।

The life is more than the meat

The rich not only refused food to the poor, they refuse wisdom, they refuse virtue, they refuse salvation. Ye sheep without shepherd, it is not the pasture that has been shut from you, but the presence. Meat! perhaps your right to that may be pleadable; but other rights have to be pleaded first. Claim your crumbs from the table, if you will; but claim them as children, not as dogs; claim your right to be fed, but claim more loudly your right to be holy, perfect and pure.

তমসো মা জ্যোতির্গময়, অসতো মা সদ্‌গময়, মৃত্যোর্মা অমৃতং গময়। ঘুম আসে না, চারিদিকে বলাৎকারের চিৎকার। চলবে না, চলবে না। চলছে তো? এই ভাবেই চলছে, চলবে। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেহয়নায়। মডার্ন মেডিসিন চেতনায় প্রলেপ লাগাবার স্মিত বটিকা বের করেছে। ব্যক্তিত্বকে চুরমার করে দেবার দাওয়াইও বিজ্ঞানের হাতে।

Where, where in Heaven am I?
But don't tell me!

প্রেমে আর রণে যে কোনও কৌশল অবলম্বন করা চলে। শাস্ত্রের সমর্থন আছে। সত্যবাদী যুধিষ্ঠিরও অশ্বত্থামা হত জোরে বলে, ফিসফিস করে যোগ করেছিলেন ইতি গজ। রাজনীতিতে চাণক্য

আছেন। নীতি একটাই, কূটনীতি। মানুষের পৃথিবী মানুষের নিয়মেই চলবে। আদর্শ এক জিনিস, আচরণ আর এক জিনিস। একটা থিয়োরী, আর একটা প্রাকটিস।

মর্ত্যে স্বর্গ কোথায়! কল্পনায়! মর্ত্যে হল বিকিকিনির হাট। এখানে যৌবন বিকোয়, অভিজ্ঞতা নিলামে চড়ে। শিক্ষা সোনার চাবিকাঠি দিয়ে সাফল্যের দরজা খোলে। অতীতে কিছু কল্পনাপ্রবণ মানুষ, ধর্ম নিয়ে, আদর্শ নিয়ে, জীবন নিয়ে, পাতার পর পাতা বড় বড় কথা লিখে গেছেন! তখন কলকারখানা ছিল না, কোর্ট কাছারি ছিল না, নির্বাচন ছিল না, ইউনিয়ন ছিল না, ট্রেড ইউনিয়ন ছিল না। মালিক শ্রমিক সম্পর্ক ছিল না। পৃথিবীতে পোকার মত মানুষ গিজগিজ করত না। যে মানুষের মগজ থেকে বৈদিক সূক্ত বেরিয়েছিল, যে মগজে জন্মেছিল উপনিষদ, গীতা, ভাগবত, সেই মানুষেরই মগজ সৃষ্টি করেছে পর্নোগ্রাফি, সেকস্ শপ, টর্চার মেশিন। যে মাটিতে যীশু, সেই মাটিতেই মোবুতু। মন্দিরের দশ হাত দূরেই বেশ্যালয়। একদল যখন মা মা করছেন, আর একদল তখন মাগ মাগ। যে নারীতে মা, সেই নারীতেই মায়া। একজনের পায়ের ধুলো নিয়ে আর একজনের ঘাড়ে লম্ফ মারি। মূর্তি তৈরি করে সোনার সিংহাসনে বসাই, আবার সোনালি ব্রা।পরিয়ে উলঙ্গ করে ক্যাবারে নাচাই। যে নারীতে আমার জন্ম, সেই নারীতেই আমার জারজ সন্তান। যে মাটিতে রাজা, সেই মাটিতেই চেনে বাঁধা ক্রীতদাস। মানুষ কারুর প্রভু, কারুর দাস।

জীবনের বিচিত্র ভূমিকা।

বিভাসবাবু বড় চাকরি করেন। চাকরি যে করে তাকেই তো চাকর বলে। বিভাসবাবুকে চাকর বললে অনেকেরই চাকরি যাবে। তিনিও যে চাকর এই বোধ তাঁর সাবকনসাসে ছড়িয়ে আছে। চাকর বললেই তিনি রেগে যান। বলতে হবে অফিসার। ফাস্ট ক্লাস, গেজেটেড অফিসার। বলতে হবে বড় সায়েব। আগে পরে স্যার জুড়তে

হবে। ঘরে ঢোকার আগে অনুমতি নিতে হবে, মে আই কাম ইন স্যার। অধস্তনের দিকে নিতান্ত তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে তাকিয়ে গম্ভীর গলায় বলবেন, ইয়েস। সামনে সারি সারি চেয়ার; কিন্তু বসা চলবে না। বসলেই একটা কর্কশ দৃষ্টি লেহন করবে সর্বাঙ্গ। অপরাধ বুঝে ওঠার আগেই সেই বড় সাহেবের অন্তরীক্ষে সর্বনাশের পরোয়ানা প্রস্তুত হয়ে যাবে। আমি তো তোমায় বসতে বলিনি হে কৃতদাস। যে জানে, সে কখনও বিনা অনুমতিতে বসার দুঃসাহস দেখায় না। বড় সাহেবের কামরায় হাত কচলানোই বিধেয়। মাঝে মাঝে মাথা চুলকানো এক ধরনের অধস্তন ভঙ্গী। বাদামী সাহেবরা এই ভঙ্গীটি বড় পছন্দ করেন। সাহেব আড়চোখে দেখেন, আর মনে মনে তারিফ করেন। এই তো আমার হোয়াইট কলার কৃতদাস। এই সময়টায় যিনি জানেন, তিনি সঠিক তৈল প্রদান করে ভবিষ্যতের পথ তৈলাক্ত করেন, পণ্ডিতপ্রবর হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তো লিখেই গেছেন, তৈল এক প্রকার স্নেহজাতীয় পদার্থ। বাঙালীর শরীর তেলে আর জলে। তুমি আমাকে স্নেহ কর, আমি তোমাকে স্নেহ করি। সায়েব যদি অন্যায় বলেন, হে অধস্তন, তুমি প্রতিবাদ করো না। শুধু মাঝে মাঝে, ইয়েস স্যার বলে যাও। ইয়েস স্যারের সুপ্রয়োগে পঙ্গুও কেরিয়ারের সুউচ্চ পর্বত লঙ্ঘন করতে পারেন। কত নজির চাই। তিনি বললেন, ইউ আর এ ফুল। তুমি বল ইয়েস স্যার। তিনি বললেন, আপনি একটা অপদার্থ, গাধা। তুমি বল, ইয়েস স্যার। এবম্বিধ আচরণে কত অপদার্থ গর্দভ সুউচ্চ পদে আরোহণ করে স্বাধীনচেতা, আদর্শবাদী পদার্থের ওপর ছড়ি ঘোরাচ্ছেন। নিজেকে পদার্থ প্রমাণ করে কায়ক্লেশে বেঁচে থাকা মূর্খের বিলাসিতা। বুদ্ধিমান গাড়ি-বাড়ি করে। ফুটবলের মত স্ত্রী পুত্র নিয়ে সুখে দিনাতিপাত করে। একটু ছোট হলে যদি বিরাট হওয়া যায়, তা হলে অত মর্মবেদনা কেন? ক্ষমতাশালী মানুষ যদি শুয়োরের বাচ্চা বলেন, তাহলেই কি তুমি জেনুইন শুয়োরের বাচ্চা হয়ে গেলে! তোমারও তো একটা এলাকা

আছে, যেখানে তুমি মানুষ, অন্য শূকরশাবক। আলো আর ছায়ার মত এই তুমি মানুষ, এই তুমি শূকর তনয়। থিয়েটারের স্টেজ। চরিত্রের ওপর আলোর ফোকাস পড়ছে। কখনও নীল, কখনও লাল।

ভাদুড়ী চক্রবর্তীকে বললেন, কি বড় সায়েবের কাছে খুব ঝাড় খেয়ে এলে ?

চক্রবর্তী বললেন, আরে ভাই আণ্ডার সেক্রেটারী ডেপুটির কাছে সকালে খুব ঝাড় খেয়েছে। ডেপুটি খেয়েছে জয়েন্টের কাছে। জয়েন্ট খেয়েছে সেক্রেটারীর কাছে। সেক্রেটারী খেয়েছে মন্ত্রীর কাছে। মন্ত্রী খেয়েছে গিন্নির কাছে !

গিন্নির কাছে ?

হ্যাঁ রে ভাই। সকালে খুব ঝাড় দিয়েছে।

চার্লির ছবির মত। হেড বাটলার, অ্যাসিসটেণ্টকে লাথি ঝাড়ল, সেই লাথি রিলে হতে হতে চলে গেল ডোরকিপারের পাছায়। ছিটকে পড়ল রাস্তায়।

কোন মানুষই স্বাধীন নয়। সংসারী মানুষ তো আদপেই নয়। যিনি সন্ন্যাসী তিনি কোনও সঙ্ঘ বা সংগঠনের দাস। কোন রাষ্ট্রও পুরোপুরি স্বাধীন নয়। স্মল পাওয়ার বিগ পাওয়ারের থামা ধরে থাকতে বাধ্য হয়। তা না হলে কোনও সময়ে অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে।

উপার্জনের জন্যে জীবিকার বাজারে মানুষ নিজেকে নিলামে চাপায়। আর তখনই সে হয়ে যায় দাস আমি। যত বড় চাকরিই হোক। একবার লিডেন সাহেব ক্ষুণ্ণ হয়ে চাকরি ছেড়ে চলে এসেছিলেন। ক্ষোভের কারণ, নতুন রাজধানীতে মানুষের শ্রেণীবিন্যাস হয়েছে উপার্জন অনুসারে। যাঁদের বেশি আয়, তাঁরা থাকবেন এ সেক্টারে, এইভাবে ধাপে ধাপে বি সি ডি। জাতিভেদ, বর্ণভেদ কাগজে কলমে উঠে গেলেও আর এক ধরনের বৈষম্য তৈরি করা হয়েছে, যার মূলে আছে উপার্জনভেদ।

যে কোনও শিল্প-শহরেই এই নতুন বর্ণভেদ তৈরি হয়েছে। পদমর্যাদা অনুসারে মানুষের কোয়ারেন্টাইন। মেলামেশার ব্যাপারেও পদমর্যাদার বাধা। অফিসারস ক্লাব, অফিসারস ক্যান্টিন। সেখানে ইতর জনের প্রবেশ নিষেধ। এ কি জ্বালা! ছিলাম উচ্চবর্ণের মানুষ। লেখাপড়াতেও তেমন খারাপ ছিলাম না। বংশমর্যাদাও ছিল। তেমন করিৎকর্মা হতে পারিনি বলে ইস্পাত কারখানার ফোরম্যান। কোয়ার্টার জুটেছে সি সেক্টারে। কাজকর্মেও চৌখস। তবু আমি সি ক্লাস। এ ক্লাসের ব্রাহ্মণরা ব্রাত্য ওঁদের ক্যান্টিনে। গ্রিলড চিকেন হলে আমাদের ক্যান্টিনে ঘুগনি, আলুর দম।

কোনও কোনও অফিসে ল্যাভেটরির মাথায় লেখা আছে, গেজেটেড অফিসারস। সেখানে জনৈক হোমরাচোমরা পুঁই পুঁই করে শিস দিতে দিতে জলবিয়োগ শুরু করলেন। বুক পাঁচিলের পাশে উঁচিয়ে আছে বকের মত গলা। হঠাৎ পাশের দিকে নজর চলে গেল। অচেনা কে একজন পাশের আড়ালে একই কর্মে ব্যস্ত। নিজের ত্যাগ বন্ধ রেখে তিনি একধাপ পিছিয়ে এলেন। ব্যাটা যদি ননগেজেটেড হয়। গেজেটেড মলমূত্র, আর ননগেজেটেড মলমূত্রের জাত আলাদা। তিনি যেই শেষ করলেন, ইনি প্রশ্ন করলেন, আর ইউ গেজেটেড?

পা ফাঁক করে নেচে নেচে প্যাণ্টের ফাস্টনার আঁটতে আঁটতে তিনি বললেন, অ, সিওর। কাণ্ট ইউ রেকগনাইজ মি ফ্রম দি স্মেল অফ মাই ইউরিন?

বড়সায়েব ট্যুরে চলেছেন। সঙ্গে চলেছেন কয়েকজন কুঁচো সায়েব। সার্কিট হাউসে পদার্পণ করেই তিনি গরম জল, চা চিকেনের ফরমায়েশ পেশ করে কুঁচোদের বললেন, যান, আপনারা আপনাদের মত একটা হোটেল-টোটেল দেখে নিন। এতক্ষণ একই জিপে এঁরা এসেছেন। গল্পগুজবও হয়েছে। মাঝে-মধ্যে রাস্তার পাশে গাড়ি দাঁড় করিয়ে চা, সিঙাড়া, কৃষ্ণনগর হলে সরপুরিয়া, শক্তিগড় হলে ল্যাংচা, গোবরডাঙ্গা হলে কাঁচাগোল্লা, মুর্শিদাবাদ হলে ছানাবড়া

সেবন হয়েছে। সার্কিট হাউসে অনেক ঘর কিন্তু চাকরিতে যারা নীচ জাতীয় তাদের সঙ্গে সহবাস চলে না। নীচ জাতীয়া মহিলার সঙ্গে সহবাস কিন্তু-শাস্ত্র সম্মত। আমাদের শাস্ত্রে আছে, বিদেশী শাস্ত্রেও সেই এক বিধি। সাদা সায়েবরা এদেশে সেই প্রজাতি রেখে গেছেন।

মাঝরাতে বিনা নোটিশে সপার্ষদ মন্ত্রী এসে হাজির হলেন। সবকটা ঘরই তাঁর লাগবে। সায়েব তাঁর লটবহর, গেলাসে হাবুডুবু নকল দাঁত সহ, সার্কিট হাউসের হাতায় অর্জুন গাছের তলায় গিয়ে বসলেন। রাত কেটে গেল তারা গুনে।

ছোট করে দাও, চেপে দাও, দুমড়ে মুচড়ে দাও। ক্ষুদ্র মানুষ কল্পনায় বিশাল হতে চায়। মনস্তত্বের ব্যাখ্যায় একে বলে বিপরীত ইচ্ছা। ক্ষুদ্র করে রাখার চেষ্টা হলেই প্রতিরোধ তৈরি হবে। বিশালের কল্পনা আসবে। গাছের ফল ন্যাকড়া বেঁধে রাখলে বড় হয়। মানুষ সহসা বড় হতে পারে না। জগতাতীতে সে পূর্ণতা খোঁজে। অরণ্য-দেবকে ভালবেসে ফেলে। আসলে যা হয়, সব মানুষের ক্ষেত্রেই যা সত্য, সে স্যাডিস্ট হয়ে যায়। পরকে মারার ইচ্ছে পূর্ণ হলে, নিজে মার খাবার ইচ্ছে অবচেতনে লুকিয়ে বসে থাকে। যুদ্ধের নিয়ম হল, কিল অর বি কিল্‌ড। পরের দাসত্বে মানুষ মাধুর্য খুঁজে পায় একই কারণে। নিপীড়নের ইচ্ছা নিপীড়িতে তৃপ্তি খুঁজে পায়। খুব ঝেড়েছির মত খুব ঝাড় খেয়েছিতেও একই আনন্দ। প্রেম, প্রীতি ভালবাসা এক ধরনের ক্লান্তির আকাঙ্ক্ষা। বৃদ্ধ মাস্তান যেমন হৃতবল হয়ে, কপালে তিলক সেবা করে, ভাগবত পাঠের আসরে বসে, দুলে দুলে কীর্তন শোনে। লোকে ভাবে এত প্রেম ছিল কোথায়! দাঁত পড়ে গেছে তাই নিরামিষাশী। চোখে ভাল দেখতে পাই না তাই জগৎ সুন্দর। ঘাড় মটকাবার শক্তি নেই তাই :

হা হা প্রাণপ্রিয় সখী কী হৈল মোরে।
কানু প্রেমবিষে মোর তনু-মন-জড়ে॥

রাতিদিন পোড়ে মন সোয়াৎ না পাও।
যাঁহা গেলে কানু পাও তাঁহা উড়ি যাও॥

প্রেম আবার কি? একপক্ষে অধিকার বোধ আর একপক্ষে আত্ম বিসর্জন। আমাতে আত্মসমর্পণ কর আমি তোমাকে বাঁচিয়ে রাখব। স্বামী স্ত্রীকে বললেন, যা বলব তাই শুনবে, প্রতিবাদ করবে না, উঠতে বললে উঠবে, বসতে বললে বসবে। তুমি আমার পেট ডগ। বিছানা পাবে, বালিশ পাবে, সিল্ক পাবে, সোনা পাবে। পিতা পুত্রকে বললেন, অবাধ্য হবে না। দুষ্টু গরুর চেয়ে শূন্য গোয়াল ভালো। মালিক শ্রমিককে বললেন, নতজানু হও, বোনাস পাবে। চেলারা নেতাকে বললেন, আমাদের কালটিভেট কর গুরু তবেই গদি থাকবে। আইনের প্রভুরা বললেন, সন্তুষ্ট রাখুন, বেআইনী চালাতে দোব। স্বর্গ কোথায়? পলাতকের দুর্বলতায়। এরিক ফ্রমকে টেনে আনি, The power of the one to whom one submits is inflated, may he be a person or a god, he is everything. I am nothing except in as much as I am part of him.

তাসের ঘর

টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। মাঝে মাঝে দমকা হওয়া আসছে উত্তর থেকে। ভীষণ ঠাণ্ডা। অন্যদিন এই সময়টায় শশাঙ্কবাবু সাধারণত বেড়াতে যান। গলি পেরিয়ে বড় রাস্তা। বড় রাস্তা পেরিয়ে আবার গলি। গলির মধ্যে ঘুরপাক খেতে খেতে সন্ধের মুখেই ফিরে আসেন বাড়ির দরজায়। বৃদ্ধ মানুষ। সকাল-বিকেল না বেড়ালে ভালো হজম হয় না। এই বয়েসে লোভটাও বাড়ে। মাঝে-মধ্যে লুকিয়ে-চুরিয়ে এটা সেটা খেয়ে ফেলেন। তারপর পেট যখন হাঁসফাঁস করে তখন প্রতিজ্ঞা করেন, না, আর কখনো অখাদ্য-কুখাদ্য খাব না। আজ সেইরকম একটা দিন। সকালে মেঘলা দেখে দুটো চপ খেয়েছিলেন। দুপুরে খেয়েছেন খিচুড়ি আর সেঁকা পাঁপড়। একটু আগে খেয়েছেন চা আর নিমকি। এখন বেশ অস্বস্তি হচ্ছে। অন্যদিন এক মাইল বেড়ালে আজ তিন মাইল বেড়ানো উচিত।

ঘরের একটা জানালা খুলে শশাঙ্কবাবু আকাশের দিকে তাকালেন। আরো কালো হয়ে এসেছে আকাশ। চারপাশ যেন মাকড়সার জালে ঢাকা পড়ে গেছে। ছাতা নিয়ে বেরনো যেত যদি দমকা হাওয়া না থাকত। জানালাটা আবার বন্ধ করে দিয়ে ঘরের মধ্যেই পায়চারি শুরু করলেন। সন্ধের আগেই ঘরে অন্ধকার নেমেছে। আলোটা জ্বালালেও হয়, না জ্বালালেও হয়। সারা দুপুর অনেক পড়েছেন। ঝাপসা আলোয় পায়চারি ভাল। ঘরে ঘুরে ঘুরেই তিন মাইল বেড়িয়ে নিতে হবে।

একটা ফ্ল্যাটের একেবারে ওপরের তলায় শশাঙ্কবাবু থাকেন। স্ত্রী মারা গেছেন। একটি ছেলে, একটি মেয়ে। দুজনেই উচ্চ শিক্ষিত। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। থাকে জামসেদপুরে। ছেলের বিয়ে হয়-

নি। ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বড় চাকরিতে ঢুকেছে। ছেলের বিয়ে দেবার চেষ্টা করছেন। বেশি দেরি করতে চান না। বৃদ্ধ বয়েসে একা থাকতেও ভাল লাগে না। সারাদিন নিঃসঙ্গ। বই, কাগজ, ছবি, আকাশ, ফুলগাছের টব, বারান্দা, রাস্তা, আশপাশের বাড়ি—এই তো তার জগৎ! এর বাইরে তো যাবার উপায় নেই। কাঁহাতক ভালো লাগে। ঠিকে একজন কাজের লোক আছে। ফুড়ুক করে আসে, ফুড়ুক করে পালিয়ে যায়। মাঝে-মধ্যে একটা ছোঁচা বেড়াল আসে সঙ্গ দিতে। তিনি তাকে দুধ রুটি মাছ খাইয়ে তোয়াজ করেন। যদি পোষ মেনে যায়। একটা কিছু নিয়ে থাকতে হবে তো।

শশাঙ্কবাবু এতক্ষণ গোল হয়ে ঘুরছিলেন। হঠাৎ তাঁর একটু মজা করার ইচ্ছে হল। ঘুরে ঘুরে ইংরিজি অক্ষর লিখতে শুরু করলেন —এ বি সি ওয়াই এম ডবল্যু। রাত আটটা কি নটার সময় সুধী আসবে। ছেলের নাম সুধী। তার আগে অবশ্য রান্নাবান্না করার মহিলাটি এসে যাবে। মুখে পান। খোঁপাটা মাথার পেছন দিকে উঁচু করে তুলে বাঁধা। মহিলাটির চালচলন কেমন কেমন হলেও রাঁধে ভাল। কামাই করে না।

হঠাৎ কলিং বেলটা বেজে উঠল। এমন সময় কারুর তো আসার কথা নয়। আজকাল পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে দরজার কড়া নড়লে, কি বেল বাজলে ভয় করে। একা থাকেন। শরীরে তেমন শক্তিও নেই। অস্ত্রও রাখেন না। ইদানিং ফ্ল্যাট বাড়িতেই তো নানারকম খুনখারাপি হচ্ছে। দরজার ম্যাজিক আইও নেই যে আগন্তুককে দেখে নেবেন।

শশাঙ্কবাবু গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলেন—কে?

সঙ্গে সঙ্গে ওপাশ থেকে জবাব এল—আমি।

—কে সন্ধ্যা?

—না আমি।

—তবে কি রমা?

রমা হল নিচের ফ্ল্যাটের পরেশবাবুর মেয়ে। মাঝে মাঝে বেড়াতে আসে। মেয়েটি দেখতে শুনতে ভাল, তবে ছেলের বউ করা চলে কিনা ভাবতে হবে।

—না আমি।

শশাঙ্কবাবু খুব সমস্যায় পড়ে গেলেন। মহিলা কণ্ঠ, অথচ সন্ধ্যা নয়, রমা নয়। তাহলে কে? কোন পুরুষ মহিলার গলা নকল করছে বলে মনে হয় না। ওপাশে নির্ভেজাল কোন মহিলাই দাঁড়িয়ে আছেন। একমাত্র মহিলারাই কে জিজ্ঞেস করলে আমি আমি করেন। তাছাড়া শাড়ির খসখস শুনতে পাচ্ছেন।

—দয়া করে নামটা বলবেন? শশাঙ্কবাবু সরাসরি নাম জিজ্ঞেস করলেন।

—দরজাটা খুলুন। নাম বললে চিনতে পারবেন না।

—না না, আজকাল দিনকাল ভাল নয়। পরিচয় না দিলে দরজা খুলব না।

—আ গেল যা। পুরুষ মানুষ হয়ে মেয়েছেলের মত ভয়ে মরছে ভ্যাখো!

শশাঙ্কবাবু অবাক হয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে রইলেন। কথা শুনে বুঝতে পেরেছেন, চোর ডাকাত নয়, আদি অকৃত্রিম গেরস্থ মহিলা। সাহস করে দরজাটা খুলে দিলেন। দরজার সামনে মোটাসোটা মাঝবয়সী এক মহিলা। পাকা পেয়ারার মত রঙ। হাতে ঝুলছে পেটমোটা চটের লেডিজ ব্যাগ। মহিলা সংক্ষিপ্ত একটি নমস্কার ঠুকেই বললেন,

—বিপদে পড়ে এসেছি। চিনতে পারছেন কিনা জানি না। পেছনের ফ্ল্যাটের দোতলায় থাকি। দু-একবার চোখাচোখি হয়েছে। একদিন বাসে ওঠার সময় আমাকে ধাক্কা মেরে নিজেই টাল খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন। ধরেছিলুম বলে মাথাটা পেছনের চাকায় যায়নি। মনে পড়ছে?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। ভেতরে আসুন, ভেতরে আসুন। কি বিপদ বলুন ?

মহিলা ভেতরে এসে দরজার ছিটকিনি লাগাতে লাগাতে জিজ্ঞেস করলেন।

—এখন কারুর আসার সম্ভবনা আছে ?

—আজ্ঞে না।

—বেশ—খুব ভাল কথা। আপনার শোবার ঘরে একবার চলুন তো।

শশাঙ্কবাবু মহিলার অসঙ্কোচ ব্যবহারে প্রথম থেকেই হকচকিয়ে গিয়েছিলেন, এইবার একেবারে অভিভূত হয়ে বললেন,

—না না শোবার ঘরে কেন ? বসার ঘরে বসাই তো ভালো।

—বসতে আমি আসিনি। এসেছি কাজে। সে কাজটা শোবার ঘরে না গেলে হবে না।

কথা বলতে বলতেই মহিলা শোবার ঘরের দিকে এগোতে লাগলেন। শশাঙ্কবাবু খুব অবাক হলেন। কোনটা শোবার ঘর মহিলার জানা। হাত ধরে টেনে আনতেও পারছেন না। পায়ে পায়ে এগোতে লাগলেন। শোবার ঘরেই সংসারের যথাসর্বস্ব। দুপাশে দুটো খাট। একটা নিজের অন্যটা ছেলের। দুজনে একই ঘরে শোন। শশাঙ্কবাবু একা শুতে পারেন না। ঘুম আসে না, ভয় ভয় করে। দরজার পাশে আলোর সুইচ। জ্বালাতে যাচ্ছিলেন। মহিলা হাঁ হাঁ করে উঠলেন—

—খবরদার না। আলো জ্বালালেই সব মাটি হয়ে যাবে।

শশাঙ্কবাবু হাত সরিয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন,

—কি করতে চাইছেন আপনি ? আমি তো মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।

মহিলা শশাঙ্কবাবুর বালিশ থেকে তোয়ালেটা তুলে নিয়ে মাথা মুছতে মুছতে বললেন,

—ওয়াচ। ওয়াচ করতে চাইছি।

—তার মানে? কাকে ওয়াচ করবেন?

—ওই যে ও বাড়ির বুড়োটাকে। আমার স্বামী।

শশাঙ্কবাবুকে আর কোন প্রশ্নের সুযোগ না দিয়ে উত্তর দিকের জানালার খড়খড়িটা ফাঁক করে দেখতে দেখতে বললেন,

—হুঁ, আলো জ্বালা হয়নি। তুমি যাও ডালে ডালে আমি যাই পাতায় পাতায়। কতক্ষণ তুমি আলো না জ্বেলে থাকবে। এই আমি বসলুম খাটের কিনারায়।

শশাঙ্কবাবু অবাক হয়ে দেখলেন, মহিলা তার খাটের পাশে বেশ জাঁকিয়ে বসেছেন। একটা পা তুলে দিয়েছেন মাথার বালিশে। কিছু বলতেও পারছেন না চক্ষুলজ্জায়। অথচ প্রায় অপরিচিতা এক মহিলা একেবারে বিছানায় গিয়ে বসবেন এটাও বরদাস্ত করা যায় না।

ছেলের খাটে বসে ব্যাপারটাকে একটু পরিষ্কার করার জন্যে জিজ্ঞেস করলেন,

—ব্যাপারটা কি?

—ব্যাপার? বুড়োকে ঘোড়া-রোগে ধরেছে।

—বুড়ো কাকে বলছেন, আমাকে?

—ছিঃ, আপনাকে কোন সাহসে বলব? বলছি আমার কত্তাকে। সেই কচিখেকো দেবতাটিকে।

—তার মানে?

—তাহলে একটু ভেঙেই বলি। তার আগে জিজ্ঞেস করি, চায়ের ব্যবস্থা-ট্যবস্থা আছে?

—ব্যবস্থা আছে, করার লোক নেই।

—একটু চা না খেলে ঠাণ্ডায় যে মরে যাচ্ছি। আমি করলে আপত্তি আছে?

—আপত্তি নেই, তবে সেটা কি ভাল দেখাবে।

—ওঃ বাবা। আজকাল আবার ভাল-মন্দর অত বিচার আছে নাকি! চলুন কোথায় কি আছে দেখে নি।

চা তৈরি হল। শশাঙ্কবাবু বিস্কুট বের করলেন। বসার ঘরেই চা-পর্ব শুরু হল। মহিলা চা খেতে খেতে নিজেকেই নিজে তারিফ করলেন,

—চা-টা বেশ করেছি, কি বলেন?

—হ্যাঁ বেশ হয়েছে।

—তাও তো মন মেজাজ খিঁচড়ে আছে।

চা খেতে খেতে মহিলা যা বললেন, স্বামী ঠিকেদারী করেন। পয়সা কড়ি আছে। মহিলা বড় একটি হাসপাতালের নার্স। ছেলে-পুলে হয়নি। বছরখানেক হল ভদ্রলোক দূর সম্পর্কের এক আত্মীয়াকে বাড়িতে এনে রেখেছেন। মেয়েটি কলেজে পড়ে। সেই মেয়েটিকে কেন্দ্র করেই যত অশান্তি। খালি কাপটা টেবিলে রেখে মহিলা বললেন,

—চারদিকে ছি ছি পড়ে গেছে। কান পাতা যাচ্ছে না। নিচের ফ্ল্যাটের নন্দা অনেক কিছু দেখেছে। সেদিন আমার খোঁজে দুপুরবেলা ওপরে উঠেছিল। ওপরে উঠে দেখে, আরে ছি ছি, বুড়োর মুখে আগুন।

শশাঙ্কবাবুর অন্যের পারিবারিক কথা শুনতে ভালো লাগছিল না। এসব নোংরা ব্যাপারে তাঁর জড়িয়ে পড়তে একদম ইচ্ছে করছিল না। মহিলাকে কোনরকমে বিদায় করতে পারলে তিনি বেঁচে যান। একি উটকো ঝামেলা। শশাঙ্কবাবু চাইলেই তো আর হবে না, মহিলা নিজের মনে বলছেন,

—অ্যাঁ, যে বয়েসে লোক বনে যেত, সেই বয়েসে তুই ভর দুপুরে একটা ছুঁড়িকে কোলে বসিয়ে মুখে রসগোল্লা গুঁজে দিচ্ছিস? তাহলে আমার যখন নাইট ডিউটি থাকে তখন তুই কি করিস? কি শয়তান, কি শয়তান!

মহিলা সোফা ছেড়ে উঠে পড়লেন। শশাঙ্কবাবু হাঁ করে দেখছেন তাঁর গতিবিধি। আবার শোবার ঘরের দিকে চলেছেন। উত্তরের জানালা দিয়ে তাকালে একটা বারান্দার কিছু অংশ, একটা ঘরের পুরোটাই চোখে পড়ে। খাট, ড্রেসিং টেবল, চেয়ার, আলনা। বারান্দার রেলিং-এ লাল টকটকে একটা সায়ার তলার দিক হাওয়ায় অসভ্যের মত ফুলে ফুলে উড়ছে। খড়খড়ি জানালার পাখি ঈষৎ ফাঁক করে মহিলা নিজের শোবার ঘরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বললেন,

—মহারাণীর চুল বাঁধা হচ্ছে। আহা যেন অভিসারে যাবেন! মরণ আর কি? বুড়োটা গেল কোথায়, দেখছি না তো।

শশাঙ্কবাবুর খুব ইচ্ছে করছিল ঘটনার নায়িকাকে একবার চোখের দেখা দেখেন। মনের ইচ্ছে মনেই চেপে রাখলেন। মহিলা দাঁতে দাঁত চেপে বললেন,

—শয়তানী আমার মাথা খাবার জন্যে এসেছেন। মানুষের উবগার করতে নেই।

—আপনার স্বামীকে বারণ করুন না। বোঝাতে পারছেন না!

—বোঝানো? ঝাঁ্যাটাপেটা পর্যন্ত হয়ে গেছে। পুরুষ হল পতঙ্গ। আগুন দেখলেই ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমার দিকে একবার তাকিয়ে দেখুত তো, আর ওটাকেও একবার এখানে এসে দেখে যান। তারপর বলুন তো, আমার কোন জিনিসটা কমতি আছে! আসুন, আসুন।

শশাঙ্কবাবু পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন। চোখে ক্যাটারাক্ট ফর্ম করছে। ভাল দেখতে পেলেন না। তবু তাঁর মনে হল, এই মহিলার তুলনায় ওই মেয়েটির সব কিছুই কম কম—বয়েস কম, মেদ কম। বেশির মধ্যে চুল, শরীরের খাঁজ। সরে এলেন শশাঙ্কবাবু। এইবার তাঁকে বিচারকের রায় দিতে হবে।

—না আপনার চে' সব কিছুই ওনার কম কম। কেবল চুলটাই যা বড়।

—আরে মশাই, ওই বয়েসে আমার চুলও পাছা ছাড়িয়ে নামত। এখনই না হয় টিকটিকির ন্যাজ হয়ে গেছে। সব পুরুষেরই এক রা, সব শেয়ালের মত। চুল আর বুক দেখেই গলে গেল।

শশাঙ্কবাবু নিজেকে খুব অপরাধী মনে করলেন। সত্যিই তো মেয়েদের ওই দুই বস্তুর প্রতি যৌবনে তিনিও ভীষণ আকর্ষণ বোধ করতেন। মনটা কেমন হু হু করে উঠত। সেই আকর্ষণের ছিটেফোঁটা বুড়ো শরীরে এখনও পড়ে আছে। হিংসে হলে কি হবে, মেয়েটির চুলের ঢল সত্যিই চোখে পড়ার মত। মাথাটা একপাশে কাত করে চুলে চিরুনি চালাচ্ছে, সন্ধেবেলা আলো ঝলমলে ঘরে দীর্ঘকায় স্লিম এক মহিলা, সংসারে এর চে' সুখের দৃশ্য আর কি আছে। অথচ এই মহিলাটি রাগে জ্বলে যাচ্ছেন।

চটের হাত ব্যাগ থেকে অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে মহিলা চ্যাপ্টা একটি কৌটো বের করে মুখে কিছু পুরলেন। পাশের ঘরের আলোর আভা এ ঘরে এলেও শশাঙ্কবাবু স্পষ্ট কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। শব্দ শুনে মনে হল পান চিবোচ্ছেন।

—পান খাবেন? মিষ্টি মশলা দিয়ে সাজা।

—সন্ধেবেলা পান আর খাবো না। আগে খুব খেতুম। এখন সকালে খাবার পর সুপুরি ছাড়া এক খিলি খাই।

—আমি খুব খাই। ঘুম থেকে উঠে শুরু করি যতক্ষণ না শুতে যাচ্ছি। কিছু একটা নিয়ে থাকতে হবে তো। ছেলে নেই পুলে নেই! সংসারটাও পরের হাতে চলে যেতে বসেছে। ফ্রাসট্রেশন, ফ্রাসট্রেশন।

মহিলা চৌকির ওপর বেশ ভালো করে নড়েচড়ে বসতে বসতে খুব ঘরোয়া গলায় জিজ্ঞেস করলেন,

—ওই খাটে কে শোয়?

—আমার ছেলে।

—আমি যেটায় বসে আছি?

—ওটা আমার।

—একই ঘরে বাপ ছেলে। ছেলের বিয়ে দিতে হবে তো?

—হ্যাঁ মেয়ে দেখছি।

—তখন তো ঘর আলাদা করতে হবে।

—বসার ঘরের একপাশে সরে যাবো। অসুবিধের কিছু নেই।

—ছেলের বউ একটু দেখেশুনে করবেন। আজকালকার মেয়েদের ছিরি দেখছেন তো। নিজের বউটিকে তো খেয়ে বসে আছেন! যে বয়সে নিজের বউকে সব চে' বেশি দরকার হয় সেই বয়সেই তো ঘর খালি। এখন লাগছে কেমন একলা একলা?

—একটু ফাঁকা ফাঁকা লাগে। সকলকেই তো যেতে হবে। আগে আর পরে।

শশাঙ্কবাবু শব্দ করে হাসলেন। হেসে অন্যের চোখে ধরা পড়ে যাওয়া নিঃসঙ্গতাটা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলেন। মহিলা শুনলেন কি শুনলেন না বোঝা গেল না। জানালার পাখি খুলে চোখ রেখেছেন। পুরো মনযোগটাই ওখানে। চাপা একটা গর্জন শোনা গেল,

—আ-হা-হা-হা, পটের বিবি। মরা মানুষেরও লজ্জা থাকে, উনি শুধু সায়া পরে ঘরময় উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছেন। জানালা খোলা। আলো জ্বলছে। সায়ার রঙ দেখো—লাল, নীল, হলদে, সবুজ। যে জিনিস চাপা থাকবে তার আবার অত রঙের বাহার কি জন্যে? আমাদের আমলে সব সাদা ছিল। এখন আবার লুঙ্গি উঠেছে। বুড়োটা নিশ্চয় ঘরের মধ্যেই কোথাও ঘাপটি মেরে বসে বসে উর্বশীর নৃত্য দেখছে। বাড়ি নয় তো বেশ্যালয়।

জানালার পাখি ফেলে দিয়ে মহিলা সোজা হয়ে বসে শশাঙ্কবাবুকে প্রশ্ন করলেন,

—আজকাল মেয়েগুলোর কি হয়েছে বলতে পারেন? পুরুষদের না হয় ফুলে ফুলে মধু খেয়ে উড়ে বেড়ানোই চিরকালের স্বভাব। ছুঁড়িগুলোর এই মতিচ্ছন্ন ধরেছে কেন?

শশাঙ্কবাবু কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। প্রশ্নের কি জবাব দেবেন ভেবে পেলেন না। এক সময় বললেন,

—কালের হাওয়া।

শশাঙ্কবাবু নিজেকে সামলে নিয়ে সাবধানে, হিসেব করে করে বললেন,

—এক এক বয়সের মেয়েকে এক এক রকম দেখতে। কম বয়েসে এক রূপ, বেশি বয়েসে আর একরকম রূপ। দুটো রূপই ভালো।

মহিলা খাটের ওপর বেশ করে নড়েচড়ে বসলেন। সাবেক আমলের অমন শক্ত খাটও শব্দ করে উঠল। মুখে আর একটু মশলা ফেলতে ফেলতে বললেন,

—রূপসী অ-রূপসীর কথা হচ্ছে না, আমার কথা হল তোয়াজ। ক'টা স্বামী মশাই স্ত্রীকে তোয়াজে রাখতে পারে? সারা জীবন বাবুরা ধামসে যাবেন, বুড়ো বয়েসে চাইবেন স্ত্রীর যৌবন, পাছা ভর্তি চুল, সরু কোমর, টান টান তেল তেল চামড়া, হাত ভর্তি...

শশাঙ্কবাবু আতঙ্কে কেশে উঠলেন। এঁর মুখে তো কোন কথাই আটকায় না।

—কাশি হয়েছে দেখছি। আর হবে না। বর্ষায় চারদিক চ্যাপ-চ্যাপে হয়ে আছে। রক্তের জোরও তো কমছে। বুকে বসেছে?

—না, শুকনো কাশি।

—একটু মালিসটালিস, কেই বা করবে! এই বয়সের বিধবাদের বড় কষ্ট। ওই মড়া কিন্তু বুঝল না, বউ কি জিনিস? এই তো সেবার, অস্থানে বিষফোঁড়া হল। সারারাত ঘুমোতে পারে না। কে সেবা করল? ফুর্তির মেয়ে জুটবে অনেক। কথায় বলে ভাত ছড়ালে কাগের অভাব হয় না। কিন্তু সেবার মেয়ে ওই একটাই—

বউ। কিল মার, চড় মার, ঝাঁটা মার, শেষ পর্যন্ত বউ-ই ভরসা। বয়েস তো হল, অনেকের অনেক নেতাই তো দেখলুম, ঘাড়ে পাউডার, চুনট করা ধুতি, বার্নিস করা জুতো, শালীর সঙ্গে রপটারপটি, ভাদ্দর বউয়ের সঙ্গে গা ঘসাঘসি, বন্ধুর বউয়ের সঙ্গে লুকোচুরির পিরিত, মাসকাবারি মেয়েমানুষ, শেষকালে বুড়ো এসে মরল বউয়ের কোলে —ওগো তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই গো! ঘেন্না ধরে গেল জীবনে।

মহিলা জানালার পাখি ফাঁক করে আর একবার দেখলেন। শশাঙ্কবাবু ভেবেছিলেন কোনও রকম মন্তব্য হবে। না, হল না। অনেকক্ষণ বসে থেকে থেকে নিজেকে এইবার একটু ক্লান্ত মনে হচ্ছে। তা হলেও সন্ধেটা বেশ কাটল। মহিলা উঠে দাঁড়ালেন। একটা হাই উঠল। দু হাত মাথার ওপর তুলে আড়মোড়া ভাঙলেন। ঘরে আলো না জ্বললেও, বারান্দা থেকে আলোর একটা আভা ঘরে এসেছে। একটা আবছা স্বপ্ন-স্বপ্ন পরিবেশ। চওড়া পাড় তাঁতের শাড়ি, হালকা রঙের ব্লাউজ। শরীরটা সামান্য ভেঙেচুরে খুব পরিচিত একটা ভঙ্গি তৈরি হয়েছে। সকালে ঘুম থেকে উঠে সেও তো এইভাবে শরীর ভাঙত। বয়েস যখন কম ছিল শশাঙ্কবাবু ঠিক এই রকম মুহূর্তে লোভ সামলাতে না পেরে স্ত্রীর কোমর জড়িয়ে ধরে খাটে উল্টে ফেলে দিতেন। না, না, অতীত অতীতই, প্রাচীন ব্যাপার-স্যাপার নিয়ে মনকে দুর্বল করে তোলা ঠিক নয়।

বিছানা থেকে চটের হ্যাণ্ডব্যাগটা তুলে নিয়ে মহিলা বললেন,

—যাই। গিয়ে সংসারের চুলোই আগুন ধরাই। মেয়েদের এই জ্বালা, যখন আদর জোটে, তখন ফুটকলাই নিয়ে ফোটে। যখন আদর টুটে তখন মুগুর দিয়ে ঠোঁকে।

শশাঙ্কবাবু পেছন পেছন দরজা পর্যন্ত এলেন। বেঁটে মহিলা, দরজার ছিটকানিতে হাত পাবেন না। ঘাড়ের কাছে সরু সোনার হার চিকচিক করছে আলো পড়ে। গোল-গোল হাতে সাদা শাঁখা।

শশাঙ্কবাবু গড়ন-পেটন মানেন। তন্ত্রে এই ধরণের চেহারার যে উল্লেখ আছে তা যদি ঠিক হয়, তাহলে এই মহিলা লক্ষ্মীমন্ত। ছিটকিনি খুলতে খুলতে প্রশ্ন করলেন,

—আপনাকে বিয়ে করার পরই কত্তার ভাগ্য ফিরেছে, তাই না? দরজার সামনে থমকে দাঁড়িয়ে মহিলা বললেন,

—ঠিক ধরেছেন তো। জ্যোতিষ-টোতিষ করেন নাকি?

—তেমন ভাবে করি না, তবে বেকার মানুষ, একটা কিছু নিয়ে থাকতে হবে তো।

—তাহলে এবার যেদিন আসব কোষ্ঠীটা আনব।

মহিলা বেরোচ্ছেন শশাঙ্কবাবুর কাজের মহিলাটিও ঢুকছে। অবাক হয়ে একবার তাকিয়ে দেখল। এ আবার কে! মেয়েটির আজ টান করে চুলবাঁধা। ফেত্তা দিয়ে শাড়ি পড়েছে। অন্যদিনের চেয়ে আজ যেন সাজের ঘটা একটু বেশি। বেশ গুছিয়ে নিজের মত করে কাজ করে, তাই সব বেচাল সহ্য করে নিতে হয়। মাঝে মাঝে গুন গুন করে গানও গায়। একটু ফিচলেও আছে। এই তো সেদিন, শশাঙ্কবাবুর সামনেই ব্লাউজের মধ্যে দিয়ে হাতার পিছন ঢুকিয়ে পিঠ চুলকোচ্ছিল। কোন সংকোচ নেই। উলটে জিজ্ঞেস করল, 'ঘামাচির পাউডার আছে আপনার কাছে?' পাশ দিয়ে চলে গেলে কেমন একটা যৌনতার আঁচ গায়ে লাগে। রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে, তাও মাঝে মাঝে চমকে উঠতে হয়।

দরজার ছিটকিনি লাগিয়ে শশাঙ্কবাবু নিজের ঘরের দিকে এগোতে এগোতে বললেন,

—মানু, একটু চা করবে নাকি?

রান্নাঘরের পাশের কলে অনেকখানি কাপড় তুলে মানু পায়ের গোড়ালি ধুচ্ছিল। ভাল দেখতে পান না তবু ক্ষণিকের জন্যে শশাঙ্কবাবুর নজর চলে গেল শ্যামলা দুটি পায়ের গোছে। সায়ার ঝোলা অংশ, শাড়ির পাড়, নির্জন বারান্দা, ঝিমঝিম বৃষ্টির শব্দ,

ভিজে গাছের পাতা দোলানো বাতাস,প্রতিবেশীর রেডিও থেকে ভেসে আসা সংগীত, নাঃ, জীবন একটা মধুর অনুভূতি। ফুরিয়ে গিয়েও ফুরোতে চায় না। হঠাৎ মনে পড়ল, যুও, যুবতী, ভাজা। তিন বাদলের মজা।

—মানু আর পা ঘসো না, এবার ক্ষয়ে যাবে।

—রাস্তার যা অবস্থা, ঘেন্না করে, ম্যাগো।

—জান তো দাদাবাবু আজ ফিরবে না, কলকাতার বাইরে গেছে।

—জানি, সকালে বলে গেছে আমাকে। তার থেকে ওই গামছাটা দিন তো। ওটা নয়, ওটা নয়, ওই পাশের লালটা।

—আরে বাবা লাল-নীল বোঝার মত কি আর চোখ আছে আমার। এই নাও ধর।

—বাদাম দিয়ে চিঁড়ে ভাজব, খাবেন ?

শশাঙ্কবাবু না বলতে পারলেন না। মানুর খাবার ইচ্ছে হয়েছে। না বললে নৃশংসতা হবে।

—হ্যাঁ হ্যাঁ কেন খাবো না ? ভাজ ভাজ, বর্ষায় জমবে ভাল।

মানুকে শোনাতে ইচ্ছে করল, যুও, যুবতী, ভাজা। তিন বাদলের মজা। এসব কথা হঠাৎ বলা যায় না। নিজেকে সংযত করে রাখলেন। তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়লেন নিজের ঘরে। মন বড় মাতাল হয়েছে। বিবাহিত জীবনের কত অভ্যাস স্ত্রী বিয়োগের পর জোর করে ভুলতে হয়েছে। বাবা! অভ্যাস-দোষ না ছাড়ে চোর। শুন্য ভিটায় মাটি খোঁড়ে।

বিছানায় কাত মেরে শুয়ে পড়লেন শশাঙ্কবাবু। বেডকভারটা একটু কুঁচকে মুচকে গেছে। বালিশের ঢাকাটা একটু ভিজে ভিজে। চুলের আর তেলের গন্ধ। নাকের কাছে কি একটা সুড়সুড় করছে। হাত বাড়িয়ে আলোটা জ্বাললেন। গোটাকতক লম্বা চুল আটকে আছে তোয়ালের রোঁয়ায়। বেডকভারের যে জায়গাটায় মহিলা বসে-ছিলেন সেই জায়গাটাও সামান্য ভিজেছে। শাড়িটা বোধ হয় বৃষ্টিতে

ভিজেছিল। আলোটা নিবিয়ে দিলেন। স্ত্রী সুধাও মাথায় গন্ধ-তেল মাখত। সারা ঘরে এইরকম একটা গন্ধ ভেসে বেড়াতো। অনেক-দিনের স্মৃতি আবার ভেসে এল। মহিলাশূন্য নীরস সংসারে কিছু-ক্ষণের জন্যে যেন রসের ধারা বয়ে গেল। শশাঙ্কবাবু চাদরের ভিজে জায়গাটায় বারকয়েক হাত বুলোলেন। বালিশের ঢাকায় মুখ জুবড়ে নিজের স্ত্রীকে মনে করবার চেষ্টা করলেন। যৌবন, সংসার, ভালবাসা, ঝগড়া, ভাব। শরীরটা মাঝে মাঝেই একটু সঙ্গ চাইত। সুধা সাবধান করত, একটু বুঝেসুঝে খরচ কর, তাহলে দেরিতে ফতুর হবে। নিজেই কেটে পড়লে, পড়ে রইল শশাঙ্ক। কার কখন তেল ফুরোয়, কে বলতে পারবে বাবা!

একটু বোধ হয় তন্দ্রামতো এসেছিল। মানু ঘরে এসে বলছে,

—একি, চিঁড়ে খাননি কাকাবাবু! আমি যে চা নিয়ে এসেছি।

শশাঙ্কবাবু ধীরে ধীরে উঠে বসলেন।

—আলোটা জ্বাল তো মানু।

ঘরের ওপর আলো লাফিয়ে পড়ল। শশাঙ্কবাবু যেন স্বপ্ন দেখছেন। চোখে ঘুম রয়েছে। সংসারটাকে বেশ ভরাট ভরাট লাগছে। সব যেন ফিরে এসেছে। এ কে? মানু, না সুধা? মানু বললে,

—অবাক হয়ে কি দেখছেন? শরীর খারাপ?

—না, শরীর খারাপ নয়। বিকেলে বেরোতে পারিনি তো সন্ধের দিকে গা-টা কেমন যেন ম্যাজ ম্যাজ করছে।

—সব কটা জানালা বন্ধ করে রেখেছেন, গরম লাগছে না?

চায়ের কাপটা খাটের পাশের ছোট টেবিলে রাখার জন্যে মানু নিচু হল। পরিপাটি করে বাঁধা খোঁপার দিকে শশাঙ্কবাবুর নজর চলে গেল। কুচকুচে কালো চুল। শাড়ির আঁচল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে মানু বললে,

—যা বর্ষা নেমেছে, কি করে বাড়ি ফিরে যাব ভাবছি?

—বাড়ি ফিরতেই হবে?

—না ফিরলে আর একজন তো হেদিয়ে মরে যাবে।

—না, তেমন হলে এখানেও তো শোবার ব্যবস্থা আছে।

—দেখি।

মানু চলে গেল। একবার শশাঙ্কবাবুর খুব জ্বর হয়েছিল, মানু একদিন সারারাত জেগে সেবা করেছিল। সন্ধে থেকেই মনটা বড় দুর্বল হয়ে পড়েছে। যে বাঘ একবার মানুষের রক্তের স্বাদ পায় সে নরখাদক হয়ে যায়। শশাঙ্ক কি সেই বাঘ? ভাজা মুচমুচে চিঁড়েও এখন পাগলে পাগলে খেতে হয়। দাঁতগুলো বাঁধিয়ে ফেললে কেমন হয়! মুখের চেহারাটা আবার যুবকদের মত হয়ে যাবে! চুলে একটু কলপ। আরও যুবক। মন-পাখি কি বুড়িয়ে গেছে? ভেতরটা আজ বড় শিরশির করছে। মানু যখন পেছন ফিরে চলে যাচ্ছিল তখন কেমন মনে হল! না মনটাকে বাঁধতে হবে।

নারী সংসৃতিমূলিকা, অর্গল স্বুরপুরকের।
চিত্রতমপি নহি দেখহিঁ বুদ্ধিমন্ত ঘনের।

এই সংসারে নারীই হল সংসারের মূল ও মোক্ষপথের বাধা। ছবির মেয়েছেলেও চিত্তচাঞ্চল্যের কারণ হয়। জ্ঞানী ব্যক্তি তাই ছবির মেয়েছেলের দিকেও ফিরে তাকান না।

শশাঙ্কবাবু আলোটা নিবিয়ে দিলেন। বিদ্রোহী শরীরটাকে বিছানায় চেপে রাখার ইচ্ছে। হঠাৎ মনে হল, জানলার পাখিটা ফাঁক করে একবার দেখি। সেই সায়া, ফুলে ফুলে উড়ছে। সেই মহিলা ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে খুব হাত নেড়ে অদৃশ্য কাউকে শাসন করছেন। বেশ ব্যক্তিত্ব আছে। সেই মেয়েটি কোথায়! অনেকটা মানুর মতই দেখতে। মানুর চেহারার বাঁধনটা এখনও ঠিক আছে। একটু যত্নে থাকলে কত লাগদাঁই হত!

দুই

দুপুরের দিকে মহিলা এলেন। এখনও বেশ চুল আছে। কপালটা তাই ছোট। বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটছে। নাকের ডগাতেও পুঁতির মত ঘামের দানা। নাকের ডগা ঘামলে প্রেমিক হয়। দরজাটা ভেজাতে ভেজাতে মহিলা বললেন,

—যত বর্ষা হচ্ছে তত গরম বাড়ছে।

ঘাড় বেঁকিয়ে শাড়ির পেছন দিকটা দেখতে দেখতে বললেন।

—চটি পরে বর্ষায় হাঁটা যায় না। কাদা ছিট্‌কেছে?

শশাঙ্কবাবু দেখলেন। সাদা শাড়ি ভারী শরীরে মোলায়েম হয়ে জড়িয়ে আছে। এখানে-ওখানে সামান্য কাদার ছিটে।

একটা দুটো ছিটে লেগেছে। একেবারে স্প্রে পেন্টিং হয়ে যায়নি।

—কাদার দাগ ওঠে না বুঝলেন, মনের দাগের মত।

—ছেলে কোথায়?

—ছেলে বেরিয়েছে।

—আজ আমার অফ ডে। বুড়ো জানে না। প্রথম প্রথম বলত আজ আর বেরিও না সুধা, নাইবা গেলে আজ।

—আপনার নামও সুধা?

—কেন?

—আমার স্ত্রীর নামও সুধা ছিল।

—ও। এখন কি বলে জানেন, তুমি বেরোবে না? না না কামাই করা ঠিক হবে না। দেশের মানুষ সাফার করবে। ওরে আমার দেশ হিতৈষীর বাচ্চারে! চলুন, ঘরে চলুন।

মহিলার এই আদেশের ভঙ্গিটা বেশ ভাল লাগে। তেমন তেমন মেয়ের কৃতদাস হয়েও তৃপ্তি পাওয়া যায়। মনে পড়ছে, দিগ্বিজয়ী যো শূর হোয়, বহুগুণসাগর তাহি। ভ্রূ-কটাক্ষ নো করত হোয়,

তাকো পদতলমাহি। দিগ্বিজয়ী, মহাবলশালী পুরুষ। মেয়েছেলের কটাক্ষপাতে পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ল। মহিষাসুরের বুকে দুর্গার শ্রীচরণ।

—এই নিন। ভুলিনি। কাশিটাকে তো কমাতে হবে। দু আঙুলে নিয়ে শোবার আগে বুকে লাগাবেন। মালিশ নয় শুধু ওপর ওপর লাগিয়ে দেবেন। আর এই নিন খাবার ওষুধ। শোবার আগে এক চামচে চেটে চেটে। ভাল মানুষের জন্যে করতে ইচ্ছে করে। মিচকে শয়তানটার জন্যে অনেক করেছি, দাম দিলে না।

—আপনি শুধু শুধু কষ্ট পাচ্ছেন। হয়ত শুধু শুধু সন্দেহ করছেন। ভদ্রলোক হয়ত মেয়ের মতোই ভালবাসেন।

—কিই ?

মহিলা খাটের ওপর ধপাস করে বসে, একটি পা বিছানায় রাখলেন।

—মেয়ের মত ? না মেয়েমানুষের মত ? শুনুন তবে, ছেলেপুলে হচ্ছে না দেখে দুজনেই ডাক্তারকে দিয়ে পরীক্ষা করালাম। ডাক্তার বললেন, গোলমাল আপনার নয়, আপনার স্বামীর। বুঝলেন ব্যাপারটা ! ও তো এখন বেপরোয়া। ঢোঁড়া সাপের বিষ নেই, ছোবলালেও মরবে না ! এইবার দেখুন।

উত্তেজিত মহিলা ব্যাগ থেকে একটা ভিউফাইণ্ডার বের করলেন, —নিন, চোখে লাগিয়ে দেখুন।

চোখ লাগিয়েই শশাঙ্কবাবু চমকে উঠলেন। উরে বাপ। একি! সাপ দেখছেন যেন। জিনিসটা তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে দিয়ে লজ্জায় চোখ নামিয়ে নিলেন।

—এইসব জিনিস বাড়িতে আসছে কিসের জন্যে ? বলতে পারেন কিসের জন্যে ? সন্দেহ ! সাধে সন্দেহ আসে ? মেয়েছেলে হতে পারি, মুখ্যু হতে পারি, তা বলে তো গাধা নই। প্রথম বয়েসে এসবের মানে বোঝা যায়, শেষ বয়সে মরার কালে এত চুলবুলুনি

কিসের? সব ওই ছুঁড়ির জন্মে। বুড়ো মড়ার যৌবন ফিরে এসেছে। আমার দিকে আর ফিরেও তাকায় না। ভালো কথা বললেও খিঁচিয়ে ওঠে। ওই ছুঁড়ি কিছু বললেই হেসে একেবারে গড়িয়ে পড়ে।

শশাঙ্কবাবু প্রসঙ্গটা ঘোরাতে চাইলেন।

—আজ একেবারে শরতের আকাশ।

—ওসব আকাশ-টাকাশ কবিরা দেখবে। আপনি কি কবি? একটা পান খাবেন নাকি, জর্দা দিয়ে?

চৌকো মত একটা পানের ডিবে খুলে পর পর ছুটো খিলি মুখে পুরলেন। ফর্সা গাল ছুটো ঠেলে উঠল। শশাঙ্কবাবু না বলতে পারলেন না। না বললেই মহিলা সন্দেহ করবেন, দাঁত নেই, ফোগলা দিগম্বর।

—দিন একটা খাই, অনেকদিন ছেড়েছুড়ে দিয়েছি। সুধাও গেছে, পানের পাটও উঠে গেছে।

—আর এক সুধা এসে আবার চালু করে দিচ্ছে। নিন। হাত পাতুন, একটু জর্দা দিই।

—না না জর্দা থাক। মাথা-টাতা ঘুরে পড়ে যাব।

—আহা, কচি খোকা। ঘুরে যায় যাবে, জল থাবড়ে দোব। জর্দার জন্মেই তো পান।

পান, পানের পিক, জর্দা সব ভেদ করে কথা আসছে জড়িয়ে জড়িয়ে। মহিলা উঠে দাঁড়ালেন, পিক ফেলবেন। শশাঙ্কবাবু বুঝতে পেরে বললেন,

—আসুন কোথায় ফেলবেন দেখিয়ে দিই। নর্দমার কাছে এসে ডান হাতে কাপড়ের সামনের দিকটা পুরুষ্টু ছুই উরুর মধ্যে ঠেসে ধরে, মুখটা ছুঁচ মতো করে পোয়াটাক পিক ফেলে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। চারপাশে চোখ ঘুরিয়ে বললেন,

—বাড়িটা নতুন, তবে জায়গা বড় কম। আর কি হবে, এরপর আর দাঁড়াবার জায়গাও মিলবে না।

ঘরে ঢুকে নিজেই রেগুলেটার ঘুরিয়ে পাখার চলন বাড়িয়ে দিলেন। খাটের ওপর বসতে বসতে বললেন,

—বেশ শান্তির জায়গা। এক ছুতোর মিস্ত্রীর হাতে পড়ে জীবনটা বরবাদ হয়ে গেল।

—কে ছুতোর মিস্ত্রী ?

—ওই হল, কনট্র্যাকটারও যা, মিস্ত্রীও তাই। আপনার বউটি এত কম বয়সে খসে গেল কি করে ? এমন সুখের সংসার সহ্য হল না বুঝি ?

—লিভার। লিভারটা নষ্ট করে ফেললে। খালি পেটে কাপ কাপ চা, ঘুরতে ফিরতে মুঠো মুঠো চানাচুর। মেয়েদের স্বভাব জানেন তো, একগুঁয়ে, অবুঝ, ভালো কথা কানে ঢোকে না।

—খবরদার বউ নেই বলে যা খুশি তার নামে বলে যাবেন, সেটি হতে দেব না। কিপটেমি করেছিলেন। ভাল করে চিকিৎসা করাননি। বিছানায় শুধু শুলেই হয় না, মাঝে মাঝে রোদেও দিতে হয়।

—চিকিৎসা করাইনি মানে ? অ্যালো, হোমিও, কোবরেজি, টোটকা কোনটা বাদ গেছে। নিজে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইন দিয়ে ফটিক ঠাকুরের দৈব ওষুধও এনেছি। থাকবে না, যে যাবে তাকে আটকে রাখবে কে ?

শশাঙ্কবাবুর গলাটা ধরে এল। চোখ ছলছল করছে। কোঁচার খুঁটে চোখ মুছলেন।

—সেকি চোখে জল এসে গেল। ভীষণ দুর্বল মানুষ তো ? ওই পাষণ্ডটাকে দেখে শিখুন। একচোখে কান্না আর এক চোখে হাসি।

—বয়েস হচ্ছে তো ? পুরনো কথা মনে পড়লেই চোখে জল এসে যায়। দুঃখের দিনে আমার সঙ্গে কষ্ট করে গেল, সুখের দিনে রইল না। সুধাকে আজকাল বড্ড মনে পড়ে যায়। ভেবেছিলুম ছেলের বিয়ে দিয়ে বুড়োবুড়ি কাশীতে গিয়ে থাকব। তা আর হল না। একলাই যেতে হবে। কত সব ছোট ছোট সাধ আহলাদ

ছিল, যখন মেটাবার মত অবস্থা এল, সব ফাঁকা। ছেলের রোজগার, ভালো জামাই, কিছুই সহ্য হল না। হাসতে হাসতে চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল, আসছ তো?

টেবিলে মাথা রেখে সুধার শোকে শশাঙ্ক ছেলেমানুষের মত ফুঁপিয়ে উঠলেন। মহিলার চোখেও জল এসে গেছে। তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে শশাঙ্কর মাথার পেছন দিকের কাঁচাপাকা চুলে হাত রাখলেন। চোখ থেকে এক ফোঁটা জল শশাঙ্কর ঘাড়ে পড়ল। আর এক সুধা শান্ত করার জন্যে কিছু বলতে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে বিষম। পানের কুচি, জর্দার টুকরো শ্বাসনালীতে। দমকা কাশি। মাথার পেছনে রাখা হাত লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে।

শশাঙ্ক মাথা তুললেন, মহিলার হাত মাথা থেকে খসে, কাঁধ ছুঁয়ে বুকের ওপর দিয়ে নেমে গেল। জোর বিষম। মুখ চোখ লাল হয়ে গেছে। একে ফর্সা মানুষ। শশাঙ্ক হাত ধরে খাটে বসিয়ে দিলেন। স্ত্রী সুধার বিষম লাগলে মাথার তালুতে চাঁটা মারতেন। ভালো দাওয়াই। এই সুধার মাথায় কি থাপ্পড় মারা যাবে। যা থাকে বরাতে শশাঙ্ক ব্রহ্মতালুতে থাবড়া মারতে লাগলেন, দু চারবার ফুঁও লাগালেন। সিঁথির কাছে সিঁদুরের রেখা বয়েসে চওড়া হয়েছে, চুলের গোড়ায় সাদার ছোঁয়া লেগেছে। মানুষের মাথা দেখলেই বোঝা যায় কটা ঝড় বয়ে গেছে জীবনের উপর দিয়ে। ভীষণ মায়া হল শশাঙ্কর। জীবনে জীবনে ঠোকাঠুকি করে যে শেষ হবে!

—দাঁড়ান এক গেলাস জল নিয়ে আসি।

শুধু জল নয়, একটা তোয়ালেও ভিজিয়ে আনলেন।

—নিন, মুখটা বেশ করে মুছে ফেলুন। লাল টকটকে হয়ে উঠেছে। উঁহু ওভাবে নয়, জলটা ধীরে ধীরে খান, তা না হলে আবার বিষম লেগে যাবে।

বুকের ওপর থেকে কাপড় খসে পড়েছে। শশাঙ্কর মনে হচ্ছিল ভিজে তোয়ালে দিয়ে নিজে হাতে মুছিয়ে দেন।

—একটু না হয় ফ্ল্যাট হয়ে শুয়ে পড়ুন। না না, সঙ্কোচের কোন কারণ নেই। আমি পাশের বসার ঘরে চলে যাচ্ছি।

—কেন, আপনিও ছেলের খাটে শুয়ে পড়ুন। এই বয়েসে খাবার পর একটু বিশ্রাম করতে হয়।

—আপনার অসুবিধে হবে।

—অবাক করলেন মশাই। আপনার বাড়িতে আমি তো একটা উৎপাত। আমার জন্যে কষ্ট করে সারা দুপুর ঠায় বসে থাকবেন?

—না বসে থাকব কেন? ও ঘরে গিয়ে কাৎ হয়ে থাকব।

—কেন, এ ঘরে থাকলে কি চরিত্র নষ্ট হয়ে যাবে?

—এঃ ছি ছি, এই বয়েসে চরিত্র বলে কিছু থাকে নাকি? সবই তো ঘুমিয়ে পড়েছে।

—তাহলে জানালার পাখিটা ফাঁক করে একবার দেখুন তো।

মহিলা আবার কেশে উঠলেন। বিষমের রেশ এখনও লেগে আছে।

—দেখছি দেখছি, আপনি পাশ ফিরে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকুন। আর এক গেলাস জল?

—না আর জল লাগবে না।

শশাঙ্ক পাখি ফাঁক করে ও বাড়ির দিকে তাকিয়েই চমকে উঠলেন। বারান্দার রেলিং-এ দুহাতের কনুইয়ে ভর রেখে কর্তা দাঁড়িয়ে। গায়ে স্যাণ্ডো গেঞ্জি, ছাপা লুঙ্গি। মাথার সামনে ওলটানো ফুলকো চুল। কপালের দুপাশ টাকে খেয়ে গেছে। হাতের আর কাঁধের গুল দেখলেই মনে হয় শরীরে এখনও বেশ শক্তি। এক ঘুষিতে শশাঙ্ক কাত। পাশেই সেই মেয়েটি। নীল শাড়ি, সাদা ব্লাউজ। এলো চুল মাথার দুপাশ দিয়ে সামনে ঝুলছে। চুড়িপরা একটা হাত কর্তার পিঠে। শশাঙ্ক ভয়ে ভয়ে পাখিটা বন্ধ করে দিলেন। এই দিকেই যেন চেয়ে আছেন। যদি দেখে ফেলেন।

—কি দেখলেন?

শশাঙ্ক তোতলাতে তোতলাতে বললেন,

—বারান্দাতেই দুজনে দাঁড়িয়ে। বাপ-মেয়েও বলা যায়, স্বামী-স্ত্রীও বলা যায়, বয়েসের ডিফারেন্সটা না ধরলে।

—বাপ-মেয়ে! কই দেখি।

শুয়ে শুয়েই শরীরটাকে ঘুরিয়ে জানলার পাখিতে চোখ রাখলেন,

—বাঃ, বাঃ, বা ভাই। বেড়ে হচ্ছে! প্রকৃতি দেখে শরীরে প্রেম আনা হচ্ছে। যাচিলে জামাই রুটি না খায়। রাত্রি হৈলে জামাই ঢেকশেল চাটিতে যায়। মুখে আগুন তোমার। এইবার আমি যদি এই মানুষটাকে জড়িয়ে ধরি। কেমন হয়।

শশাঙ্ক তাড়াতাড়ি সরে গেলেন ছেলের খাটের দিকে।

—এত প্রেম ছিল কোথায়? নিজের বউয়ের বেলায় সব শুকিয়ে যায়, অন্যের বেলায় উথলে ওঠে। অন্য মেয়েছেলে দেখলেই আপনারা এত চুলবুল করেন কেন বলতে পারেন?

শশাঙ্ক শুয়ে শুয়ে বললেন,

—সবাই কি আর করে? এক এক জনের এক এক স্বভাব। কেউ কেউ নিজেকে ঠিক রাখতে পারে না। পাগলা হয়ে যায়।

—পাগলামি আমি ঘুচিয়ে দিচ্ছি। হুট করে বাড়িতে ঢুকে দুজনের পিরিত চটকে দোব সে উপায় রাখেনি। দরজায় কড়া নাড়লেই কত্তা অমনি লুঙ্গি সামলে জপে বসে যাবেন। ছুঁড়ি গিয়ে ঢুকবেন বাথরুমে। আমি এই জানলাটা খুলে এখান থেকেই চিৎকার করব এই যে দাদু কেমন হচ্ছে, তোমাদের যম সব দেখছে।

—এই না।

শশাঙ্ক ধড়মড় করে উঠে জানলার ছিটকিনির দিকে মহিলার বাড়ানো হাত চেপে ধরলেন। দুজনে চোখাচোখি হল।

—আমাকে বিপদে ফেলবেন না। এই সব নোংরা ব্যাপারে একবার জড়িয়ে গেলে, লোক হাসাহাসি হবে।

শশাঙ্ক হাত ধরে টেনে মহিলাকে চিত করে বিছানায় শুইয়ে দিলেন।

—উত্তেজনায় কোন কাজ করা ঠিক নয়। যা করতে হবে ভেবেচিন্তে ধীরে ধীরে। চোখ বুজে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকুন। ভগবানই রাস্তা বাৎলে দেবেন।

শশাঙ্ক ছেলের বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লেন। অনেকদিন পরে মেয়েছেলের গায়ে হাত দিলেন। বেশ লাগল। পুরনো একটা অনুভূতি ফিরে এল। স্ত্রীকে বেশ লাগত। পরস্ত্রীকে যেন আরও ভালো লাগল। না না, এ ভালো লাগা ঠিক নয়। খুব অন্যায়, খুব অন্যায়। শশাঙ্ক সামালকে।

শশাঙ্ক বোধ হয় একটু ঘুমিয়েই পড়েছিলেন। ভাতঘুম। ঘড়িতে চারটে বাজছে। চোখ মেলে তাকালেন। বাইরে মেঘ ভাঙা রোদ। একখণ্ড নীল আকাশে শরতের টুকরো মেঘ। উঠে বসলেন। সেই সুধা থাকলে এখন চায়ের জল বসত। এই সুধা খুব ঘুমোচ্ছে। শরীরটা শিথিল হয়ে বিছানায় পড়ে আছে, মুখটা প্রশান্ত। কোন রাগ বিরক্তি অশান্তির চিহ্ন নেই। ঘুমে সব মোলায়েম। অল্প বয়েসে বেশ ধারাল মুখই ছিল। বয়েসে তীক্ষ্ণতা একটু কমেছে। তা হলেও বেশ ভালোই দেখাচ্ছে। ঠোঁট দুটো অল্প ফাঁক হয়ে আছে। লিপস্টিকের মত পানের লাল দাগ। ধবধবে একটা পা আর একটা পায়ের ওপর আড় হয়ে আছে। একটা হাত খাটের বাইরে ঝুলছে। চিকন চিকন দুগাছা সোনার চুড়ি চিকচিক করছে। চারদিকে ছড়িয়ে আছে ভাঁজে ভাঁজে শাড়ি। গলার কাছে একটা শিরা দপদপ করছে। বুকের ভার শ্বাসপ্রশ্বাসে ধীরে ধীরে উঠছে নামছে।

হেই মাঝি। জোয়ার আসছে।

বিলেতে মেমসাহেবরা মুখ চুম্বন করে। যৌবনে একটা বই হাতে এসেছিল, আর্ট অফ কিসিং।

এই বুড়ো বি কেয়ারফুল। মক্ষীবয়টি সাহদ পরো পংখা গয়ে

লপটাই। মক্ষী ঝটপটায় শিরধুনে, লালচ বুঝি দালাই। লোভই এই সংসারে পতনের একমাত্র কারণ। দেখ শশাঙ্ক মৌমাছির হাল। মধুতে বসলেই পাখা দুটো আটকে যায়। মৃত্যু। যা করবে ভেবে চিন্তে করবে।

শশাঙ্ক রান্নাঘরে ঢুকে চায়ের জল চাপালেন। অন্যদিন এক কাপ, আজ দুকাপ। শূন্য বাড়িটা বেশ ভরাট ভরাট লাগছে আজ। দুকাপ চা হাতে নিয়ে শশাঙ্ক আবার শোবার ঘরে এলেন। মহিলা তখনও অকাতরে ঘুমোচ্ছেন। শান্তি আর ঘুম হাত মিলিয়ে চলে।

—এই যে শুনছেন, উঠুন, চা এসেছে। এই যে। সুধা সুধা। কতদিন এই নাম ধরে ডেকেছেন। উঠতে বসতে, ঘুরতে ফিরতে। কি অদ্ভুত যোগাযোগ!

—সুধা, সুধা, চা।

সুধা চোখ মেলে তাকালো।

—উঠুন উঠুন, চা এসেছে।

—অ্যাঁ, সকাল হয়ে গেছে?

—না, সকাল নয় বিকেল। খুব ঘুমিয়েছেন। কেমন লাগছে আপনার?

চায়ের কাপটা সুধার হাতে দিলেন। কাপড়চোপড় সব এলোমেলে, আলুথালু চেহারা। এই অবস্থায় কেউ যদি দেখে ফেলে কি যে ভাববে!

—আপনি একবারও দেখেছেন।

—কি দেখেছি।

—হা ভগবান! ও বাড়ির সেই চরিত্রহীন বুড়োটা?

—না তো?

—একটা কাজের ভার দিলুম। ব্যাটাছেলেদের মত অকর্মা পৃথিবীতে খুব কমই দেখেছি।

শশাঙ্কর সেই কথামৃতের গল্পটা মনে পড়ল। এক জাদুকর খেলা

দেখাচ্ছে, লাগ ভেলকি লাগ ভেলকি। হঠাৎ জিভ আটকে সমাধি হয়ে গেল। সবাই ভাবলে যে ভাগ্যবানের মোক্ষলাভ হল। ওমা যেই জ্ঞান ফিরে এল, সঙ্গে সঙ্গে আবার সে বলতে লাগল, লাগ ভেলকি লাগ ভেলকি। মহিলারও সেই এক অবস্থা। চায়ের কাপটা টেবিলে রেখে, মহিলা পাখি ফাঁক করে দেখতে লাগলেন।

—এই যে দেখে যান, দেখে যান, আপনাদের কাণ্ড দেখে যান।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও শশাঙ্ক এগিয়ে গেলেন। মাথাটা নিচু করছেন, মহিলাও মাথা তুলছেন। কপালে আর মাথায় ঠোকাঠুকি হয়ে গেল।

—লাগল তো ?

শশাঙ্ক বললেন,

—না না, এত সামান্য লাগাকে লাগা বলে না।

চশমাটা নাকের ডগায় হেলে গেছে। চুলের তেলে কাচ ঝাপসা। শশাঙ্ক অস্পষ্ট হলেও ওই বাড়ির শোবার ঘরে পুরুষজাতির কাণ্ড দেখে সত্যিই অবাক হলেন। কত্তা মেঝেতে থেবড়ে বসে আছেন, মেয়েটি পেছন দিক হতে গলা জড়িয়ে আছে। কত্তা পিঠে ফেলে দোল দোল করছেন। ছেলেবেলায় মার পিঠে চেপে শশাঙ্ক এইভাবে দোল খেতেন। মা বলতেন দোল দোল দোল দোল, খোকা দোলে বোকা দোলে, দোল দোল দোল দোল।

—মনে হয় ব্যায়াম করছেন। এই বয়েসে শির-ফির টেনে থাকে। বারবেলের বদলে ওই মেয়েটিকেই ওজন হিসেবে ব্যবহার করছেন। ফিজিওথেরাপি। অনেকে মোটা বই মাথার ওপর তুলে কাঁধের একসারসাইজ করেন।

—হ্যাঁ হ্যাঁ ব্যায়ামই হচ্ছে। ফিজিওথেরাপি নয়, সেই থেরাপি হচ্ছে। আমার ইচ্ছে করছে এখুনি গিয়ে চুলের মুঠি ধরে শয়তানীটাকে রাস্তায় বের করে দি। হাতের তেমন জোর থাকলে এখান থেকে ঢিল ছুঁড়তুম। কিছু তো একটা করতে হয়। বলুন না মশাই কি করা যায় ? একটা বুদ্ধি দিতে পারছেন না ?

—আমেরিকা হলে ডিভোর্স করার পরামর্শ দিতুম। অ্যাডালটারির চার্জ এনে ঠুকে দাও মামলা।

—সাক্ষী দেবেন ?

—আমি নির্বিবাদী মানুষ। আমাকে কেন জড়াচ্ছেন ?

—সে কি, আপনার কোনও সামাজিক দায়িত্ব নেই! চোখের সামনে অনাচার। একটা মেয়েছেলে সংসার তছনছ করে দিচ্ছে। কেউ কোনও কথা বলবে না ? আগেকার দিন হলে গ্রামের মোড়ল মাথা কামিয়ে ঘোল ঢেলে ছেড়ে দিত। কাজির আমল হলে গর্ত করে কোমর পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে দিয়ে ডালকুকুর দিয়ে খাওয়াত।

—আপনি স্বাবলম্বী মহিলা, আপনার অত ভয় কিসের ? কেন পড়ে পড়ে মার খাবেন ?

—বাঃ খুব বললেন যা হোক। আমি ডিভোর্স করলে আপনি আমাকে বিয়ে করবেন ?

—আমি ? শশাঙ্ক হাসলেন, আমার বিয়ের বয়েস আছে আর ?

—বিলেতে বুড়োবুড়ির বিয়ে হয় না ?

– তা হয়, তবে এটা তো বিলেত নয়।

—তা হলে ডিভোর্সও হয় না, হয় ঝ্যাটা-পেটা। ঝেঁটিয়ে আমি আপদ বিদেয় করব। এক গেলাস জল খাওয়াবেন ?

শশাঙ্ক জল এনে দিলেন। ব্যাগ থেকে একটা ট্যাবলেট বের করে খেলেন।

—প্রেসারটা আবার বেড়েছে। আজ আপনি আমার যা করলেন, জীবনে ভুলব না। আপনারও কেউ নেই, আমারও কেউ নেই। মিলেছে ভাল। মেয়েরাও একটু আদর চায়,যত্ন চায়। শুধুই সংসারের হাঁড়ি ঠেলবে আর বাচ্চা বিয়োবে তা হয় না। এই নিন কিছু ওষুধ রাখুন, এইটা অম্বলের, এটা মাথাধরার, এটা আমাশার। আরও আরও এনে দোব। যাই, নরকে ফিরে যাই। সতীন নিয়ে সোনার সংসার। এই বাড়িটা কি শান্তির। সেই চটের হাতব্যাগটা তুলে

নিয়ে মহিলা ধীরে ধীরে দরজার দিকে এগোলেন। যাবার ইচ্ছে নেই তবু তো যেতেই হবে।

তিন

কিছু কেনাকাটার ছিল। বিস্কুট ফুরিয়েছে, টুথপেস্ট গেল গেল হয়েছে, সাবানের ভেতর দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে। দাড়ি কামাবার ব্লেড। চিঠি লেখার প্যাড। স্টেশনারি দোকানের কাউন্টারে দাঁড়িয়ে আছেন। মালপত্তর ওজন হচ্ছে। নজর চলে গেল একটা প্যাকেটের ওপর, হেয়ার ডাই, ব্ল্যাক। অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। এক শিশি কিনে দেখলে হয়। সুধা মাঝে মাঝে বলত, কি বুড়োটে হয়ে যাচ্ছ, চুলে একটু কলপ লাগাও না। চুল কালো করে দেখতে ইচ্ছে হয়, দাদু থেকে দাদা হওয়া যায় কিনা?

পাগল। পাগল। বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ।

একশো গ্রাম লজেনসও কিনলেন। একটা মুখে ফেলে পার্কে বার কতক পাক মেরে বাড়িমুখো হলেন। পার্কে আজকাল বুড়োদের বেড়ানো চলে না। ছেলেমেয়েরা বড়ো সাহসী হয়ে উঠেছে। তাকালে আবার সিটি মারে। বইয়ে পড়েছেন লণ্ডনের হাইড পার্কে সকালবেলা ঝুড়ি ঝুড়ি সেই সব পড়ে থাকে। নাঃ, পৃথিবীটা চিরকালই যুবক যুবতীদের। তারা যা করবে সেইটাকেই মুখ বুজে মেনে নিতে হবে। ওই যে রাধাচূড়া গাছের তলায় যে জোড়াটি বসে আছে তাদের যদি বলেন, অ্যায় কি হচ্ছে, সব কটা জোড়া তেড়ে এসে তার জিওগ্রাফি পাল্‌টে দেবে।

বাড়ি ফিরে এসে কাপড়ের আলমারিটা খুললেন। সবে সন্ধে নেমেছে। দিন শেষের তরল অন্ধকারে জনপদের বাতি সারি সারি ভাসছে। এখনও কিছু কিছু বাড়িতে শাঁখ বাজে। শশাঙ্ক তাঁর স্ত্রীর একটি শাড়ি বের করলেন। ডুরে শাড়ি। রঙটি বেশ গাঢ়। শাড়িটাকে পাশ বালিশের ওপর ছড়িয়ে দিলেন। সুধা যেন শুয়ে আছে। একটা সায়া বের করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন। অর্গাণ্ডির

একটা ব্লাউজ হাতে ধরে স্পর্শ নিলেন। পুরনো জিনিসগুলোকে জোড়াতালি লাগিয়ে হারানো অতীতকে বর্তমানে টেনে আনার চেষ্টা। যে শরীরের এই সব আচ্ছাদন সেই শরীরটা নষ্ট হয়ে গেছে। কালে এগুলো কীটদষ্ট হয়ে হারিয়ে যাবে। তাঁকেও যেতে হবে। বিছানার দিয়ে তাকিয়ে ডাকলেন,

—সুধা, ওঠো, সন্ধেবেলা শুয়ে থাকতে নেই, ওঠো, উঠে বসো।

নিজের পাগলামিতে নিজেই হেসে উঠলেন। দুধের সাধ কি ঘোলে মেটে? সব পাট করে তুলে রাখলেন। ইডিয়েট, ইডিয়েট। একটা টিনের কৌটোর মধ্যে কাঁচা সিদ্ধির পাতা ছিল। দু চিমটে মুখে ফেলে চিবোলেন। ভেতো, তেতো। আজ একটু নেশা চাই, নেশা। স্বপ্ন চাই। সেই স্বপ্ন। সুধার হাত ধরে নৌকো থেকে পাড়ে নামাচ্ছেন। সাবধান, দেখো পড় না যেন।

অনেকদিন তোমাকে চিঠি লেখা হয়নি।

মাঝে-মধ্যে সুধাকে চিঠি লেখেন শশাঙ্ক। পৃথিবীর কোন পোস্ট-ম্যান সে চিঠি বিলি করতে পারবে না। লিখে তাই ছিঁড়ে ফেলেন। ছোট ছোট সাংসারিক কথা। মান-অভিমান।

সুধা, বহুদিন হয়ে গেল, জানি না তুমি আগের ঠিকানাতেই আছ, না অন্য কারুর মেয়ে হয়ে নেমে এসেছ। ভেবেছিলুম অন্তত একদিনও তুমি আমার মাথার সামনে এসে দাঁড়াবে। রাত তখন গভীর নিস্তব্ধ, আমার জ্বর হল, মানু এসে কপালে হাত বুলিয়ে দিল, তুমি কিন্তু এলে না। ওখানে তুমি হয়ত আমার চেয়ে প্রিয় কোন সঙ্গী পেয়ে গেছ। যে সব দায়িত্ব তুমি দিয়ে গেছ সবই আমি একে একে গুছিয়ে এনেছি, কেবল সুধীর বিয়েটাই বাকি। ওই কাজটা শেষ হলেই, কয়েকটি তীর্থ ঘুরে বাড়ি। তীরে আমার নৌকো বাঁধা। জোয়ার এলেই ভেসে যাব। আর কটা দিন। রাত প্রায় কাটিয়েই এনেছি, আর প্রহরখানেক মাত্র বাকি, একটুর জন্যে তাল আর ছাড়ছি না। বড়ো ক্লান্ত তবু মুজরো শেষ করেই যাব। ততদিন তুমি কি আমার অপেক্ষায় থাকবে?

আর এক সুধা এসে কদিন খুব হামলা করছে। তোমার বিছানা দখলের তালে আছে কিনা কে জানে! মন না মতিভ্রম।

দরজার কড়া নড়ে উঠল।

কে এল? সুধী। আজ বেশ একটু সকাল। কোনদিন কখন আসে।

—যাক আজ বেশ সকাল সকাল এসেছিস।

—হুঁ।

—শরীর ভাল তো?

—হুঁ।

শশাঙ্ক একটু ঘাবড়ে গেলেন। সব প্রশ্নেরই সংক্ষিপ্ত জবাব। সুধীর তো এমন কাটাকাটা স্বভাব নয়!

—কি খাবি এখন? একটু চা বসাই?

—কোনও প্রয়োজন নেই।

ছেলেটা আজ মনের ওপর বড়ো ধাক্কা মারছে তো! কি হল! অসহায়, বুড়ো মানুষ। বড়ো ভয় করছে।

—আজ তোর কি হয়েছে সুধী?

—কিছু না।

—কিছু একটা হয়েছে, তা না হলে এমন কাটাকাটা উত্তর কেন?

পোর্টফোলিও ব্যাগটা বিছানার ওপর ঝপাং করে ফেলে দিয়ে সুধী রিস্টওয়াচ খুলতে খুলতে বলল,

—তুমি আমাদের ফ্যামিলির মুখে চুনকালি মাখিয়েছ।

ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল কপালের ওপর ঝুলে পড়েছে। চোখের ওপর চশমা। চশমার কাঁচে আলোর ছটা। চোখ দেখা যাচ্ছে না।

—আমি?

—হ্যাঁ, তুমি। তুমি এই বয়েসে বাড়িতে একটা মেয়েমানুষ ঢুকিয়ে সারাদিন যা তা কর।

—সে কি? কে বললে?

—যাদের মধ্যে বাস করছ তারাই বললে। সমাজের চোখকে ফাঁকি দিয়ে কিছু করা যায় না বাবা।

—ভুল শুনেছিস। এ সব-অপপ্রচার।

—তুমি অস্বীকার করতে পার,এ বাড়িতে কোন মহিলা আসে না?

—হ্যাঁ আসে, কিন্তু কেন আসে তুই জানিস? আসল রহস্য জানিস?

—আমি জানতে চাই না। শুধু এইটুকু জানি, আমার দুর্ভাগ্য তোমার ছেলে হিসেবে আমাকে পরিচয় দিতে হয়।

—এত বড়ো কথা।

—হ্যাঁ এত বড়ো কথা। বৃদ্ধ বয়েসে পদস্খলন। তোমার ওপর আমার সামান্যতম শ্রদ্ধাও আর নেই।

—তুই আমার কাছে ঘটনাটা শুনবি না?

—না, যা শোনার আমি প্রতিবেসীর কাছ থেকেই শুনেছি। চরিত্রহীন এক মহিলা, প্রথম স্বামীকে ছেড়ে দু নম্বর একজনের সঙ্গে ঘর বেঁধে তিন নম্বরের কাছে নাচতে আসেন। ছি ছি!

চার

সকালে শশাঙ্ককে কিঞ্চিৎ উদ্‌ভ্রান্তের মত মনে হল। শুকনো মুখ। রাতজাগা লাল চোখ। বিছানা সারারাত শূন্য পড়ে রইল, বসার ঘরেই রাত কাটালেন। সুধীর সামনে দাঁড়াবার ইচ্ছে নেই। দুজনেই দুজনের কাছে ঘৃণিত। সুধী শোবার আগে ভেবেছিল বাবার কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে বিছানায় এনে শোয়াবে। রোজ যেমন গল্প করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ে সেইভাবেই এক সময় ঘুমিয়ে পড়বে। কিন্তু নিজের মনকে রাজি করাতে পারল না কিছুতেই। ফেরার পথে রাজেনবাবু তাকে যা তা বললেন,

—তোমার বাবার আবার বিয়ে দাও হে। তোমার বিয়ে না হয় পরেই হবে।

কথাটা শূলের মত মনে বিঁধে আছে। চরিত্রহীন পিতার পুত্র—এই পরিচয়ে সে পরিচিত হতে চায় না। সে নিজেকে বোঝালো.বেশ করেছি বলেছি। অন্যায়ের প্রতিবাদ অবশ্যই করা উচিত। হলেনই বা বাবা। যদি কষ্ট পেয়ে থাকেন, নিজের স্বভাবের জন্যেই পেলেন। যেখানে খুশি যে ভাবে খুশি রাত কাটান। বাড়িতে মেয়েছেলে এনে ফূর্তির সময় তোমার মনে ছিল না বিপত্নীক বৃদ্ধ। সমাজের হাজারটা চোখ।

দুপুরের দিক নির্জন ঘরে দাঁড়িয়ে শশাঙ্ক উন্মাদের মত বার কতক হাসলেন।

—তোমার সংসার আজ ভেঙে গেল সুধা। চারদিকে সাজানো সব তাসের ঘর। জীব শিব সম সুখ মগন সপনে কিছু কর তৃতি। জাগত দীন মলিন সোই বিকল বিষাদ বিভূতি। স্বপ্নের ভোগৈশ্বর্য স্বপ্নেই মিলিয়ে গেল। আমি এখন সজাগ মায়ামুক্ত, সুখের স্বপ্ন আমার কাছে ঘোর বিষাদ। তোমার স্মৃতি রইল, তোমার ছেলে রইল। আলমারি-ভর্তি তোমার জামা-কাপড়, গয়না রইল। তোমার ছেলের বউ এসে পরবে। তোমারও দেখা হল না, আমারও দেখা হল না। রাত যায়, স্বপ্ন যায়, আবার রাত আসে, নতুন স্বপ্নও আসে। আমি শুধু আমাদের বিয়ের আংটিটা তোমার কাছে চেয়ে নিলাম। সকলেই আমাকে ত্যাগ করেছে। জগতের কাছে ঘৃণ্য হয়েছি। তুমি যেন ঘৃণা কোরো না।

সাদা টেনিস সার্ট, পায়ে ক্যাম্বিসের জুতো, হাতে কিটব্যাগ। একমাথা উস্কোখুস্কো কাঁচাপাকা চুল। চোখে পুরু কাচের চশমা। শশাঙ্ক সিঁড়ি দিয়ে নামছেন। শেষবারের মত তালাবন্ধ দরজার দিকে তাকালেন। মায়া কান্না ধরে টানছে। না, আর না। জয় শিবশম্ভু, উখার দে মকান লাগা দে তম্বু।

নিচের ফ্ল্যাটের মেয়েটির কাছে চাবি রাখলেন। বলা যায় না—এই চাবিই হয়ত আঁচলে বেঁধে তুমি একদিন ওপরে উঠবে। মা! আমার এই কলমটা তোমার খুব ভালো লাগত।

—এই কলমটা তোমাকে দিয়ে গেলুম মা। তুমি বলেছিলে বেশ লেখে।

—আপনি কোথায় চললেন, এই দুপুরবেলা ?

—মনটা বড় উতলা হয়েছে মা, যাই মেয়ের বাড়ি থেকে ঘুরে আসি কয়েকদিন। তোমরা সব সাবধানে থেকো।

—কলমটা দিয়ে দিলেন ?

—আর কি হবে মা। চিঠিও লিখি না, চোখেও দেখি না। তোমার কাছে আমার একটা স্মৃতি থাক, কে বলতে পারে, আজ আছি, কাল হয়ত থাকব না।

শশাঙ্ক রাস্তায় নেমে এলেন। মোড়ের মাথায় সেই বুড়ো রিকশঅলা। পাদানিতে বসে বসে গাছের ছায়ায় ঝিমোচ্ছে। শশাঙ্ক তার সামনে এসে দাঁড়ালেন,

—তুমি গত শীতে আমার কাছে একটা সোয়েটার চেয়েছিলে ?

—হাঁ বাবু।

—এই নাও।

—শীতের তো এখনও দেরি আছে।

—দূর বোকা! দেরি আছে তো কি হয়েছে। একদিন তো আসবেই, তার জন্যে প্রস্তুত হতে হবে না।

পাড়ার সকলেই শশাঙ্ককে চলে যেতে দেখেছেন। ছেঁড়া ছেঁড়া টুকরো টুকরো সেই সব কথা থেকে কিছুতেই পরিষ্কার হল না, তিনি কোথায় গেছেন। সেই হোমিওপ্যাথ ডাক্তার বললেন,

—আমাকে ওয়েলসের ডায়েরিয়া অ্যাণ্ড ডিসেন্ট্রি বইটা দিয়ে বললেন, রাখ তোমার কাজে লাগবে। এক পুরিয়া অর্শের ওষুধ খেলেন। জিজ্ঞেস করলুম, এমন সময় কোথায় চললেন কাকাবাবু? হাসতে হাসতে গান গেয়ে উঠলেন, জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই, কোথা হতে আসি কোথা ভেসে যাই

দগ্ধ দরজা

এক

শুকনো পাতার উপর পা রাখলেন অপরেশ। মচমচ করে একটু শব্দ হল। সরসর করে কি একটা সরে গেল। দিনান্তের শেষ আলোয় ঠিক বোঝা গেল না। অপরেশ একটু ভয় পেলেন। সরীসৃপ জাতীয় একটা কিছু হবে। টিকটিকি কিংবা গিরগিটি হলে তেমন ভয় নেই। অন্য কিছু না হলেই হল। প্রায় দু বছরের পাতার স্তূপ জমেছে দরজার সামনে। ফলসা গাছের বড় বড় পাতা। দরজার সামনে সবুজ ছাতার মত শাখা প্রশাখা মেলেছে গাছটা। এই দু বছরে মাথায় বেশ কিছুটা বড়ও হয়েছে। গাছটা কেউ পরিচর্যা করে বসায়নি। যত্নও করেনি, নজরও দেয়নি। আপনিই বড় হয়েছে। প্রাণরস সংগ্রহ করেছে মাটি থেকে।

অপরেশ পকেট থেকে চাবি বের করতে করতে ঘাড় উঁচু করে বাড়িটা একবার দেখে নিলেন। উপরের সমস্ত ঘরের জানালা বন্ধ। কেবল একটা একটু খোলা। জোর বাতাসে মাঝে মাঝে দুলছে। অপরেশ ঘাড় নামিয়ে নিলেন। বয়স বাড়ছে, ঘাড় পেছনে বাঁকালে শিরে টান ধরে।

এক গাদা চাবি পকেটে। অপরেশ মনে মনে একটু হাসলেন। অনেক চাবি অনেক দরজা কিন্তু একটাও খুলল না। যে দরজাতেই ঢোকার চেষ্টা করলেন সেই দরজাই নাকের উপর বন্ধ হয়ে যায়। হাতের তালুতে চাবি রেখে অপরেশ চিনতে চাইলেন কোন চাবিটা এই তালার। দূরে কোথাও একটা কুকুর ডেকে উঠল। সন্ধে হয়ে আসছে। তালার গর্তটা আর ঠিক ঠাহর করা যাচ্ছে না।

তালাটা পেতলের। তবুও দু বছরের জলে, রোদে কর্কশ হাওয়ায় বিবর্ণ হয়ে গেছে। চাবি ঢুকলেও সহজে খুলতে চাইল না। কায়দার তালা। আড়াই প্যাঁচে খোলে। অপরেশ একটা পাকই ঘোরাতে পারলেন না। চাবিটা তালায় আটকে পকেট থেকে সিগারেট বের করলেন। পকেটের চাপে সিগারেট চেপ্টে গেছে। হাতের তালুতে ফেলে সযত্নে আঙুলের আলতো চাপে গোল করলেন। অর্ধেক পাতা বেরিয়ে গেল। সেই আলগা সিগারেটই অনেকক্ষণের শুকনো ঠোঁটে লাগালেন। পকেট হাতড়ে বের করলেন দেশলাই। কয়েকটা মাত্র কাঠি আছে। হাওয়া বইছে জোরে। হাওয়ার দিকে পেছন ফিরে দরজার কোণে হাতের আড়াল করে দেশলাই জ্বালিয়ে সিগারেট ধরালেন। অন্যমনস্কের মত কাঠিটা ফেলে দিলেন পায়ের কাছে।

শুকনো গলায় একরাশ ধোঁয়া নিয়ে একটু কেশে উঠলেন। বুকের খাঁচাটা এখনো বিশাল। ফুসফুসটা কিন্তু বেশ কম জোর হয়ে গেছে। অপরেশ বুঝতে পারেন শরীরটা ক্রমশই ক্ষয়ে যাচ্ছে। সময়ের বালি কাগজ অনবরতই কর্কশ ঘর্ষণে জীবনীশক্তি গুঁড়োগুঁড়ো করে উড়িয়ে দিচ্ছে। সিগারেট ঠোঁটে ধরে অপরেশ আবার তালায় হাত রাখলেন। আকাশে আলো আর কিছুই অবশিষ্ট নেই। অন্ধকারেই অপরেশ সমস্ত শক্তি দিয়ে চাবি ঘোরাবার চেষ্টা করলেন। অসম্ভব ধোঁয়ায় চোখ জ্বলে যাচ্ছে এ ধোঁয়া তো সিগারেটের নয়। আজ তেত্রিশ বছর ধরে সিগারেট খাচ্ছেন। ধোঁয়ার স্বাদ আর গন্ধ তাঁর জানা।

হঠাৎ পায়ের কাছে আগুনের জিভ লাফিয়ে উঠল! ফেলে দেওয়া কাঠির আগুনে স্তূপাকার শুকনো পাতা জ্বলে উঠেছে। আগুনের আক্রোশ, অপরেশ লাফিয়ে সরে যাবার আগেই কোমর পর্যন্ত তেড়ে উঠেছে। জ্বলন্ত পাতা হাওয়ায় ছুটছে। অপরেশের লুটোনো কোঁচা, পাঞ্জাবির ঝুলে আগুনের সাপ খেলা করছে। লকলকে আগুনের শিখায় অপরেশ যেন মুগ্ধ হলেন। রূপের আগুনে যেমন

মানুষ-পতঙ্গ পুড়ে যায়। অপরেশ যেন প্রকৃত আগুনে নিজেকে ঝলসে নিতে চাইলেন।

শুনেছিলেন মাটিতে গড়াগড়ি দিলে আগুন নিভে যায়। কিন্তু মাটি কোথায় সবই তো আগুন। সেই আগুনে মাটিতেই অপরেশ একটা প্রফুল্ল জন্তুর মত গড়াগড়ি দিলেন। দেহের চাপে আগুন হয়তো নিভল, অপরেশ কিন্তু ভীষণভাবে দগ্ধ হলেন। অদৃশ্য আগুনে ভেতরটা অনেকদিনই পুড়ে ছিল, আগুনে এবার বাইরেটা পুড়ে গেল। জ্ঞান হারাননি অপরেশ। কিন্তু পোড়া পাতার ছাই থেকে উঠে বসার শক্তি যেন তাঁর রইল না।

অতি কষ্টে হাত উঠিয়ে অপরেশ মাথার চুলে হাত রাখলেন। পোড়া হাতের সঙ্গে জড়িয়ে এল একরাশ পোড়া চুলের ছাই। ভয়ে অপরেশ হাত সরিয়ে নিলেন। হাতটা সরাতে গিয়ে অপরেশ প্রথমে লক্ষ করলেন, পাঞ্জাবির হাতাটা নেই। জীবনে এই প্রথম ভয় পেলেন তিনি। চিতা থেকে উঠে আসা শব তিনি দেখেননি, কিন্তু নিজেকে দেখে তাঁর তাই মনে হল।

আশেপাশে মাইল খানেকের মধ্যে কোন বাড়ি নেই। এই বাড়িটাও উঁচু পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। এই অগ্নিকাণ্ডের সাক্ষীও কেউ নেই, সাহায্য নিয়ে ছুটেও আসবে না কেউ। অপরেশ অসম্ভব মনের জোর নিয়ে উঠে বসলেন। ঝোড়ো হাওয়ায় গা থেকে ছাই উড়ছে। শরীরের কোথাও আর একছিটে সুতো নেই। বসতে গিয়ে অপরেশের মনে হল, তিনি যেন অসম্ভব মোটা আর ভারী হয়ে গেছেন। সমস্ত শরীরটা যেন একধরনের আঠায় চটচট করছে। একটা মৃদু মাংস-পোড়া গন্ধ পাচ্ছেন নাকে। এই গন্ধটাও অপরেশের খুব পরিচিত। জীবনে বহুবার শ্মশানে গেছেন।

অতি কষ্টে পোড়া পাতার ছাই থেকে অপরেশ নিজেকে ওঠালেন। ঘাড় নিচু করে নিজেকে আর দেখতে ইচ্ছা করল না। বিশাল আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দিনের পর দিন কত ব্যায়াম করেছেন। মুগ্ধ হয়ে

নিজের শরীরে পেশীর ঢেউ শুনেছেন। আজ সেই সুন্দর দেহ— অপরেশ আর ভাবতে পারলেন না। দরজায় পিঠ রেখে একটু বসতে গেলেন। পিঠের চাপে দরজাটা আপনি খুলে হাট হয়ে গেল। অপরেশ চিত হয়ে চৌকাঠের উপর পড়ে গেলেন। পড়ার সময় মনে হল অসংখ্য তন্তু ছিঁড়ে গেল।

দুই

শরীরটা এখন যেন বেশ হালকা লাগছে। অল্প আঁচে বাদ্যযন্ত্র সেঁকে নিলে যেমন সুরে বলে, অপরেশের মনে হল তেমনি সুরে বাজছেন। চারদিকে থকথকে ঘন অন্ধকার তবুও কেমন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছেন। এই তো সেই বসার ঘর। সেই সবুজ ঘন কার্পেট। রেক্সিন মোড়া সোফা। পালিশ করা বুক সেল্ফ। অমূল্য বইয়ে ঠাসা। পড়তে ভালোবাসতেন অপরেশ। জীবনের সমস্ত সঞ্চয় বইয়ের পেছনে খরচ করেছেন। পাউডারের মত ধুলো জমেছে চারদিকে। ধুলো ঝাড়েনি কেন কেউ! ইস্ এত ধুলো! অপরেশ ফুঁ দিলেন। বাতাস বেরোলো না মুখ দিয়ে। আঙুল দিয়ে দাগ কাটার চেষ্টা করলেন। কোনো দাগ পড়ল না। অপরেশ খুব বিব্রত বোধ করলেন।

অপরেশ খুব আস্তে সাবধানে সোফার উপর বসলেন। অবাক হয়ে লক্ষ করলেন স্প্রিং-এর গদির উপর কোনো চাপ পড়ল না। কোথাও কোনো আলো নেই অথচ সব কিছু কী ভীষণ স্পষ্ট দেখছেন। চোখের সমস্ত পাতা পুড়ে ঝরে গেছে। কপালের চামড়া পুড়ে গেছে। বলা চলে অন্ধই হয়ে গেছেন তবুও কী অসাধারণ দৃষ্টিশক্তি তাঁর।

দু বছর আগে যেদিন দুপুরবেলা হঠাৎ বাড়ি থেকেচলে গিয়েছিলেন সেদিন ছিল তাঁর ছেলের জন্মদিন। সারা ঘর সাজানো হয়েছিল রঙিন কাগজের স্টিমার দিয়ে। সেই কাগজের শিকল এখনো সিলিং থেকে চারিদিকে ঝুলছে। ঘরের কোণে টিপয়ের উপর বড়

ফুলদানিতে নিজে হাতে দু ডজন রজনীগন্ধার স্টক রেখেছিলেন, সেই ফুল ঝরা শুকনো স্টক এখনো কঙ্কালের আঙুলের ইসারার মত সেই কোণেই রয়ে গেছে। অপরেশ উঠলেন। ফুলদানির কাছে গিয়ে শুকনো রজনীগন্ধার ডাঁটি দিয়ে ধরার চেষ্টা করলেন। আশ্চর্য! কিছুতেই ধরতে পারলেন না। কেন এমন হচ্ছে! কি কারণে হচ্ছে! অপরেশের মাথায় এল না।

বসার ঘরের বাইরে এলেন অপরেশ। সোজা করিডর দু'দিকে দু'সার ঘর রেখে চলে গেছে পশ্চিমের বাথরুমের দিকে। দু'বছর আগের ঘটনা স্পষ্ট মনে পড়ে গেল। বেলা তখন কত হবে, দুটো কি তিনটে। সারা বাড়িতে রান্নার সুগন্ধ ঘুরছে। কোঁচার খুঁটে চশমার কাচ মুছতে মুছতে অপরেশ সবে বাথরুমের বাইরে বেরিয়েছেন। চটি দু'পাটি খুলে রেখেছেন পাপোশের উপর আর ঠিক সেই সময় বাইরের দরজার কড়া নড়ে উঠল জোরে জোরে। কড়া নাড়ার ধরন দেখেই অপরেশ বুঝেছিলেন এ হাত বন্ধুর নয়, শত্রুর।

দরজাটা কে খুলে দিয়েছিল। বোধ হয় কাঞ্চন। সেদিন সে ধুতি, পাঞ্জাবি পরেছিল। কপালে চন্দনের ফোঁটা। কাঞ্চন বোধ হয় ভেবেছিল তার বন্ধুরা এসেছে। বাথরুমের দরজার পাশে চটি দুপাটি যে ভাবে খুলে রেখেছিলেন ঠিক সেই ভাবেই পড়ে আছে। অপরেশ অবাক হলেন। চলে যাবার পর বাড়িতে কি সমস্ত কর্মতৎপরতা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল! না তাঁর ফিরে আসার অপেক্ষায় বাড়িটাকে মিউজিয়াম করে রাখার চেষ্টা হয়েছে! চটি দু'পাটি পায়ে গলিয়ে টানার চেষ্টা করলেন, এক ইঞ্চিও সরাতে পারলেন না। আবার চেষ্টা করলেন, সেই একই ব্যাপার। আশ্চর্য! এ কি কোনো জাদুর প্রভাব!

অপরেশ ফিরে চললেন। করিডোর এসে মিশেছে দোতলায় ওঠার সিঁড়িতে। ধাপে ধাপে অপরেশ উপরে উঠতে শুরু করলেন। সিঁড়ির বাঁকে বিদেশী শিল্পীর আঁকা এক মহিলার প্রতিকৃতি। ছবির

মহিলা অসামান্য সুন্দরী। কোনো ঐতিহাসিক চরিত্র কি না অপরেশ জানেন না। শিল্পীর কোনো আপনজনও হতে পারে। ধুলোর আবরণে ছবিটি ধূসর। অপরেশ ছবিটার মুখোমুখি হতেই, মহিলার ঠোঁট দুটো যেন মৃদু হাসিতে বিভক্ত হল। অপরেশ অবাক হলেন, প্রতিকৃতি কি হাসতে পারে! অপরেশ ঘন অন্ধকারেও অক্লেশে উপরে উঠে গেলেন।

সিঁড়ির সামনের ঘরটাই ছিল তাঁর বাবার। অপরেশ যেদিন চলে গেলেন, বাবা সেদিন অসুস্থ, শয্যাশায়ী ছিলেন। দেখা করে বিদায় নেবার সময় পর্যন্ত অপরেশ পাননি। পিতার মৃত্যু সংবাদ পেয়েছিলেন জেলে বসে। অপরেশ অবাক হলেন, ঘরের দরজা হাট খোলা। ঘরে ফিকে একটা চুরুটের গন্ধ। সেই চুরুট যে চুরুট বাবা রোজ খেতেন। কি করে এমন হয়! বছরের পর বছর ঘরে বৃদ্ধের শেষ খাওয়া চুরুটের গন্ধ কিভাবে ভেসে বেড়ায়!

অপরেশ ঘরে ঢুকলেন। খাটের ওপর পরিপাটি বিছানা বালিশ। খাটের পাশে শুঁড় তোলা চটি, যে চটি তাঁর বাবা রোজ পরতেন। বিছানার পাশে টিপয়ের ওপর নিকেলের ফ্রেমের চশমা এমনভাবে রাখা যেন এইমাত্র চোখ থেকে খুলে রাখা হয়েছে। পাশেই একটা বই উপুড় করা রয়েছে। ঘরের সংলগ্ন বাথরুমের মেঝে ভিজে। শাওয়ার থেকে টিপটিপ করে জল পড়ছে। সিসটার্নের চেনটা যেন অল্প অল্প দুলছে। তবে কি অপরেশের বাবা জীবিত! মৃত্যুর যে সংবাদ জেলে গিয়েছিল সে সংবাদ মিথ্যা!

অপরেশ দোতলার ঘর থেকে ঘরে ঘুরলেন। কোথাও কোনো জীবনের চিহ্ন নেই। বারান্দার দেয়ালের এক প্রান্তে কাঞ্চনের হাতের লেখা আবিষ্কার করলেন—'বাবা তুমি এসো, আমাকে বাঁচাও'। অপরেশ চিন্তিত হলেন, কেন কাঞ্চন এমন কথা লিখল! কাঞ্চন এখন কোথায়? কাঞ্চন কি তার মামার বাড়িতে নেই? কাঞ্চনের মা-ই বা কোথায়! সে যে জেলে বসে শুনেছিল সকলেই তার শ্বশুরবাড়িতে।

বাড়ির কোথাও একটা কিছু পড়ে যাবার শব্দ হল। অপরেশ চমকে উঠলেন। এ বাড়িতে দোতলা তিনতলার ছাদের মাঝে রহস্যময় একটা চোরকুঠুরির অস্তিত্বের কথা অপরেশের হঠাৎ মনে পড়ল। দোতলার বারান্দার শেষ কোণ থেকে একটা কাঠের সিঁড়ি বেয়ে সেই চোরকুঠুরিতে উঠতে হয়। মেঝেতে কাঠের পাটাতন পাতা। এক গাদা অব্যবহৃত ভাঙা ফার্নিচার, বাগানে কাজ করার ছোটখাটো যন্ত্রপাতি স্তূপাকার করা।

বর্ষার জলে ভেজা নড়বড়ে সিঁড়ি বেয়ে অপরেশ সেই কুঠুরিতে উঠলেন। ঘরের মেঝের চারিদিকে অজস্র মুরগি আর পাখির পালক ছড়ানো। হলদে হলদে পাখির পা একটা কোণে জমে আছে অজস্র। চারিদিকে ভ্যাপসা দুর্গন্ধ। চাপ চাপ শুকনো রক্ত। একটা শ্বাস প্রশ্বাস নেবার শব্দ আসছে ঘরের একেবারে শেষ প্রান্ত থেকে। অপরেশ ঘরের গভীরে ঢুকলেন। দুটো প্রায় ভেঙে-পড়া সোফার উপর চকচকে চেন বাঁধা দুটো কঙ্কাল, একটা বড় একটা শিশুর। বড় কঙ্কালটির হাতে একসার চুড়ি। এ চুড়ি তো তাঁর চেনা। এই তো তাঁর স্ত্রী। এই তো কাঞ্চন।

সারা ঘরে অপরেশ একবার ভালো করে দৃষ্টিপাত করলেন। দূরে একটা ভারী চেয়ার পেছনে ফেরানো। চেয়ারে হেলান দেবার জায়গার দিকে তাকিয়ে অপরেশ একটু চমকে উঠলেন। এক গোছা সাদা চুল শনের মত বেরিয়ে আছে। একটা মাথার কিছুটা অংশ। কাঞ্চনের ছেলেবেলার কোনো পরিত্যক্ত পুতুল নয় তো! অপরেশ এগিয়ে গেলেন। চেয়ারের পেছন থেকে মুখ বের করে অপরেশ ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন। কণ্ঠ থেকে কোনো শব্দ বেরোলো না। চেয়ারে বসে আছেন তাঁর পিতা। শীর্ণ হাত। আঙুলে বড় বড় বাঁকা নখ। মুখের দুকষ বেয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। কোলের ওপর ছেঁড়া একটা মুরগি পড়ে রয়েছে। পায়ের কাছে বসে আছে তাদের পরিবারের বিশ্বস্ত কুকুর। কিন্তু কুকুরটার একি অদ্ভুত চেহারা! মাথা আর

ল্যাজটায় খালি লোম আর মাংস আছে। বাকিটা শুধু হাড়ের খাঁচা। এই অবস্থায় কোনো পশু বাঁচতে পারে! অপরেশ আশ্চর্য হলেন। আরো আশ্চর্য হলেন তাঁর বাবাকে জীবিত দেখে। কিন্তু এ কি ভয়ঙ্কর রূপান্তর! এ তো মৃত্যুরই সামিল।

অপরেশের পিতা মৃত্যুর কিছু আগে থেকে, মৃত্যু মানে, জেলে পাওয়া মৃত্যু সংবাদের আগে থেকেই তন্ত্র, ডাকিনী বিদ্যা, এইসব নিয়েই মেতে উঠেছিলেন। গভীর রাতে ঘরে মৃদু আলো জ্বেলে নানা সাধনায় ব্যস্ত থাকতেন। মাঝে মাঝে বাড়িতে অদ্ভুত সব শব্দ শোনা যেত। অপরেশ সারা রাত জেগে বসে থাকতেন।

'তুমি আসবে জানতুম', বৃদ্ধ হাওয়ার শব্দে কথা বললেন। শরীরী কেউ এ বাড়িতে আসবে, কি থাকবে আমি তা চাই না। তাই শরীর নিয়ে তুমি আসতে পারলে না। তুমি যাদের রেখে গেলে, তাদের ব্যবস্থাও আমি সেই ভাবেই করেছি! একটু কষ্ট পেয়েছে, তা পাক, জীবনের কষ্টের চেয়ে জীবন্মুক্তির আনন্দ অনেক বেশি। তুমি নিজেই এখন তা বুঝতে পারছ। পারছ না? প্রশ্ন করে বৃদ্ধ উঠে দাঁড়ালেন। সম্পূর্ণ উলঙ্গ। শরীরের মাংস শিথিল হয়ে চারদিকে ঝুলছে। অপরেশ সেই গলিত রক্তমাখা বৃদ্ধের দিকে তাকিয়ে হাহাকার করে উঠতে চাইলেন; কিন্তু অনুভূতির শারীরিক অংশগুলো না থাকায় তা সম্ভব হল না।

'তোমাকে নিয়ে আসি, তুমিও তো এই পরিবারের সভ্য হলে, তোমার অস্থি অবয়ব ওই খালি আসনে ওদের পাশে বসবে, তিনে মিলে এতদিনে তোমরা সম্পূর্ণ হলে।' বৃদ্ধ খলখল করে হেসে উঠলেন। মনে হল অনেকগুলো ছিদ্রপথ দিয়ে হাওয়া বেরিয়ে এল। বৃদ্ধের পেছন পেছন বেরিয়ে গেল কুকুরটা।

অপরেশ চাইলেন সেই গুপ্ত কক্ষ থেকে মুক্ত হতে। কিন্তু আধারে আবদ্ধ হাওয়ার মত, জলের মত তিনি আর বেরোতে পারলেন না। ঘরে বৃদ্ধ নেই, তিনি অপরেশের দগ্ধ মৃতদেহ আনতে গেছেন কিন্তু

অদৃশ্য কোনো বেতার তরঙ্গে তাঁর কণ্ঠস্বর ভেসে এল: 'পারবে না, পারবে না তুমি পালাতে, বজ্রপাতের সঙ্গে সঙ্গে বাতাসের নাইট্রোজেন যেভাবে মাটিতে আটক হয়ে যায়, ঠিক সেইভাবেই তুমি তোমার অতীত অস্তিত্বে আবদ্ধ হয়ে রইলে। ধীরে ধীরে তোমার দেহ পচে যাবে, শুভ্র একটি কঙ্কাল আর তুমি মুখোমুখি বসে থাকবে অনন্তকাল।' সেই হাসি, বাতাসের আবর্তের মত হাসি সারা ঘরে।

গগনের মাছ

গগন পরশুদিন নাটাগড়ে মাছ ধরতে গিয়েছিল। তার অন্য কোনো নেশা নেই। বন্ধু-বান্ধব নেই। আড্ডা নেই। তাস পাশা নেই। যা আছে তা হল মাছ ধরার ঝোঁক। পুকুর কিংবা বিল দেখলেই তার প্রাণটা নেচে ওঠে। যত তাড়াতাড়ি থাক, যত কাজই থাক, সে জলের ধারে থমকে দাঁড়ায়। জলের রঙ দেখলেই সে বুঝতে পারে, সেই পুকুর কিংবা বিলে কি কি মাছ আছে। কত বড় মাছ আছে। মাছগুলোর স্বভাব কি ? সহজে ধরা দেবে, না বঁড়শির মুখে গাঁথা টোপটি ঠুকরে ফতনাটি দুবার নাচিয়ে দিয়ে সরে পড়বে। জলের তলায় ঝাঁজি আছে কিনা, ছোটো কাঁকড়া কিংবা কাছিম আছে কিনা, জলের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়েই সে জলের মত বুঝতে পারে। তার এই স্বভাবের জন্যে লোকে তাকে মেছো গগন বলে। অনেকের ধারণা গগন পূর্বজন্মে মাছরাঙা ছিল। আগামী জন্মে ভোঁদোড় হয়ে জন্মাবে।

এই মাছের নেশাটি আছে বলেই গগনের জীবনে কোনো দুঃখ নেই। সদাশিব মানুষ। লম্বা চওড়া চেহেরা। সহজ সরল মানুষ। একটা বড় কারখানায় হাতের কাজ করে যা উপার্জন করে, মা আর ছেলের ছোট্ট সংসার সুখেই চলে যায়। শৈশবেই বাবা মারা যান। লেখাপড়া সেই কারণে খুব বেশিদূর এগোয়নি। বিধবা মা, সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় কোনো রকমে ছেলেকে মানুষ করেছেন। পৈতৃক বাড়িটা ছিল তাই রক্ষে। ছোট একতলা বাড়ি। খান চারেক ঘর। দুখানা ঘর ভাড়া দিয়ে গগনের মা সংসার চালাতেন। ভাড়াটে ভালো। ভাড়া নিয়ে কোনো অসুবিধা কোনো কালে হয়নি। সেই ভাড়াটে এখনও আছেন। অনেকটা বাড়ির লোকের মতই হয়ে গেছেন তাঁরা।

দুটো পরিবারকে এখন আলাদা করাই শক্ত। বাইশ বছর আগে যা ভাড়া ছিল এখনও তাই আছে। এক পয়সা ভাড়া বাড়াবার কথা কেউ কখনো বলেননি। এখন গগন রোজগার করছে। ভাড়ার টাকার উপর তাদের আর নির্ভর করতে হয় না। যা আসে সেইটুকুই বাড়তি।

গগনের বাহন হল সাইকেল। পৈতৃক সাইকেল। সেকালের জিনিস। গগনের যত্নে ঠিক সারভিস দিয়ে যাচ্ছে। একবার চুরি হয়ে গিয়েছিল! কিন্তু সাইকেলটা গগনের সেবায় এতই সন্তুষ্ট যে আবার ফিরে এসেছিল দিন কতক পরে। থানার দারোগা বলেছিলেন, 'গগনবাবু এ রকম বরাত লাখে একটা মেলে।' গগন কৃতজ্ঞতা স্বরূপ সের আড়াই ওজনের একটা কালবোস দারোগাবাবুকে প্রেজেন্ট করে এসেছিল। গগনের মাছ-ধরা এই জন্যেই। নিজে আর কতটা খাবে। গগন ধরে মাছ, পাড়ার লোকে খায় সেই মাছ। প্রতিবেশীরাই ভালো পুকুরের সন্ধান এনে দেয়। গগন সাইকেলে নানা মাপের ছিপ, হুইল বেঁধে, চার, টোপ নিয়ে টিফিন ক্যারিয়ারে খাবার নিয়ে সাত-সকালেই বেরিয়ে পড়ে। গ্রীষ্ম আর বর্ষার দিনে ছাতা থাকে। ইদানিং এক বোতল কার্বলিক অ্যাসিডও সঙ্গে রাখে। বার কতক কেউটে সাপে তাড়া করেছিল।

নাটাগড়ের পুকুরটার খবর দিয়েছিল তারই এক সহকর্মী। সেই সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। বলেছিল বিশাল পুকুর। পাঁচিল ঘেরা বাগানের মধ্যে। বারোয়ারী পুকুর নয়। মাছগুলো সেই কারণে ছ্যাঁচড়া নয়। ছিপ ফেলতেই ধরা দেবে। সব মাছই বড়। বৈষ্ণবের পুকুর। কালে ভদ্রে জাল পড়ে। খুব জানাশোনা লোক ন-মাসে ছ-মাসে সখ করে ছিপ ফেলে।

গগন অবশ্য ঠিক এই রকম পুকুরে মাছ ধরতে চায় না। সে হল পাকা মাছ ধরিয়ে। খেলোয়াড়, ত্যাঁদোড়, তেএঁটে মাছ না হলে সে মাছ ধরে আনন্দ পায় না। অনেকদিন তেমন সুযোগ পাচ্ছিল না

বলে এ সুযোগটা সে হাতছাড়া করল না। দেখাই যাক না কি হয়। গগন বেরিয়ে পড়ল। বাহন সাইকেল। সঙ্গে একটা টর্চও নিল। দূরের পথ। পথে আলো থাকবে কিনা কে জানে। সাবধানের মার নেই।

বিশাল পুকুর। সরোবর বলাই ভাল। যাঁদের পুকুর তাঁরা এককালে জমিদার ছিলেন। একপাশে তাঁদের বিশাল বাড়ি। সংস্কারের অভাবে একটু জীর্ণ। একপাশে পুরোনো মডেলের একটা অস্টিন গাড়ি পড়ে আছে। গাড়িটা মনে হয় চলে। সামনেই ঢালা ছাদ। ছাদের কার্নিসে একটা পরী ডানা মেলে আছে। যেন এখুনি উড়ে যাবে। দেউড়িতে এখনো দারোয়ান বসে। গগনের সাইকেলের মত। পুরোনো মনিবের মায়া ছাড়তে পারছে না বলেই বোধ হয় বহাল আছে।

বাগানের গেট পেরিয়ে ইঁট বাঁধানো পথে এগোতে এগোতে গগন যেন পুরোনো কালের গন্ধ পেল। বহু স্মৃতি যেন ভিড় করে এল। প্রাচীন গাছের কালো গুঁড়িতে সবুজ শ্যাওলা। বছরের পর বছর পাতা পড়ে গাছের তলায় তলায় আর মাটি দেখা যায় না। রোদ খুব কমই পড়ে। পাতা পচার জৈবগন্ধ। জায়গায় জায়গায় সাদা সাদা ব্যাঙের ছাতা। এক একটা গাছের গায়ে পরগাছা উঠেছে লতিয়ে লতিয়ে। এক সময়কার সযত্ন পরিচর্যার বাগান দীর্ঘ অবহেলায় না বাগান, না জঙ্গল অদ্ভুত এক ভুতুড়ে পরিবেশ তৈরি করেছে। মাঝে মাঝে শ্বেতপাথরের নানা ঢঙের মূর্তি চলে-যাওয়া একটা কালকে পাথরের অবয়বে ধরে রেখেছে। গগনের মনে হল মানুষের সমৃদ্ধি কত ক্ষণস্থায়ী। গরিব আছি বেশ আছি বাবা। উত্থানও নেই পতনও নেই। ছেলেবেলায় কথায় কথায় মা বলতেন না, 'অতি বাড় বেড়ো না ঝড়ে পড়ে যাবে ; অতি নিচু হয়ো না গরুতে মুড়িয়ে খাবে।'

বাগানের পথ দিয়ে বেশ কিছুটা এগিয়ে ডাইনে বাঁয়ে বেঁকতে বেঁকতে গগন সেই পুকুরের পাড়ে এল। যেখানে তার সারাটা দিন

কাটবে জলের ওপর বাতাসের হালকা তরঙ্গ দেখে, ফাতনা দেখে, মাছের বুড়বুড়ি আর ঘাই মারা লক্ষ করে। পুকুরটা এক সময় খুব যত্নের পুকুর ছিল দেখলেই বোঝা যায় চারপাশ ইট দিয়ে বাঁধানো। চার দিক থেকে চারটে ঘাট জলের অনেক দূর পর্যন্ত নেমে গেছে। পাথর বসানো ঘাটের পৈঠের জোড় জায়গায় জায়গায় ছেড়ে গেছে। সেই সব ফাঁকে ছোটো ছোটো আগাছা জন্মেছে। কতকালের পুরোনো জল, যেন আলকাতরা গোলা। চারিদিক শান্ত নির্জন। কোথায় একটা পাখি ডাকছে টুঁই-টুই— ।

গগন জল চনে। পুকুরটা দেখে তার ছিপ ফেলতে ইচ্ছে হল না। তার মনে হল চারিদিকে যেন একটা অশরীরী আতঙ্ক ছড়িয়ে আছে। জলে, ভাঙা ঘাটে পুরোনো দিনের অনেক গোপন কথা যেন শ্যাওলার মত জড়িয়ে আছে। বড়লোকের পুকুর দেখলেই গগনের আত্মহত্যার কথা মনে হয়। মনে হয় জলের তলায় চেনবাঁধা কঙ্কাল আছে। মনে হয় পুকুরের মাঝখানে গভীর একটা কুয়ো আছে, যেখান থেকে মাঝরাতে চেন শিকল আর লোহার কড়া নাড়াবার ঠনঠন শব্দ ওঠে। কেউ যেন গুমরে গুমরে কেঁদে ওঠে, আমায় মুক্তি দাও, মুক্তি দাও। মাঝে মাঝে সোনার বালা পরা একটা হাত মাঝ পুকুরে জলের ওপর ভেসে উঠে কিছু একটা ধরার নিস্ফল চেষ্টা করে আবার তলিয়ে যায়। গগন এসব কখনও দেখেনি, তার মনে হয়।

ঘাটের বাঁধানো বেদীতে বসে, পাশে তার ঝোলাঝুলি সাজ-সরঞ্জাম নামিয়ে রেখে গগন চারপাশটা একবার ভালো করে তাকিয়ে দেখল। চারিদিকে বড় বড় রাই ঘাস গজিয়েছে, সাপের আত্ম-গোপনের জায়গা। গগন খুব হতাশ হল। এই পুকুর নিয়ে গল্প লেখা চলে। মাছ ধরা চলে না। হঠাৎ পুকুরের মাঝখানের জল উৎলে উঠল। ঘাই দেখে মনে হয় সের তিরিশ ওজনের একটা মাছ। এতবড় মাছ ছিপে পড়লেও ছেড়ে দিতে হবে। এ মাছ কেউ খায় না।

এতদূর এসে গগনের ফিরে যেতেও ইচ্ছে করছে না। চুপচাপ

বসে থাকতে অবশ্য খারাপ লাগছে না। জল থেকে রোদের তাতে গরম ঠাণ্ডা মেশানো একটা ভাপ উঠছে। গাছের পাতায় ছায়া কাঁপছে। ঘাসের ডগা সিরসির করে হাওয়ায় দুলছে। অনেক সব পুরোনো দিনের কথা গগনের মনে আসছিল। পুরোনো কথা যত মনে পড়ছিল মনটাও তত বিষণ্ণ হচ্ছিল। একবার মনে হল ফিরে যায়। তারপর মনে হল অনেকে আশা করে থাকবে। গগন কখনও ফেলিওর হয়নি।

টিনের কৌটো খুলে গগন চার, টোপ সব একবার দেখে নিল। মনে মনে বলল, এসেছি যখন এক হাত ফেলেই দেখি, কি হয়। পুকুরের দিকে তাকিয়ে গগনের মনে হল, মানুষের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মত অজানা সম্ভাবনা নিয়ে স্থির অচঞ্চল। ঘাটে বসে কি মাছ ধরা যায়, গগন হেসে উঠল। একটু আঘাটায় বসতে হয়। বসবে কি করে! বাঁধানো পাড় ঢালু নেমে গেছে। অগত্যা ঘাটের শেষ পৈঠেতে বসে গগন ছিপ ফেললে। বাতাসের সাঁ সাঁ শব্দ হচ্ছে। খুব প্রাচীন মাছও সাঁ সাঁ করে শব্দ করে, গগন শুনেছে। অবশ্য নিজের কানে কখনও শোনেনি!

ফাতনার উপর বারেবারে একটা ফড়িং এসে বসছে। ঠিক বসছে না, কেঁপে কেঁপে উড়ছে। জলের উপর ছোট্ট একটা মাথা জ্বলজ্বলে দুটো চোখ নিয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণে সরে সরে যাচ্ছে। জোলো হাওয়ার গরম ঠাণ্ডায় গগনের চোখে যেন ঘুমের আমেজ আসছে। প্রচুর নেশা করলে মানুষের এই অবস্থা হয়। তবু গগন জলের দিকে তাকিয়ে বসে রইল। এক সময় তার মনে হল বঁড়শিটা কিছুতে ঠোকরাচ্ছে। গগন ফাতনাটা কায়দা করে সোজা করে নিল, হেলে গিয়েছিল।

ফাতনাটা হঠাৎ ডুবে গেল। গগন প্রস্তুত ছিল। সুতোটা একটু টান করেই আলগা দিল। বড় মাছ বলেই মনে হচ্ছে। এ পুকুরে ছোট মাছ নেই গগন জল দেখেই বুঝেছে। এও বুঝেছে; চালাক

মাছ একটাও নেই, সব কটা বোকা গাধা। খাদ্য আর টোপের পার্থক্য বোঝে না। তা না হলে বঁড়শি ফেলতেই ধরত না। গগনের মনে হল মাছটা না খেলেই ভালো হত। অনর্থক এমন খেলাতে হবে। শেষে উঠে আসবে শ্যাওলা ধরা পাঁকগন্ধ এক মাছ! যাকে মাছ না বলে মৎস্যাবতার বললেই ভালো হয়। যার বয়স হয়তো পঞ্চাশ বছর।

মাছটা অবশেষে উঠল। যা ভেবেছিল তাই। মাছটা ইচ্ছে করলে ন্যাজের ঝাপটা মেরে গগনকে কাবু করে ফেলতে পারে। ইচ্ছে করলে খেয়েও ফেলতে পারে। সারা গায়ে কালো আঁশের উপর এক ধরনের সাদা সাদা লালা জড়িয়ে আছে। গগনের হাত ঠেকাতেই ইচ্ছে করছিল না। কোনো রকমে ঘাটের পৈঠেতে ফেলল। গগন আশ্চর্য হয়ে দেখল মাছটার নাকে একটা সোনার নথ লাগানো। অবাক কাণ্ড! মাছটা খাবি খাচ্ছে। চিঁ চিঁ করে একটা শব্দ করছে।

গগন কি করবে ভাবছে। এমন সময় তার পেছনে হাল্‌কা চুড়ির কিন কিন শব্দ হল। গগন চমকে ফিরে তাকাল। তার পেছনে কখন এসে দাঁড়িয়েছে ন-দশ বছরের ফুটফুটে একটি মেয়ে। একরাশ ঘন কালো চুল। আকাশের মত নীল বড় বড় দুটো চোখ গোল গোল দুটো হাতে সরু সরু মিছরি কাটা সোনার চুড়ি।

গগন তাকেতেই মেয়েটি বললে—

ওমা, তুমি আমার ভোলাকে ধরেছ। তুমি কি গো! ওকে ছেড়ে দাও।

গগন বললে, এর নাম বুঝি ভোলা?

—হ্যাঁ গো, দেখছো না ওর নাকে নোলোক। আমার মা পরিয়ে দিয়েছিলেন।

—তোমার নাম কি মা?

—আমার নাম তো চুমকি। তুমি আগে ছেড়ে দাও। জানো না বুঝি, জলের বাইরে মাছ বেশিক্ষণ বাঁচে না।

—দিচ্ছি মা, ছেড়ে দিচ্ছি। তোমার সঙ্গে কথা বলছিলুম তো।

—আমার সঙ্গে পরে কথা বলবে। আগে ওকে ছেড়ে দাও। তুমি ভীষণ নিষ্ঠুর। জলের মাছকে কেউ ডাঙায় তোলে!

গগন তাড়াতাড়ি মাছটাকে জলে ছেড়ে দিল। মুখ না ঘুরিয়েই বললে, এই নাও তোমার ভোলা আবার জলে চলে গেল। আর আমাকে নিষ্ঠুর বলবে? বল মা আর আমাকে নিষ্ঠুর বলবে?

ভোলা তখন ন্যাজ নাড়তে নাড়তে চলে যাচ্ছে। গগন কোনো উত্তর না পেয়ে ফিরে তাকালো। কোথায় কি? কেউ কোথাও নেই। গগন জোরে জোরে ডাকল,—চুমকি, চুমকি। বাতাসের শব্দ, সেই পাখিটা ডাকছে টুই—টুই।

নির্জন দুপুর। বড় বড় গাছের তলায় আলো ছায়ার খেলা।

গগনের কেমন ভয় ভয় করল। মনে হল দুপুর নয়, চারদিকে নিশুতি রাত নেমে এসেছে। এত তাড়াতাড়ি যে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে সে কি পাখি না মানুষ? ছমছমে মন নিয়ে গগন বাগানের গেটের কাছে ফিরে এল। দারোয়ানকে জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁ গো, চুমকি বলে এ বাড়িতে কোনো মেয়ে আছে? প্রশ্ন শুনে দারোয়ানের মুখটা কি রকম হয়ে গেল। কেন বাবু? গগন বললে,—না বেশ মেয়েটি। এই মাত্র আবার সঙ্গে কথা হল, তারপর কোথায় যে চলে গেল হঠাৎ। দারোয়ান হঠাৎ খুব গম্ভীর হয়ে গেল—সে বাবু অনেক কাল আগের কথা। এই বাড়ির মেজোবাবুর ছোট মেয়ে ছিল। বিশ-বাইশ বছর আগে ওই পুকুরে ডুবে মারা যায়। মেজবাবুও বেঁচে নেই। মাইজী এখন বালিগঞ্জে থাকেন। ওই ছিল একমাত্র মেয়ে। কি করে যে ডুবে মারা গেল কেউ জানে না। এই বাড়ির একটা ঘরে এখনো তার খাট বিছানা পাতা আছে। সব খেলনা বই সাজানো আছে। মাইজী মাঝে মাঝে আসেন। আজও এসেছিলেন। এই একটু আগে চলে গেলেন।

গগন তাকিয়ে দেখল, সেই অস্টিন গাড়িটা নেই।

গগনের নাটাগড়ের গল্প কেউ বিশ্বাস করে, কেউ করে না। গগন কিন্তু মাছ আর ধরে না। সব মাছই এখন তার কাছে ভোলা। চুমকি তাকে নিষ্ঠুর বলেছিল! সেই কথাটা তার মনে কাঁটার মত বিঁধে আছে।

'মাছ কি ডাঙায় বাঁচে। তুমি এত নিষ্ঠুর কেন গো!'

নীল চোখ, কোঁকড়া চুল, চুড়ির মিঠে কিনি কিনি।

মাছের নেশা আর গগনের নেই।

তোয়াজ

শচিন আর শচিনের মেয়ে একসঙ্গে খেতে বসেছে। ছুটির দিন বাপ আর মেয়ে একসঙ্গে পাশাপাশি খেতে বসে। শচিন চল্লিশ পেরিয়ে সামনের কার্তিকে একচল্লিশে পড়বে। শচিনের মেয়ে শুভার বারো চলছে। মেয়েটির বেশ কথা ফুটেছে। সব সময় কথার খই ফুটছে মুখে। আজকাল মায়ের কাজকর্মের সমালোচনা করারও সাহস হয়েছে। মাঝে মধ্যে চড়-চাপড়ও খায় এর জন্যে। তবু বলতে ছাড়ে না। শচিন অবশ্য মেয়েকে বাঁচাবার চেষ্টা করে। করলে কি হবে, শুভার মার আবার রেগে গেলে জ্ঞান থাকে না।

শুভা ডালের বাটিটা দেখিয়ে বাবাকে বললে, 'চেহারাটা দেখেছো?'

শচিন আগেই দেখেছে। একবাটি কালচে জল। মনে মনে সে যা ভাবছিল, মেয়ের মুখে সেই ভাবনাটাই কথা হল।

শচিন বললে, 'মালটা কি বল তো?' শচিন এই ভাবেই কথা বলে।

'মালটা হল মার হাতের বিখ্যাত মুগের ডাল।'

'কি দিয়ে এরকম চেহারা করে বল তো?'

'জিজ্ঞেস কর না।'

শচিন একটু থমকে গেল। অলকাকে ডেকে ডাল সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করা মানেই ব্যাপারটাকে অনেকদূর গড়াতে দেওয়া। কেঁচো খুঁড়তে বড় বড় সাপ বেরোনো। খেতে বসে অশান্তি শচিন ভালবাসে না। মাসখানেক আগে অম্বলের অসুখে ভীষণ কষ্ট পেয়েছে। শ'পাঁচেক টাকা ওষুধে পথ্যে বিধু ডাক্তারকে ধরে দেবার পরও অম্বল যখন কিছুতেই সারল না, জল খেলেও অম্বল, তখন সুনীলবাবু শচিনকে

ধরে নিয়ে গেলেন এক মনস্তত্ত্ববিদের কাছে। সুনীলবাবু শচিনের সহকর্মী। সে ভদ্রলোকের অম্বলও কিছুতেই সারছিল না। মনস্তাত্ত্বিক ডক্টর এইচ এস ঘোষ তিনটে সিটিং-এই সুনীলবাবুর সব অম্বলরস মধুররস করে দিয়েছেন।

সেই ডক্টর ঘোষ শচিনকে বারবার বলেছেন, 'অম্বল, পেটের অসুখ, বুক ধড়ফড় প্রভৃতি সমস্ত অসুখের নাইনটি নাইন পয়েন্ট নাইট নাইন পার্সেন্টই সাইকো-সোম্যাটিক ডিজিজ। মন চাইছে অসুস্থ হতে তাই দেহ অসুস্থ হয়ে পড়ছে। 'মনটাকে কনট্রোলে রাখুন। রোজ সকালে পট্টবস্ত্র পরে গীতাপাঠ করবেন, স্পেশ্যালি দ্বিতীয় অধ্যায়। মনের দাঁড়ে সব সময় একটি খুশি খুশি পাখিকে বসিয়ে রাখবেন, মনের আকাশ যে সব সময় গানে গানে ভরে রেখে দেবে। আর বাড়িতে একটা ফতোয়া জারি করে দেবেন, খাবার সময় স্রেফ স্ফূর্তি, কোনওরকম চেঁচামেচি, হইহই, ঝগড়াঝাঁটি অশান্তি কিচ্ছু চলবে না। প্রশান্ত মনে, তন্ময় হয়ে খাদ্য-বস্তুকে আক্রমণ করবেন। খাবার সময় যাদের আপনি অপছন্দ করেন তাদের ধারে-কাছে ঘেঁসতে দেবেন না, তাদের কথা চিন্তাতে পর্যন্ত আনবেন না। পারলে, খাবার সময় রেকর্ডপ্লেয়ারে কি টেপ-রেকর্ডারে হালকা কোন গান চালিয়ে দেবেন। মিউজিক। খাবার ঘরের দেয়ালটা উজ্জ্বল রঙে রাঙিয়ে দেবেন। জানালায় ঝুলিয়ে দেবেন বাহারি পর্দা। ফুল রাখবেন, কিছু ফুল। আসল ফুল খরচে সামলাতে না পারলে প্ল্যাস্টিকের ফুল। দূরে কোথাও বেশ ভাল একটা ধূপ জ্বেলে রাখবেন। হাওয়ায় গন্ধ ভেসে আসবে ফুরফুর করে। খেতে বসবেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জামা কাপড় পরে। কেলে লুঙি কিংবা খেঁটে গামছা পরে খেতে বসা চলবে না। যুযুৎসু অথবা ক্যারাটে শেখার পোশাক দেখেছেন? লুজ, ঢলঢলে, ধবধবে সাদা। পরিবেশন যিনি করবেন, যদি স্ত্রী হন বলবেন ঝলমলে উজ্জ্বল শাড়ি পরে, গায়ে সেন্ট মেখে পরিবেশন করতে। যদি কাজের লোক রেখে থাকেন এবং সে যদি পরিবেশন করে, তা হলে কৃপণতা না

করে তার কাপড় জামার পেছনে নিজের অম্বলের স্বার্থে বাড়তি কিছু খরচ করবেন। কথায় বলে পেটপুজো। সেই পুজোর আয়োজনে কোন ত্রুটি থাকলে চলবে না। "আহার কর মনে কর আহুতি দি শ্যামা মাকে।"

শচিন মেয়েকে বললে, 'চেপে যা। যা পাবি চোখ কান বুজিয়ে খেয়ে যাবি! খুঁত-খুঁতে স্বভাব ভাল নয়, বুঝলি? পেট ভরানো নিয়ে কথা।'

'তুমি কখন কি যে বল বাবা? এই সেদিন বললে ডাক্তার ঘোষ বলছেন, খাবারের রঙ, গন্ধ, এমন হবে, দেখলেই যেন ভেতরটা খাব খাব করে ওঠে। তুমি বললে, মাসকাবার হলে ভাল ভাল সব প্লেট ডিশ কিনে আনবে। ঝকঝকে, চকচকে খাবার টেবিল তৈরি করাবে, চারখানা চেয়ার।'

'তোর জন্যেই তো কেনা গেল না।'

'আমার জন্যে?'

শচিন ঠোঁটে আঙুল রেখে স স শব্দ করে মেয়েকে সাবধান করে দিল। পাশের রান্নাঘর থেকে অলকা আসছে। দু'বাটি ডাল দিয়ে বসিয়ে দিয়ে গিয়েছিল, এইবার বাকি মালেরা একে একে আসছে। শচিনের মনে হল, প্রথম স্যামপেলটি যা ছেড়েছে তাইতেই আমরা কাত। তোমার বাকি কেরামতি যা যা বেরোবে, বোঝাই গেছে। হায় অলকা, যৌবনে মনোযোগ দিয়ে রান্নাটা যদি একটু শিখতে! একেবারে গোয়ানিজ কুক হতে হবে একথা কেউ বলছে না; কিন্তু নিতান্তই মুখে দেবার মত একটা কিছু দাঁড় করবার ক্ষমতা যদি তোমার থাকত! আমি নিজেই যে তোমার চেয়ে ভাল রাঁধার ক্ষমতা রাখি। শচিন ভাবনাটাকে মাঝারি রকমের একটা গলাখাঁকারি দিয়ে মন থেকে বের করে দেবার চেষ্টা করল। ডাক্তার ঘোষ বলেছেন 'বি চিয়ারফুল. বি চিয়ারফুল'।

'হুঁ উউ গীত গাতা চল উঁউঁউঁ গীত গাতা চল', শচিন নখের টুসকি

দিয়ে ডালের বাটির গায়ে একটু মিউজিকের মত কিছু করা যায় কিনা চেষ্টা করল। কোথায় সুর। বেসুরো ডাল থেকে কি আর কাফী ঠুমরি বেরোয়। কেলে মত একটু ডালের জল মেঝেতে ছলকে পড়ল।

অলকা ভাতের থালাটা দক্ষিণী-নাচের মুদ্রার কায়দায় মেঝেতে রাখতে রাখতে বললে, 'পাঁচ টাকা কিলো. ফুর্তিটা ডালের বাটির ওপর না দেখিয়ে নিজের মনেই চেপে রাখার চেষ্টা কর। পাশেই কলাগাছ বড় হচ্ছে। বিয়ের খরচটা তোমার ঘোষ ডাক্তার যোগাবে না। তার ব্যবস্থা তোমাকেই করতে হবে।'

শুভা জিজ্ঞেস করল, 'বাটিতে এটা কি মা?

অলকা মেয়ের দিকে কটমট করে তাকিয়ে বলল, 'খেয়ে দেখ। হাতে পাঁজি মঙ্গলবার।'

'এটা খাবার জিনিস কিনা সেটা তো আগে জানা দরকার।'

'চুউপ।'

অলকার 'চুপ' যেন বোমার মত ফাটল। শচিন চমকে উঠেছিল। শুভারও চোখ পিটপিট করে উঠেছে।

'বাপের আশকারায় একেবারে মাথায় উঠে বসেছে। যা দোব মুখ বুজে খেতে পার খাও, না পার উঠে যাও। আমার কাছে অত খাতিরখুতির নেই।'

মায়ের চিৎকার আর আসন থেকে স্প্রিঙের মত মেয়ের লাফিয়ে ওঠাটা এমন-ভাবে মিলে গেল, শচিনের মনে হল, অলকার পায়ের চাপে স্প্রিং লাগানো একটা বাক্সের ডালা খুলে গেল। শুভা শচিনের পেছন দিক দিয়ে গুমগুম করে পা ঠুকে ঠুকে খাবার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। মা, মেয়ে দুজনেই সমান রাগপ্রধান।

শচিন ডাকল, 'শুভা, শুভা রাগ করিসনি মা, যাসনি, আয়।'

অলকা বললে, 'মা বলে আদর দিয়ে মাথাটা আর খেও না দয়া করে। পেটের জ্বালা ধরলে ঠিক এসে খাবে। পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। তুমি খেয়ে-দেয়ে আস্তে আস্তে সরে পড়। আজ বিকেলে

কল্যাণী আসবে না। তোমাদের খাওয়া হলে স্তূপ বাসন নিয়ে বসতে হবে আমাকে।'

'তোমার কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই। খেতে বসিয়ে শত্রুর সঙ্গেও দুর্ব্যবহার করতে নেই। মেজাজটা সব সময় এমন চড়াপর্দায় বেঁধে রেখেছ, সাপের মেজাজও হার মানে! কথায় কথায় ফোঁস!'

'হ্যাঁ কথায় কথায় ফোঁস! আমার মেজাজ ওই রকমই, জানই তো! আমি সব সময় তুমি মশাই, তোমার ন্যাজ মশাই করে চলতে পারব না। আমার হল ধর তক্তা মার পেরেক। সংসার আমাকে কি দিয়েছে, কি দিয়েছে শুনি। সংসারে বলির পাঁঠা হয়ে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব হবে না!'

'পাঁঠা নয় বল পাঁঠী। রেগে যাও ক্ষতি নেই 'গ্রামারে ভুল কর না।'

শচিন আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াতে গেল, শরীরটা দু'ভাঁজ হয়েছে, শেষ ঠেলায় এইবার নিজেকে সোজা করলেই হয়, অলকা এক ধমক লাগাল, 'উঠছ কোথায়, উঠছ কোথায়, শুনি!'

'যাই মেয়েটাকে ধরে আনি। ও না খেলে আমি খাই কি করে?'

'আহা মেয়ে সোহাগী রে! তোমার ভাবনা তুমি ভাব। মেয়ের ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না। আমার মেয়ে আমি বুঝব। অয়েল ইওর ওন মেশিন।'

ডক্টর ঘোষ বলেছেন, খাওয়ার এক ঘণ্টা আগে ও পরে নিজেকে কোনও রকম উত্তেজনার মধ্যে জড়িয়ে ফেলবেন না। কাম, অ্যাবসলিউট কাম, ভরা নদীর মত শান্ত তরঙ্গহীন। উত্তেজনা মানেই ভেগাস নার্ভের ছটফটানি, সঙ্গে সঙ্গে অ্যাসিড!

অ্যাসিড পেটের মধ্যে ছাড়া থাকতে থাকতে উদরের মিউকাস মেমব্রেন খেয়ে ফেলবে। দেখতে দেখতে জবরদস্ত আলসার, তারপর ফ্যাঁস করে একদিন পেটটা ফুটো করে দেবে। বাঁচতে যদি চান, জেনে রাখুন দারাপুত্র পরিবার তুমি কার কে তোমার?

ঠিক আছে বাবা, বাপ ঠাকুর্দার আমলে বলত কর্তার ইচ্ছায় কর্ম, এ যুগে গিন্নির ইচ্ছায় কর্ম। শচিন আবার ফোলডিং টেবিল ল্যাম্পের মত ভেঙে পড়ল। মাথাটা থালার ওপর হেঁট। পাশে মেয়ের আসনটা খালি। তার বয়সের মাপের ছোট্ট থালায় এক মুঠো ভাত, কয়েক টুকরো আলু ভাজা। গুলি গুলি কয়েকটা বড়ি ভাজা একপাশে গড়াগড়ি পড়ে আছে। শুভা রেগে আসন থেকে উঠে যাবার সময় আসনটা একটু গুটিয়ে গেছে। শচিন আড় চোখে একবার তাকিয়ে দেখল। ছোট্ট একটা মাছি থালার ওপর ভনভন করছে। এর নাম খাওয়া। সুখের আহার। ইংরেজের জেলখানায় স্বদেশীরা অনশন করত। পুলিশ হাতে ব্যাটন নিয়ে সামনে এসে বসত, গলায় বাঁশ পুরে জোর করে খাওয়াত। এ যেন ছেলে পুলিশের বদলে মেয়ে পুলিশ। হাতে ব্যাটনের বদলে হাতা। সংসার কারাগারে স্ত্রীর হাতে স্বামী-নির্যাতন! এভাবে কি খাওয়া যায়? গলায় গাদা যায়! মেয়েটার মুখের ভাত পড়ে রইল, সে বাপ হয়ে কেমন করে খায়? তবু অশান্তির চেয়ে শান্তি ভাল। ডক্টর ঘোষ বলেছেন…।

খাবার আসনে শচিনকে দাবড়ানির আঠা দিয়ে আটকে রেখে অলকা রান্নাঘরে গেছে পরের কেরামতিগুলো আনতে। যেমন ভাতের ছিরি, তেমনি ডালের ছিরি। ভাজা! ভাজায় আর কি কেরামতি থাকতে পারে! কম তেলে আধপোড়া। আহা! কোথায় গেল মায়ের হাতের আলু ভাজা! কোথাও এতটুকু বেশি কি কম ভাজা নেই! হালকা বাদামী রঙ! মুখে দিলেই মুচমুচ শব্দ! তেলের কালচে খাঁকরি লেগে নেই। অলকার ভাজা আলু যেন ভূতের খোকা। কাজল চটকানো খোকার মুখ। কৃপণরা কি আলু ভাজতে পারে! ভাজাভুজিতে দিল ছাই।

অলকা আবার এসেছে। উনুন থেকে সাঁড়াশি দিয়ে সরাসরি তুলে এনেছে কেলে একটা কড়া। তেল তখনও পিটপিট করে

ফুটছে। এই দৃশ্যটা শচিনের কাছে ভীষণ ভীতিপ্রদ। তেলসুদ্ধ গরম কড়া সাঁড়াশির ঠোঁট আলগা হয়ে কোনদিন যদি ধপাস করে সামনে পড়ে শচিনের নির্ঘাত মৃত্যু। গরম তেল ছিটকে চোখে-মুখে, সর্বশরীরে। চোখ দুটো তো যাবেই, সেই সঙ্গে মুখের চেহারা হবে চল্লিশ স্ক্রীনে ছাপা ব্লকের মত কালো কালো বিন্দু বিন্দু। বিয়ে করে বিল্বমঙ্গল। শচিন বহুবার স্ত্রীকে সাবধান করেছে, ওহে ভালমানুষের মেয়ে, তোমার এই বিপজ্জনক প্রথাটি দয়া করে ছাড়। কে কার কথা শোনে। চোরা না শোনে ধর্মের বাণী। কথাই যদি শুনবে তা হলে স্ত্রী হবে কেন? প্রতিবারই অলকার এক উত্তর 'কড়া আমার হাতে। ভবিষ্যৎও আমার হাতে। ভাগ্যকে যেভাবে নিয়তি ধরে থাকে, আমার হাতের সাঁড়াশিও সেইভাবে কড়ার কানা ধরে আছে। কারুর বাপের সাধ্য নেই এখন কি হয় বলে।' ঠিকই তো? ভয়ে মরলেই সেক্সপিয়ার, কাওয়ার্ডস ডাই মেনি টাইমস, আর একটু এগোলেই রবীন্দ্রনাথ, মরতে মরতে মরণটারে। শচিন অবশ্য ভেবেই রেখেছে, সত্যিই যদি তেমন কিছু হয়, নিয়তির ঠোঁট আলগা হয়ে কড়া যদি দড়াম করে মুখের সামনে পড়ে এবং চোখ দুটো যায়, তাহলে ওই মোড়ের মাথায় চেটাই পেতে সিঙ্গল রিডের হারমোনিয়াম নিয়ে সামনে একটা কানা উঁচু থালা রেখে সারাদিন গান গাইবে, ভালবাসার আগুন জ্বেলে কেন চলে যাও। অলকা পাশে বসে এক হাতে মাথায় ধরে থাকবে রঙ-চটা ছাতা আর এক হাতে মাঝে মাঝে হাতপাখা নেড়ে বাতাস করবে। এই রকম একটি হতভাগ্য দম্পতিকে সে রোজই পথে দেখে। মাথায় ছাতা ধরবে! হাতপাখা নেড়ে বাতাস করবে! কে, অলকা! এমন দিন কি হবে মা তারা।

অলকা বাঁ হাতে ধরা সেই ভয়ঙ্কর তপ্তকটাহের ফুটন্ত শব্দায়মান তেল থেকে খুন্তি দিয়ে একটি ভাজা মাছের দাগা তুলে শচিনের ভাতের ওপর ধপাস করে ফেলে দিয়ে বললে, 'সঙের মত বসে না থেকে দয়া

করে খেয়ে উঠে যাও না। সংসারের পাট তো আমাকে চুকোতে হবে, না সারাদিন বসে থাকলেই চলবে।'

শুভার পাতেও অনুরূপভাবে একটি মাছের খণ্ড পড়ল।

শচিন না বলে পারল না, 'ওর পাতে শুধু শুধু দিচ্ছ কেন, ও তো খাবে না।'

'খাবে না মানে, ওর বাবা খাবে।'

শচিন ভাবলে ওর বাবা তো খাচ্ছেই, আর কিভাবে খাবে। পেঁকো ভাতের ওপর কেলে ডাল ঢেলেছে, ডাল আবার গলেনি। বাটির তলায় আঙুল চালিয়ে গোটা গোটা কিছু মুগের দানা তুলে এনে পিণ্ডের ওপর যেভাবে তিল ছিটোয় সেইভাবেই ছড়িয়ে দিয়েছে, সতিল পিণ্ডোদকং সকাতলা মৎস্যং। এক টুকরো লেবু হলে মন্দ হত না। অলকাকে বলার সাহস নেই। শুভা থাকলে বলা যেত। সে তো এখন গোঁসাঘরে।

শোবার ঘরের রেডিওটা হঠাৎ বেজে উঠল। আহা নজরুলের সেই গানটা, 'জনম জনম গেল আশাপথ চাহি।' শুভা খাওয়া ছেড়ে উঠে গিয়ে মনের দুঃখে রেডিও খুলেছে। ডক্টর ঘোষ বলেছেন, খাবার সময় একটু গান, একটু কনসার্ট।

হঠাৎ কনসার্ট থেমে গেল। অন্য কনসার্ট কানে আসছে।

'শিগগির চল, শিগগির চল, এক থেকে তিন গুনব, তার মধ্যে সুড়সুড় করে উঠে আসবি। এক, দুই, তিন! উঠলি! কি হল উঠলি? ভাল কথায় উঠবি, না যাব? কি রে?'

'আমি খাব না, যাও।'

'বাপের পয়সা সস্তা দেখেছ, না? লাগে টাকা দেবে গৌরী সেন! ওঠ শুভা ওঠ, শুভা ওঠ বলছি। আমার মেজাজ কিন্তু আস্তে আস্তে চড়ছে। এবার বলতে গেলে আর মুখে নয় হাতে বলব।'

শচিন মুখটাকে বিকৃত করল। মেজাজ চড়ছে। আর কোথায়

চড়বে বাধা। তিনি তো সব সময় সপ্তমেই চড়ে আছেন। না, ডক্টর ঘোষ বলেছেন মনটাকে পারিপার্শ্বিক ব্যাপার থেকে তুলে রাখবেন। নিজেকে অনেকটা নিরোর মত করতে হবে। রোম পুড়ছে পুড়ুক, আপনি ছাদের আলসেতে বসে ব্যায়লা বাজাচ্ছেন। তা না হলেই পরিপাকে বিপাক এবং অম্বল।

শয়নকক্ষে মা মেয়ের খণ্ড যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। মায়েরই তো মেয়ে। ছ'জনেই এক রোখা বুলডগ। বুলডগ কামড়ালে তার চোয়াল আটকে যায়। মাংস না খাবলে সে কামড় খোলে না। এদেরও তাই! এর গোঁ ওকে, ওর গোঁ একে কামড়ে ধরে আছে। মেয়ে খাবে না মাও ঘাড় ধরে খাওয়াবেই। দরকার হলে ল্যাং মেরে চিত করে ফেলে বাঁশ গেদে খাওয়াবে। অনশনভঙ্গের দৈহিক ব্যবস্থা। ওরে আমার বুলু ডগুয়ারে। শচিনের শান্ত স্বভাবের ছিটে-ফোঁটাও যদি শুভার চরিত্রে লাগত! কি করে লাগবে। মেয়েদের শরীরে মায়ের রক্তই যে বেশি, তা না হলে মেয়ের বদলে ছেলে হত!

ঘাড় ধরে বেড়ালছানাকে যেভাবে তুলে আনে অলকা সেইভাবে শুভাকে ধরে এনে ধপাস করে আসনে বসিয়ে দিল।

'আর যেন একটা কথাও আমাকে না বলতে হয় শুভা। সেই সকাল থেকে রান্নাঘরে। এর মধ্যে ছ'বার চা হয়েছে। খিদেয় পেট জ্বলে যাচ্ছে আমার। তোমাদের আর কি, খাবেদাবে ঘরে গিয়ে ফ্ল্যাট হয়ে শুয়ে পড়বে। আমি একটা মানুষ, ধোপার গাধা নই!' দাঁতে দাঁত চেপে গাধা শব্দটা অলকা এমনভাবে উচ্চারণ করল! অ্যাঃ মহিলার সমস্ত স্নায়ু ড্যামেজ হয়ে গেছে। কামড়ে না দেয়! দাঁতাল, মাতাল আর পাগল! বিশ্বাস নেই! খুব সাবধান।

শুভা হাত গুটিয়ে মুখ গোঁজ করে বেঁকে বসে আছে। খুবই স্বাভাবিক। শচিনদের ছেলেবেলায় মাঝে-মধ্যে এইরকম ঘটনা অবশ্যই ঘটত। সেই সময়কার ভিকটোরিয়ান 'গোল্ডেন টাইমে'

মায়েরা এই রকম পুলিশী প্রথায় বিশ্বাসী ছিলেন না। বলতেন, চ বাবা, ওঠ মা; রাগ করিসনি। রাগী ছেলে কি মেয়ে বলত, না যাব না, না খাব না। মা, মাথায় পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে বলতেন, চল বাবা, চল না। যাবি না তো! ঠিক আছে কাল সকালে আমাকে আর দেখতে পাবি না। কোথায় যাবে তুমি? দেখতেই পাবি, যমে নিয়ে যাবে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে। ব্যাস, হাউ হাউ কান্না। না মা যেও না তুমি।

মায়ের ফর্সা সাদা কপালে লাল টকটকে সিঁদুরের টিপ ঘামে আঁচলের ঘষায় একটু ছড়িয়ে গেছে। হাতে মিছরি দানা চুড়ি। লাল পলা, সাদা শাঁখা পাশাপাশি। মাকে জড়িয়ে ধরে সে কি কান্না। মা অমনি বলতেন, দূর পাগল, তোদের ফেলে যাব কোথায়! কার কাছে ভরসা করে রেখে যাব! কত কাজ বাকি! অসম্ভব তেতো নিমঝোলও তখন চুমুক দিয়ে খেতে আপত্তি নেই।

আর এখন? অ্যাঁ, কি যুগ পড়ল রে বাবা? মিলিটারি ক্যাম্পে মহিলা মেজর জেনারেলের সঙ্গে সংসার। সবসময় কুচকাওয়াজ চলেছে! শচিন মনে মনে বললে, 'এবার থেকে তুমি ইউনিফর্ম পরে হাতে ব্যাটন নিয়ে খাবার তদারকি কোরো। সেইটাই মানাবে ভাল।'

শচিন বললে, 'শুভা খেয়ে নে মা! কেন অশান্তি করছিস! দুপুর থেকেই মেঘ জমে জমে সন্ধের কালবোশেখী!'

'তুমি খাচ্ছ খাও। আমি খাব না। ওকে আমি দেখে নোব!'

'কাকে দেখে নিবি?'

'তোমার বউকে?'

'হোয়াট! কি বললি?'

শচিনের 'হোয়াট' অলকার 'চুপ'-এর চেয়ে জোরে বেরল। রাগটাকে এতক্ষণ অনেক কষ্টে চেপে চেপে রেখেছিল। এইবার বোমা ফাটল।

অলকা পাশের ঘর থেকে ছুটে এল। হাতে একটা হাতা।

শচিন চিৎকার করে বললে 'গেট আউট। তোমাকে খেতে হবে না। বড্ড বাড় বেড়েছে শুভা। মেয়েছেলে বলে তোমাকে আমি ছেড়ে দোব না রাসকেল। কানটাকে টানতে টানতে ছাগলের কানের মত লম্বা করে ছেড়ে দোব স্কাউনড্রেল।'

মায়ের বকুনি শুভার তেমন গায়ে লাগে না। খেয়ে খেয়ে অভ্যস্ত। বাপের ধমকধামকে ঠোঁট ফুলে যায়। অনেকদিন পরে শচিন খেপেছে। শুভার চোখে অভিমানের জল। শচিন সে সব তেমন গ্রাহ্য করল না।

হাত উঁচিয়ে দরজার গোড়া থেকে অলকা বললে, 'শুধু শুধু মেয়েটাকে বকছ কেন। হঠাৎ আবার কি হল। এই তো দেখে গেলুম মেয়ের সোহাগে উলটে পড়েছ।'

'তোমার ট্রেনিং-এ এই বয়সেই ইনি গোল্লায় গেছেন। যেমন মা তার তেমনি মেয়ে!'

'যা বলবে মুখ সামলে বলবে। মেয়েকে হচ্ছে হোক, মাকে ধরে টানাটানি করবে না।'

'ওই তো, ওই তো তোমার বচনের ছিরি! সাইকোলজিস্টরা কি বলেন জান, ছোটরা সব সময় বড়দের চালচলন নকল করে, বিশেষত মায়েদের। শুধু জন্ম দিলেই মা হওয়া যায় না। মায়ের মত মা হতে হয়। ত্যাগ, তিতিক্ষা, লজ্জা, মাত্রাবোধ, তাল, লয় সব শিখতে হয়।'

জন্ম দিলেই বাপ হওয়া যায় না। রাখ তোমার সাইকোলজিস্ট। অতি আদর, আশকারা, রিরংসা এসব সংযত করে বাপের মত বাপ হতে হয়।'

'রিরংসা জিনিসটা কি?'

'ডিকসেনারি দেখে নিও। শুভা থালাটা নিয়ে তুই এ ঘরে উঠে আয়। আর কাঁদতে হবে না। আয় আমার পাশে বসে খাবি আয়। আর একটু মাছ-ঝাল দোব। আয় উঠে আয়।'

'ওকে উঠতে হবে কেন ? আমিই উঠে যাচ্ছি। আনওয়ান্টেড এলিমেণ্ট আমি।'

শচিন তেড়েফুঁড়ে উঠে পড়ল। চালতার অম্বলটা একটু চেখে দেখার লোভ ছিল। না খেয়েছে ভালই হয়েছে। অ্যাসিডে অ্যাসিড বাড়ে।

দুই

সোমবারটা এমনিই ভারী বিশ্রী। ব্ল্যাক মানডে। সকালে গা ম্যাজম্যাজ করে। বেরোতেও গড়িমসি হয়ে যায়। ট্রাম. বাস কেমন ঢিমে-তালে চলে। সংখ্যাতেও কম মনে হয়। ক্যাটকেটে রোদ, ভিড় ঠেলাঠেলি। তার ওপর কাল থেকেই অলকার সঙ্গে ব্যাক্যালাপ বন্ধ। কথাবার্তা সব তৃতীয় পুরুষে, দেওয়াল কিংবা আলমারিকে উদ্দেশ করে হচ্ছে—'খেতে দিলে হয়, আণ্ডারওয়্যারটা আবার কোন চুলোয় ফেলেছে, মানিব্যাগটার পাখা গজালো না কি!' চুড়ির রিনিঝিনি মেশানো অলকার সরোষ উত্তর, 'বল, যে-চুলোয় থাকে সেই চুলোতেই আছে, একটু চোখ মেলে দেখতে।'

'রুমালটা আবার দয়া করে কে হাওয়া করে দিলে ?'

'কেউ হাওয়া করেনি নিজের প্যাণ্টের পকেটটা ভাল করে দেখলেই পাওয়া যায়।'

'যাব্বাবা একপাটি জুতো আবার কোথায় গেল ?'

'কোথাও যায়নি, র‍্যাকের পাশে পড়ে গেছে। যেমন রাখার ছিরি।'

'ও পড়ে গেলে তুলে রাখতে নেই ? হাতে পক্ষাঘাত ?'

'হ্যাঁ পক্ষাঘাত। যেমন দেখাবে তেমনি দেখতে হবে। আর্সির মুখ দেখা।'

শচিন ঝুলতে ঝুলতে অফিসের টেবিলে এসে বসছে। ঘেমে নেয়ে. আধকপালে হয়ে, আধমরা অবস্থা।

ঢকঢক করে এক গেলাস জল খেল। কাজ দেখলেই রাগ ধরছে। পেটটাও ভুট-ভাট করছে। ঢেঁড়সের ঢেঁকুর উঠছে। অন্যদিন ড্রয়ারে একটা দুটো অ্যাণ্টাসিড থাকে, আজ তাও নেই। ভোগাবে। ঢেউ ঢেউ করে আর গোটাকতক ঢেঁকুর তুলল। মাথাটা বেশ জম্পেশ ধরেছে। ধরবেই। মাথার আর দোষ কি! কথায় বলে মুড়ি আর ভুঁড়ি। অম্বল হলেই মাথা ধরবে। শচিন নাকের উপর কপালের কাছটা দু আঙুলে টিপে চুপ করে বসে রইল রাসকেল পেট, রাসকেল ডাক্তার। কোন অসুখই সারাবার ক্ষমতা নেই, কেবল ফি গুনে দিয়ে যাও।

সুনীলবাবু পান চিবোতে চিবোতে বললেন, 'হল কি? এত করে বললুম খাবার পর একটা করে পান খাবেন, চুনে ক্যালসিয়াম, ভাল অ্যাণ্টাসিড, পানের রসে ক্লোরোফিল···।

'ধ্যার মশাই ক্লোরোফিল, ক্যালসিয়াম, ভেতরটা চুনকাম করে দিলেও কিছু হবে না। সংসারটাই অম্বলে অম্বলে অ্যাসিড হয়ে গেছে।'

'চলুন আজ ডক্টর ঘোষের কাছে। আমিও যাব, একটা কেস আছে। আপনার চেয়েও জটিল। সেও ওই স্ত্রীর সঙ্গে অবনিবনা।'

'হ্যাঁ যাব। আজই শেষ। হয় এসপার না হয় ওসপার।'

'আরে মশাই, অত সহজে হাল ছাড়েন কেন? কথায় বলে যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ। নিন একটা পান খান। আজ আর চা খাবেন না। স্রেফ জল চাপিয়ে যান। হাইড্রোপ্যাথি ইজ দি বেস্ট প্যাথি। এই সুরেন, শচিনবাবুর গেলাসটা ভরে দাও।'

টিফিনে সুনীলবাবু শচিনকে দেখিয়ে দেখিয়ে খাস্তা কচুরি খেলেন। হজম করায় মন! মনই লিভারকে নাচায়।

সুনীলবাবু বললেন, 'দেখেছেন কাণ্ড, জল পর্যন্ত যার পেটে তলাতন্ন, সে আজ প্লেন কচুরি নয়, একেবারে খাস্তা কচুরি খাচ্ছে।'

শচিন ফাইল দেখতে দেখতে বললে, 'আমার বউটাকে বোবা

আর কালা করে দিতে পারলে আমিও হেসে হেসে খাস্তা কেন কবিরাজী কাটলেট খেতুম।'

তিন

ডক্টর ঘোষের চেম্বার ফাঁকাই ছিল। থাকেও তাই। কার দায় পড়েছে পয়সা খরচ করে ছত্রিশ গণ্ডা প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যে সাধ করে আসতে। একটাই সুবিধে, বেশ আরাম করে বসার জন্যে পুরু পুরু গদি আঁটা ভালো ভালো চেয়ার আছে যা অন্য ডাক্তারখানায় থাকে না।

ডক্টর ঘোষ সব শুনলেন। শুনেটুনে বললেন, 'পর্বত মহম্মদের কাছে না এলে মহম্মদকেই পর্বতের কাছে যেতে হবে। দাম্পত্য জীবনের কয়েকটা বেসিক ডিসিপ্লিন আছে। সেই ডিসিপ্লিন মেনে চলার ওপর শান্তি নির্ভর করছে। এই তো হার্লফিল একটা কেস ভাল করে দিলুম।'

শচিন বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। কেসটা শোনার কোন উৎসাহই নেই তার। পয়সা খরচ করে যত বাজে গালগল্প শুনতে আসা। সুনীলবাবুর খুব উৎসাহ, প্রশ্ন করলেন, 'কি কেস?'

'জানালা খোলা। মাথার দিকের জানালা খোলা নিয়ে চোদ্দ বছরের ঝামেলা, বদহজম, নার্ভাস, ব্রেকডাউন। স্ত্রী জানালা খুলে শোবেন, স্বামী বন্ধ করবেন। ইনি খোলেন তো উনি বন্ধ করেন। সারা রাত ওই চলে। খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে ছিটকিনি ধরে দুজনের সারারাত হাত কাড়াকাড়ি। ঘুমের বারোটা। প্রতিবেশীরা অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকেন। প্রথম প্রথম মজা, বিরক্তি, প্রতিবাদ। ভদ্রলোক কোথায় পড়েছেন মাথায় সরাসরি হাওয়া লাগলে সাইনাস হয়। সিটিং-এর পর সিটিং কিছুই করতে পারি না। দুপক্ষই সমান। গোঁ জেতে কি সাইকোলজি জেতে। শেষে...।'

'শেষে কি হল?' সুনীলবাবু যেন রহস্য-গল্প শুনছেন।

'শেষে সাইকলজির বাইরে যেতে হল।'

'কি রকম?'

'শঠে শাঠ্যং সমাচরেৎ। ভদ্রলোককে বললুম, একদিন আপনি সারারাত জানালাটা খোলা রাখতে দিন। প্রয়োজন হলে নিজে মাঙ্কিক্যাপ পরে অলীক সাইনাস থেকে বাঁচুন। একটা দিন। ভদ্রলোক রাজি হলেন। ব্যাস হয়ে গেল?'

'কি হয়ে গেল?'

'চোদ্দ বছরের ঝামেলা মিটে গেল। এখন স্ত্রী সবার আগে জানালা বন্ধ করে দেন।'

'কেন?'

'সেদিন রাত দুটো নাগাদ অ্যাপ্রন পরে নিজেই গেলুম। রাস্তার ধারে একতলার ঘর। রকে উঠলুম। জানালা দিয়ে আমার লম্বা হাতটা বাড়িয়ে ভদ্রমহিলার চুল ধরে এক হ্যাঁচকা টান মেরেই দে দৌড়।'

সুনীলবাবু হি হি করে হাসলেন। শচিনের হাসি পেল না। শচিনের তো জানলা-কেস নয়। আরও ঘোরালো, জোরালো ব্যাপার।

সুনীলবাবুই শচিনের মুখপাত্র। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'এঁর ব্যাপারটা তাহলে কি হবে? এইভাবেই চলবে?'

'এঁর ব্যাপারটার একমাত্র সমাধান প্রেম! প্রেম করতে হবে। প্রেম দিতে হবে।'

'এই বয়েসে প্রেম? মেয়ে পাবে কোথায়? এখন মার্কেটে যে সব ছেলে ঘুরছে তাদের হাত থেকে মেয়ে বার করা শক্ত হবে না?'

'প্রেম মানেই কি পরকীয়া! নিজের স্ত্রীর সঙ্গেই প্রেম।'

শচিন এইবার লাফিয়ে উঠল, 'ওই বউয়ের সঙ্গে প্রেম? কারুর বাপের ক্ষমতায় কুলোবে না। সবসময় বাঘিনীর মত গর্জন করছে।'

'বাঘিনীকেও পোষ মানাবার কায়দা আছে। সার্কাসের রিং-মস্টার দেখেছেন তো! বউকে একটু তোয়াজ করবেন। রোজ গীত-

গোবিন্দ পড়বেন। মোলায়েম করে বলবেন, দেহি পদপল্লবমুদারম। আদর করে কখনও পিঠে, কখনও মাথায় হাত বুলিয়ে দেবেন, সুড়সুড়ি দিয়ে দেবেন। গালে দু চারটে ঠোনা মারবেন। ট্যাবলেট নয়, নিয়ম করে রোজ একটা দুটো চুমু খাবেন।'

'চুমু?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ চুমু, চুম্বন। ওর চেয়ে ভাল অ্যান্টাসিড আর কিছু নেই। না জানা থাকলে গোটাকতক ইংরেজি সিনেমা দেখে শিখে নেবেন। আমাদের দেশের দোষই হল, মেয়েদের শরীরের নিচের দিকেই আমাদের নজর। কিন্তু উর্ধ্বাংশটাই হল আসল। শুরু হবে ওপর থেকে। ডিভাইন লাভ, ডিভাইন লাইট ওপর থেকে ধীরে ধীরে নিচে নেমে আসে। প্রেম কি মশাই ধর তক্তা মার পেরেক! সব কিছুর একটা মেথড আছে, অ্যাপ্রোচ আছে। স্ত্রীর সঙ্গে প্রেমই হল বেস্ট প্রেম, সিকিওর্ড প্রেম, খোঁটায় বেঁধে প্রেম। প্রেমের অবজেকট সহজে পালাতে পারবে না। ইঁদুর-কলে পড়ে গেছে। প্রথম প্রথম অসুবিধে হলে পরস্ত্রী ভেবে নেবেন। নিজেকে মনে করবেন কৃষ্ণ, চলেছেন রাধার কাছে অভিসারে।'

'ইমপসিবল।'

'ওই তো দোষ। অহংটাকে খাটো করা যায় না? আত্মসমর্পণ, সারেণ্ডার। বিল্বমঙ্গল যদি পেরে থাকে, হোয়াই নট ইউ! সিকির সিকি প্রেমই হল আমার প্রেসক্রিপসান। মাঝেমাঝে এদিক ওদিক তাকিয়ে বউয়ের মুখে একটু মিষ্টি গুঁজে দেবেন। ভালো শাড়ি পরিয়ে পার্কে পাশাপাশি বসে কোলের ওপর হাত নিয়ে খেলা করবেন। আঙুলের আংটি ঘোরাবেন। চীনেবাদাম ঝালমুড়ি কিনে দেবেন। ফুচকা খাওয়াবেন। আড়ালে ঝোপঝাপ দেখে পাশাপাশি বসে মাথাটা কাঁধে হেলিয়ে দেবেন। ইডেনে গেলেই এ দৃশ্য দেখতে পাবেন। প্রথম প্রথম কপি করবেন। কপি করতে করতেই অরিজিন্যালিটি এসে যাবে। দিন কতক এইভাবে তোয়াজ করে

দেখুন শান্তি ফিরে আসবে। মুখের ওই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বুড়োটে ভাব কেটে যাবে। যান, বি চিয়ারফুল! মনে রাখুন অম্বল আর বদহজমের দাওয়াই অ্যান্টাসিড নয়, প্রেম।'

দুজনে চেম্বার ছেড়ে রাস্তায় নেমে এলেন।

সুনীলবাবু বললেন, 'তাহলে একটা গীতগোবিন্দ আর বিল্বমঙ্গল কিনে ফেলুন। নতুন জীবন আজই শুরু করুন। একটা কামসূত্রও সঙ্গে কিনে ফেলতে পারেন। ডাক্তারে, ওষুধে তো বহুপয়সা দিলেন আরও কিছু না হয় এদিকে যাবে। দেখতে দোষ কি? আচ্ছা আমি চলি কাল দেখা হবে। গুডবাই।'

শচিন গুটি গুটি হাঁটা ধরল। আবার বাড়ি। আবার সেই দেওয়ালকে উদ্দেশ করে ঠারেঠোরে ছিটে গুলির মত কথা ছুঁড়ে মারা। মেয়ের সঙ্গেও কথা বন্ধ। এভাবে আর কতদিন চলবে প্রভু! শচিন সেই অদৃশ্য প্রভুর কাছে পরামর্শ চাইল। কোথায় প্রভু! ঊর্ধ্বশ্বাসে মানুষ ছুটছে। ভ্যাঁক ভ্যাঁক করে গাড়ি দৌড়োচ্ছে। দুঃখী শচিনের দিকে কারুর নজর নেই। অসার সংসার, নাহি পারাপার। আচ্ছা দেখাই যাক না ডক্টর ঘোষের নতুন দাওয়াই কাজে লাগিয়ে। অহং-এর ভাগটাকে একটু নিচু করে স্ত্রীর উদাসীনতার অগাধ জলে স্পর্শ করিয়ে স্নেহের কণা কিছু তুলে আনা যায় কি না। আমার বউ। আহা, আমার প্রেমের বউ! আহা, আমার ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো। বউকে স্নেহ করার জন্যে শচিন নিজেকেই তোয়াজ করতে লাগল। স্নেহকে, প্রেমকে এখন দৃশ্যমান করতে হবে। তেমন রেস্ত থাকলে একটা হীরের আঙটি কেনা যেত। তেমন রেস্ত থাকলে একটা শাড়ি। পকেট তো গড়ের মাঠ। মধ্যমাসে কেরানীর পকেটের আর কত জোর থাকবে। অলকা একসময় কড়াইয়ের চপ খেতে খুব ভালোবাসত। বিয়ের পর প্রথম প্রথম নতুন বউকে সে কত খাওয়াত। কচি কলাপাতা রঙের শাড়ি পরে হুহা করে ঝালঝাল চপ খাবার সেই দৃশ্য হঠাৎ চোখের সামনে

ভেসে উঠল। নাকের ডগায় শিশিরের দানার মত ঘাম। আয় পুরনো দিন ফিরে আয়।

চার

লড়াইয়ের চপ নিয়ে শচিন বাড়ি ঢুকছে। ঢুকতে ঢুকতেই শোবার ঘর দেখতে পাচ্ছে। জানালা খোলা। ফন ফন করে পাখা ঘুরছে। পায়ের ওপর পা জড়িয়ে অলকা শুয়ে শুয়ে বই পড়ছে। ওরে আমার মহারানী রে? বাস ঠেঙিয়ে ধস্তাধস্তি করে সারা দিনের পর একটা লোক বাড়ি ফিরছে, কোথায় জানালার সামনে বিরহিনীর মত দাঁড়িয়ে থাকবে, হাসিমুখে এগিয়ে আসবে, বলবে, আহা তুমি এলে. বাছারে! তা না, উনি শুয়ে শুয়ে মৌজ করে উপন্যাস পড়ছেন। ফায়ার। না না, আজ আর ফায়ার নয় দাঁতে দাঁত চেপে সিজফায়ার।

শচিন একটু কাশল। অলকা বই থেকে চোখ না সরিয়ে শুয়ে শুয়েই বললে, 'শুভা দরজাটা খুলে দে।' ও! শুভা দরজা খুলবে, আপনার হাতে কি পক্ষাঘাত। এ যেন শচিন আসেনি, এসেছে কাজের লোক। না, নো রাগারাগি। শচিন ঢুকে পড়ল, 'একবার দয়া করে উঠে এসে এটা ধর না।'

দয়া করে শব্দটা না বললেই হত। সোজাসুজি বলা যেত, ওগো একবার উঠে এস তো। যাক মুখ ফসকে যা বেরিয়ে গেছে তা বেরিয়েই গেছে।

'শুভা, কি ধরতে বলছে ধরত!'

ও, তবু নিজের ওঠা হয় না।

'কি এমন ব্যস্ত, নিজে উঠতে পারছে না!' অতিকষ্টে শচিন পরের শব্দ কটা ধরে রাখল—গতরে কি শুঁয়াপোকা ধরেছে!

ধপাস করে বইটা পাশে ফেলে বেজার বেজার মুখে অলকা উঠে এল, 'কি হল কি?'

শচিন হাসির রেখা টেনে পরম উৎসাহে বললে, 'গরম গরম, একেবারে গরম গরম লড়াইয়ের চপ।'

'কি হবে?'

'কি হবে মানে?'

'তুমি খাবে? তোমার তো অম্বলের ব্যামো!'

'আমি কেন? তুমি খাবে!'

'আদিখ্যেতা!'

'তার মানে?'

'রোজই তো শুধু হাতে ঢোক, হঠাৎ আজ পিরিত উথলে উঠে কেন?'

'ও পিরিত? কোনদিন কিছু আনি না, না?'

'মনে তো পড়ে না। তোমার চপ তুমি খাও।'

এইসময় শচিনের উচিত ছিল বউকে একটু সোহাগ করা, তার বদলে সে ঠোঙাটা মেঝেতে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে লাফিয়ে উঠল, রাবিশ! নৃশংস রাবিশ!'

'হ্যাঁ রাবিশ।'

'অফ কোর্স রাবিশ, হৃদয়হীন রাবিশ।'

'জানই তো। জেনে শুনে ঘাঁটাতে আস কেন? কেঁচো খুঁড়তে গেলেই সাপ বেরোবে।'

'বেরোক। তাই বেরোক।' শচিন চপের ঠোঙায় মারল লাথি। ঠোঙা ছিঁড়ে সব চপ ছত্রাকার।

'পয়সা তোমার অনেক, মারো, মারো লাথি, কার কি?'

'সংসারের মুখে লাথি।'

'নতুন কি, সে তো দুবেলাই চলছে।'

'দু বেলাই চলছে?'

'হ্যাঁ চলছে। বেরোতে লাথি আসতে লাথি।'

'যেমন দেখাবে তেমনি দেখবে।'

'কি তোমাকে দেখানো হয়েছে।'

'আদর করে চপ নিয়ে এলুম, দিলে ফেলে।'

'আমি ফেলে দিলুম, না তুমি ফেলে দিলে?'

'ওই হল।'

'বিষাক্ত তেলেভাজা আজকাল কেউ খায় না। পারতে শ্যামাদির স্বামীর মত ইলিশ নিয়ে, সিনেমার টিকিট, কি থিয়েটারের টিকিট, কি কাশ্মীরে বেড়াতে যাবার টিকিট নিয়ে বাড়ি ঢুকতে। বুঝতুম মুরোদ! আজ চোদ্দ বছরে একবার চিড়িয়াখানা দেখাতে পারলে না। মেয়েটাকে প্রত্যেক বছর আশা দিয়ে দিয়ে রাখা। এ বছর হল না মা, আসছে বছর। সেই আসছে, সেই আসছে বছর চোদ্দ বছরেও এল না। এই তো মুরোদ।'

লড়াইয়ের চপের লড়াই গড়াতে গড়াতে অনেক দূরে গড়িয়ে গেল। শচিন পা থেকে জুতো দুপাটি খুলে র‍্যাকের দিকে ছুঁড়ে দিল। দাঁত মুখ খিঁচিয়ে হিড়হিড় করে টেনে-টুনে পা থেকে নাইলনের মোজা খুলল। গা থেকে জামাটা খুলে চেয়ারে ছুঁড়ে মারল। বুক পকেট থেকে এক গাদা টুকরো-টাকরা কাগজ খানকতক ময়লা ময়লা নোট ছড়িয়ে পড়ল মেঝেতে। থাক পড়ে। শ্যামাদির স্বামীর মত মুরোদ দেখাতে পারলে, অলকা সব তুলে গুছিয়ে-গাছিয়ে রাখত।

অনেক রাতে বিছানায় চিত হয়ে শুয়ে শুয়ে শচিন নিজেকে শ্যামাদির স্বামীর সঙ্গে মেলাতে বসল। প্রতিবেশী। দু'বেলাই শচিনের সঙ্গে দেখা হয়। লুঙ্গিটাকে উঁচু করে পরে সকালে ঘোঁত ঘোঁত করে বাজারে ছোটেন। শচিন মাঝেসাঝে বাজারে যায়। রোজ সকালে বাজার যাওয়া তার পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার। ন'টা নাগাদ আদ্দির পাঞ্জাবি পরে ঘাড়ে একগাদা পাউডার মেখে মুর্গীহাটায় ব্যবসা করতে যাওয়া। হবে না, শচিনের দ্বারা হবে না। ও সাজে সাজা যাবে না মা! মোড়ের মাথায় পানবিড়ির দোকানে দাঁড়িয়ে

শ্যামাদির স্বামী বেরোবার সময় এতখানি একটা হাঁ করে দু'খিলি পান এক-সঙ্গে মুখে পোরেন। তারপর রিকশায় ওঠার আগে কোনও দিকে না তাকিয়ে পচাৎ করে এক থাবড়া পিক ফেলেন। হবে না, শচিনের দ্বারা ও কাজ হবে না। ছুটির দিন মেয়ের ঘাড়ে সংসার ফেলে দিয়ে বউ বগলে শ্যামাদির স্বামীর যে কোনও সিনেমা বা থিয়েটারে যাওয়া চাই। যে কোনও সিনেমা বা থিয়েটার শচিনের পক্ষে সহ্য করা শক্ত। হিন্দী ছবির ননসেন্স বাঙলা থিয়েটারের ক্যাবারে কোনও সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষের সহ্য শক্তির ওপর অত্যাচার। শালীদের বাড়িতে এনে ছত্রিশবার বাজারে ছোটা, হই হই করে হাসি মস্করা, টাকার শ্রাদ্ধ, শচিনের সে ক্ষমতাও নেই, রুচিও নেই। বোকা বোকা কথা বলে হ্যা হ্যা করে হেসে মেয়েদের মনোরঞ্জন করার ক্ষমতা শচিনের নেই। শান্ত মানুষ, শান্তিতে থাকতে চায়। বউ পেয়েছে তাইতেই খুশি, শালাশালী নিয়ে ঢলাঢলির ইচ্ছেও নেই, প্রয়োজনও নেই। এক মেয়েছেলেতেই কাহিল-কাহিল অবস্থা, আর মেয়েছেলেতে কাজ নেই। শ্যামাদির স্বামী ভালো শাড়ি দেখলেই বউয়ের জন্যে কিনে আনেন, কথায় কথায় গহনা গড়িয়ে দেন, দিতেই পারেন। ব্যবসার পয়সা। টাটা আরও দেন, বিড়লা গোয়েঙ্কা দিতে পারেন। শচিনকে দিতে হলে চুরি করতে হবে।

অলকার দিকে পেছন ফিরে শচিন চিত থেকে কাত হল। গায়ে হাত দিলেই খ্যাঁক করে উঠবে। শ্যামাদির স্বামী না হতে পারলে অলকার সোহাগ শচিনের বরাতে জুটবে না। যা হয়ে গেছে বিয়ের প্রথম চার বছরেই খতম। বাকি দশটা বছর ভিয়েতনামের যুদ্ধ। চলছে তো চলছেই। কবে যে শেষ হবে! সেই সাহেব শিকারীর কথা মনে পড়ছে। দূর থেকে বাঘের গায়ে পিন ছুঁড়ে মারেন। বাঘ ঘুমিয়ে পড়ে। তারপর বাঘের মত হিংস্র জন্তুকে বেড়ালের মত ল্যাজ ধরে টানতে টানতে নিয়ে আসেন। ওই রকম একটা অস্ত্র যদি শচিনের থাকত! রোজ বাড়ি ঢোকার আগে জানালার বাইরে

থেকে অলকাকে টিপ করে মারত। ব্যাস বাঘিনী ঘুমে ম্যাতা। সংসার শান্ত। ডক্টর ঘোষ! ডক্টর ঘোষ কি করবেন! প্রেম! প্রেম নয়, শচিনকে হতে হবে শ্যামাদির স্বামীর মত।

অনেক ভেবে শচিনের মনে হল, একটা কাজ সে করতে পারে—চিড়িয়াখানা। অগতির গতি চিড়িয়াখানা। শীত আসতে অনেক দেরি, তবু চিড়িয়াখানা। চলো চিড়িয়াখানা। বাঘিনীকে বাঘ দেখাও, সিংহ দেখাও, আইসক্রিম খাওয়াও, ট্যাকসি চাপাও। সেই রেশে যদি কিছুদিন শান্তি পাওয়া যায়। আর দেরি নয় তাহলে। কালই। শুভস্য শীঘ্রং। কাল অফিস না গিয়ে চিড়িয়াখানা। অনেক ছুটি পাওনা। ছুটি তো সে নেয়ই না। ছুটি নিয়ে বাড়িতে থাকলেই তো অশান্তি।

একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছে শচিন শেষ রাতের দিকে ঘুমিয়ে পড়ল।

পাঁচ

ঝনঝন করে বাসন পড়ার শব্দে শচিনের ঘুম ভেঙে গেল। বেশ বেলা হয়েছে। অলকা মেয়েকে বলছে, 'থাক, ডাকতে হবে না, আক্কেলটা দেখাই যাক না। কখন ওঠে, কখন বাজার হয়, কখন খাওয়া হয়, কখন অপিস যাওয়া হয়। আমার কি? আমি ভাত নামিয়ে বসে থাকি।'

শুভা বলছে, 'না মা, বাবাকে ডেকে দি। তা না হলে এমন তাড়াহুড়ো করবে সকলেরই মেজাজ খারাপ হয়ে যাবে।'

'কোন দরকার নেই। আমি বাথরুমে ঢুকছি, তুই একটু পরে ভাতের হাঁড়িতে কেবল এক ঘটি জল ঢেলে দিস্।' শচিন বিছানা থেকে লাফিয়ে নামল। মরেছে, অলকা বাথরুমে ঢুকলে পাক্কা এক ঘণ্টা। তার আগেই মুখটা ধুতে হবে। শচিন ঘর থেকেই চিৎকার করে বলল, 'শুভা আমি উঠেছি।'

'উঠেছ বাবা !'

'হ্যাঁ মা উঠেছি।' শচিন বাইরে এল। আহা কি সুন্দর প্রভাত! চট করে মুখটা ধুয়ে আসি! 'অলকা, অলকা তুমি চা চাপাও।'

উঃ কতদিন পরে বউকে নাম ধরে ডাকা হল। দাঁতে বুরুশ ঘষতে ঘষতে শচিন ভাবল, অলকা নামটা ভারী সুন্দর। অলকানন্দা। চেহারাতেও একসময় বিউটি ছিল। মনটা যদি একটু বিউটিফুল হত! কাদের বাড়ির রেডিও থেকে অতুলপ্রসাদের গান ভেসে আসছে, প্রভাতে যারে নন্দে পাখি।

হাত মুছতে মুছতে শচিন বেরিয়ে এল, 'কই চা হয়েছে অলকা?' কোনও দিকে না তাকিয়ে শচিন বসার ঘরের দিকে এগোল। কেমন যেন লজ্জা লজ্জা করছে। অলকা, অলকা, একটু যেন তোয়াজের গলা। চায়ে চিনি গুলতে গুলতে মা মেয়েকে ফিস ফিস করে বললে, 'কি ব্যাপার!' মেয়ে ঠোঁট উলটে বোঝাতে চাইল, তোমাদের ব্যাপার তোমরাই জান, আমি তো সবে এসেছি। জ্ঞান হয়েছে মাত্র কয়েক বছর।

শুভা চা নিয়ে এল। শচিন কাগজ দেখছিল।

'তোর মাকে ডাক তো।'

অলকা নববধূর মত পায়ে পায়ে বসার ঘরে এল। শাড়ির সামনেটা ভিজে। হাত মুছেছে। রাতের বাসি চুল, শরীর উস্কখুস্ক। অনেকদিন পরে শচিন অলকাকে ভাল করে দেখছে। আগের অমন সুন্দর মুখটা সংসারের আঁচে যেন পোড়াপোড়া হয়ে গেছে।

'শোন আজ আর বেরোব না।'

অলকা উদাস গলায় বললে, 'বেরিও না।'

'কেন বেরোব না বল তো?'

'কি জানি?'

'আজ আমরা চিড়িয়াখানায় যাব। ডিম নিয়ে আসছি। ভাতে ভাত, ডিম সেদ্ধ, মাখন।'

'হঠাৎ চিড়িয়াখানায়?'

'অনেক ছুটি পাওনা, মাঝে মাঝে একটু আউটিং ভাল।'

'তোমার ডাক্তারবাবুর প্রেসক্রিপসান বুঝি!'

'আরে না না। জীবনটা বড় একঘেঁয়ে হয়ে গেছে। সংসার, অফিস, অফিস, সংসার।'

'তোমার মেয়েকে নিয়ে যাও।'

'আর তুমি!'

'আমার রোজ যা তাই। হাঁড়ি ঠেলা কাজ, সেই হাঁড়িই ঠেলে যাই সারাজীবন।'

'এদিকে সরে এস।'

'বল না!'

শচিন চেয়ার ছেড়ে উঠে এল। অলকার চেয়ে বেশ কিছুটা লম্বা। এদিক ওদিক তাকাল। ধারে কাছে শুভা নেই।

শচিন অলকার গলাটা জড়িয়ে ধরে চুক করে গালে একটা চুমু খেল।

অলকা চমকে উঠেছে। 'সাত সকালে এ কি অসভ্যতা।'

শচিনের নিজেকে মনে হল ইংরেজি ছবির হিরো। ডক্টর ঘোষ বলেছেন অ্যান্টাসিড নয়, চুমু। বেশ লাগল। অনেকদিন পরে, যদিও ভয়ে ভয়ে আলগোছে।

'যাও রেডি হয়ে নাও। তোমার চুল বড় তেলচিটে হয়েছে। একটু স্যাম্পু করো।' অলকা চলে গেল।

শচিন শুনতে পাচ্ছে মা মেয়েকে বলছে, 'কি রে ভাতের তলা ধরে যায়নি তো মা।'

ওষুধ ধরেছে। মা বেরিয়েছে মুখ দিয়ে। জয় গুরু। জয় গুরু। ডক্টর ঘোষ কি বলবেন? তার নিজের লেখাপড়াও কম না কি।

নিজেই একটা মেণ্টাল হসপিটাল খুলতে পারে। এই তো সেদিন এরিক ফ্রমের 'দি আর্ট অফ লাভিং'-এ পড়ছিল, লাভ ইজ অ্যান অ্যাকটিভ পাওয়ার ইন ম্যান, এ পাওয়ার হুইচ ব্রেকস থ্রু দি ওয়ালস…।

ছয়

সেই বলে না, সোনার মোহর মাটি চাপা থাকলে পেতলের মত ম্যাড়মেড়ে হয়ে যায়। একটু ঘষলেই আবার চকচকে। অলকার রূপটা আজ ক্যায়সা খোলতাই হয়েছে। কোথায় গেলেন শ্যামাদির স্বামী। আসুন একবার দেখে যান!

শুভা মায়ের হাত ধরে, শচিনের কাঁধে জলের বোতল। বাসের জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবে। না পেলে ট্যাকসি। আজ আর কৃপণতা নয়। অলকা বললে 'কিছু লজেনস কিনে নিলে হত।'

'ঠিক বলেছ।'

রাস্তার ওপরেই স্টেসেনারি দোকান। শচিন বোধহয় একটু অন্যমনস্ক ছিল। লক্ষই করেনি বেগে একটা গাড়ি আসছে। রাস্তা পার হবার জন্যে একেবারে গাড়ির মুখোমুখি। অলকা একটান মেরে শচিনকে সরিয়ে আনল। গাড়িটা থামেনি। একটা গালাগাল ছুঁড়ে দিয়ে বিদ্যুৎ বেগে চলে গেল। অলকার হ্যাঁচকা টানে শচিন প্রায় তার বুকের ওপর এসে পড়েছে। কাঁধ থেকে জলের বোতল ছিটকে রাস্তায়। শুভা মা বলে চিৎকার করে উঠেছে। একটুর জন্যে শচিন বেঁচে গেল। অলকা হাঁফাচ্ছে। দুজনেই দুজনের দিকে তাকিয়ে আছে স্থির দৃষ্টিতে। অলকা কাঁদোকাঁদো গলায় বললে, 'রাস্তা পার হবার সময় দেখবে তো। এখুনি একটা কাণ্ড হয়ে যেত।' অলকা কেঁপে উঠল। শুভা এসে শচিনের হাত ধরেছে, যেন হাত ধরে থাকলেই বাবা চিরকাল থাকবে।

অলকা বললে 'চল ফিরে যাই। বাধা পড়ে গেছে। তোমার শরীর কাঁপছে।'

'ধুর ফিরব কেন? ফাঁড়া কেটে গেল।'

'তাহলে চিড়িয়াখানায় গিয়ে কাজ নেই। চল কালীঘাটে যাই। অনেকদিন ধরে মা টানছেন।'

কালীঘাট। শচিন একটু ঘাবড়ে গেল। ভিড় ঠেলাঠেলি, পাণ্ডা। মায়ের কথা উঠলে, না বলা যায় না। হিন্দুর ছেলে।

'বেশ তাই চল। বাসের চেষ্টা করে লাভ নেই। ট্যাকসি ধরি।'

'অনেক নিয়ে নেবে।'

'তা নিক, রোজগার তো খরচের জন্যেই।'

ছুদিকের ছ'জানালার ধারে মা আর মেয়ে মাঝখানে শচিন। বেশ লাগছে। সত্যিই বেশ লাগছে। হু হু করে গাড়ি ছুটছে। শুভার নানা প্রশ্ন। এটা কি, ওটা কি? অলকা বললে, 'একদিন আমাকে নিউ মার্কেটটা দেখাবে?'

'আজই দেখিয়ে দোব ফেরার পথে।'

'একটা জিনিস কিনে দেবে?'

'কি?'

অলকা শচিনের কানে ফিসফিস করে সাধের জিনিসের নাম বললে, অন্য পাশ থেকে শুভা বললে, 'কি বাবা?' অলকা শচিনের উরুতে চিমটি কেটে সাবধান করে দিলে।

শচিন বললে 'তোর জন্য কাঁচের চুড়ি।'

শুভা খুব খুশি, 'তাহলে মাকেও কিছু কিনে দিও তোমার জন্যেও কিছু কিনো।'

শচিন তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল অখুশি মুখগুলো কেমন খুশি খুশি হয়ে উঠেছে।

সাত

তেমন ভিড় নেই মন্দিরে। বেশ ফাঁকা ফাঁকা। পুজোর নৈবেদ্য নিয়ে তিনজনে পাশাপাশি দাঁড়িয়েছে মায়ের দিকে মুখ করে। পূজা নিচ্ছেন, প্রসাদ দিচ্ছেন। তাঁর কি মনে হল, অলকার কপালে গোল একটা সিঁদুরের টিপ পরিয়ে দিলেন। মুখে ঘামতেল কপালে লাল টিপ। শচিনের মনে হল কুসুমডিঙ্গার দিন হোমের আগুনে অলকার মুখটা এইরকম দেখতে হয়েছিল। তখন শচিনের সঙ্গে বাঁধা ছিল গাঁটছড়া। অতীত যেন ফিরে এসেছে বর্তমানে। কান পাতলে কি সানাইয়ের সুর শোনা যাবে?

অলকার চোখে জল। শচিনের মনে হল পাথরে জল ঝরছে।

'তুমি কাঁদছ কেন?'

'আমার ভীষণ বাঁচতে ইচ্ছে করছে, আমি মরতে বড় ভয় পাই।'

'মরার কথা আসছে কেন?'

'আসছে। তোমাকে আমি বলিনি। আমার ভীষণ একটা অসুখ করেছে।'

'কি অসুখ?'

'টিউমার।'

'টিউমার? কোথায় টিউমার?'

'এই যে মাথার মাঝখানে।'

অলকা মাথাটা নিচু করল। কপালের সামনে থেকে চুল দু'ভাগ করে সিঁথি চলে গেছে মাথার মাঝখান পর্যন্ত। ঘাড়ের কাছে খোঁপা টলবল করছে। শচিন মাথার মাঝখানে হাত দিয়ে দেখল গোল মত একটা কি উঁচু হয়ে উঠেছে। গুলির মত হাতে চাপ দিলে পিছলে এপাশ ওপাশ করছে।

'তুমি বলনি তো?'

কি বলব, বলে কি হবে? তোমাকে না বলে একদিন ডাক্তার-বাবুকে দেখিয়েছিলাম। বললেন, 'জায়গাটা খারাপ। ভাল করে দেখতে হবে।'

অন্য দর্শনার্থীদের ঠেলা খেয়ে তিনজনকে সরে আসতে হল। একপাশের চাতালে বসে শচিন জিজ্ঞেস করলে, 'কি হয়?'

'যন্ত্রণা হয়। মাঝে মাঝে মাথাটা মনে হয় চুরমার হয়ে যাচ্ছে। চোখেও যেন কম দেখছি আজকাল। কান দুটোও কেমন হয়ে যাচ্ছে। আমি বেশি দিন বাঁচব না গো। তোমাকে অনেকদিন জ্বালিয়েছি, এইবার তোমার ছুটি। আবার যদি বিয়ে কর, একটু দেখে শুনে কোরো, শুভাটাকে যেন যত্ন করে।'

মায়ের কোলে মুখ গুঁজে শুভা ফ্যাঁস-ফোঁস করে উঠল। শচিন চুপ। ভেতরটা বড় নাড়া খেয়েছে।

রাত নিঝুম। শচিন মেটিরিয়া মেডিকা খুলে বসেছে। টিউমার, টিউমার। কত পাতায়। হোমিওপ্যাথিতে টিউমার সারে। বইয়ের ভেতর থেকে একটা কাগজ বেরোল। অনেকদিন আগে খবরের কাগজে দেবে বলে রাগ করে একটা বিজ্ঞাপন লিখেছিল,

স্বামী চাই

মধ্যবয়সী বিবাহিতা মহিলার জন্য পার্টটাইম স্বামী চাই।

দুপুরে বিকেলে প্রেম করতে হবে, তোয়াজ করতে হবে, বেড়াতে নিয়ে যেতে হবে। সব খরচ আসল স্বামীর। এমন কি অবাঞ্ছিত পিতৃত্বের দায়িত্ব। লিখুন বকস নং...

শচিন কাগজটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে জানালা দিয়ে উড়িয়ে দিল। অন্ধকারে সাদা সাদা কাগজের টুকরো হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে উড়ছে। আলো পড়ে কোনওটা চিকচিক করছে। যেন অজস্র বাদুলে পোকা।

দেওয়ালের ব্র্যাকেটে মা কালীর সিঁদুর মাখা ছবি। মায়ের

পায়ের তলায় কালীঘাট থেকে আনা প্রসাদী জবা ফুল জিভের মত লকলক করছে। সবাই ঘুমোচ্ছে। শচিন একা জেগে। কেমন যেন ভয় ভয় করছে। তোমার সংহারের রূপ আমি আর দেখতে চাই না।

অনেক অনেক দিন আগে শচিন একটা গল্প পড়েছিল 'স্রোতের ফুল'। সেই গল্পের সঙ্গে একটা ছবিও ছিল। নির্জন নদীর ঘাটে একটি বালিকা একের পর এক জলে ফুল ভাসিয়ে চলেছে। গল্পটা তার এখনও মনে আছে। অনেকে বলেন, ঈশ্বর এক মহান শিশু, বসে আছেন বিরাট সিন্ধুর তীরে আপন মনে। একটি একটি করে জীবনের ফুল ভাসিয়ে চলেছেন। ভাসতে ভাসতে সুদূরে চলেছে, কখনও একটি, কখনও পাশাপাশি দুটি তিনটি। এইভাবে চলতে চলতে স্রোতের টানে আবার একা। মিলন, বিচ্ছেদ, সঙ্গ, নিঃসঙ্গ সবই স্রোতের খেলা। অলকার জন্যে অসম্ভব করুণায় শচিনের মনটা কানায় কানায় ভরে গেল। একটা জীবন এসেছিল আর একটা জীবনের সঙ্গে মিলতে। একটু স্নেহ, একটু ভালবাসা, একটু নির্ভরতা, এ আর এমন কি ধন-দৌলত যা দেওয়া যায় না। কি তুচ্ছ ভাত, ডাল, তরকারির স্বাদ বিস্বাদ নিয়ে কলহ। কিসেরই বা অহঙ্কার।

বই বন্ধ করে শচিন বিছানায় গেল। অলকার ব্রহ্মতালুর ফুলো জায়গায় একটা আঙুল রাখল। অলকা খুব ঘুমোচ্ছে। বাইরে তো বেরোয় না, ঘোরাঘুরিতে খুবই ক্লান্ত। অলকা ঘুমোলেও টিউমারটা ঠিকই জেগে আছে। দেওয়াল ঘড়ির টিকটিকের সঙ্গে সমান তালে দপ দপ করে চলেছে। আমি বাড়ছি, আমি বাড়ছি। কি বলতে চায়? তোমাকে মারতেও পারি আবার মরতেও পারি।

ফিরে আয়

অ্যালবাম থেকে পোর্ট্রেট সাইজের একটা ছবি খুলে মাধবী কাঁদো কাঁদো গলায় বললে, 'এই ছবিটাই শেষ তোলা হয়েছিল, এই বছরখানেক আগে। ওর এক বন্ধু তুলেছিল।' অনিল হাত বাড়িয়ে ছবিটা নিল। পরিষ্কার স্পষ্ট ছবি। রাগ রাগ চেহারার এক যুবক। কান চাপা, ঝাঁকড়া চুল। নাকটা খাড়া গাল দুটো অল্প ভাঙা। কপালের ডানপাশে একটা কাটা দাগ। ছেলেবেলার দুর্ঘটনার স্মৃতি।

অনিল বললে, 'হ্যাঁ এই ছবিটাতেই হবে।'

অ্যালবামে আরও অনেক ছবি রয়েছে। বিভিন্ন বয়সের রঞ্জন। অন্নপ্রাশনে, জন্মদিনে, স্কুলে যাবার বয়েসে, স্কুল থেকে কলেজে। কোথাও মা-বাবার সঙ্গে, কোথাও বন্ধুদের সঙ্গে। মাধবী একে একে পাতা উলটে দেখতে লাগল। সতের বছরের সঞ্চিত স্মৃতি।

মাসখানেক আগে অনিলের এক বন্ধু অনিলের একটা ছবি তুলেছিল। অনিল যখন অফিসের টেবিলে বসে কাজ করছে সেই সময়। ছবিটার ফুলসাইজ প্রিন্ট এখন অনিলের চোখের সামনে টেবিলের কাচের তলায়। অনিল রাখেনি। রেখেছে মাধবী। বাঁধাবার খরচ অনেক। তবু কাচের তলায় থাকলে ভাল থাকবে।

অ্যালবাম মুড়ে রেখে মাধবী উঠে গেল। সতের বছরের ছেলের জন্যে গত তিন দিন অনেক কেঁদেছে। আর কত কাঁদবে। সংসারে সবই সহ্য করতে হয়। সবই সয়ে যায়। বিচ্ছেদ, সে তো টিকটিকির ল্যাজ খসে যাওয়ার মত। দেখতে দেখতে আবার গজিয়ে ওঠে। শূন্যতা ভরে যায়। একটু বেদনা, একটু স্মৃতি। চাকা ঘুরতেই থাকে। অভ্যাসের চাকা।

রঞ্জনের ছবিটা অনিলের ছবির পাশেই পড়ে আছে। একটা বড় মুখ, একটা ছোট মুখ। একটা ঝলসে গেছে, আর একটা এখনও তাজা। একটা প্রায় শেষের সীমানাচিহ্নে আর একটা শুরুর মাইল পোস্টে। পথ সেই এক। দু'টো মুখের দিকে অনিলের হঠাৎ নজর পড়ে গেল। কি আশ্চর্য সাদৃশ্য!

আজ তিন দিন হয়ে গেল, রঞ্জন নিরুদ্দেশ। অনুসন্ধানের কোনও ত্রুটি হয়নি। সর্বত্র দেখা হয়েছে। পুলিসে ডায়েরিও করা হয়েছে। কোথায় রঞ্জন। বাষ্পের মত যেন মিলিয়ে গেছে! সঙ্গে কিছু নিয়েও যায়নি। পড়ার টেবিলে স্তূপাকার বই। ড্রয়ারে কলম। শূন্য একটা মানিব্যাগ। আলনায় জামাপ্যাণ্ট। যেখানে যা ছিল সবই পড়ে আছে এলোমেলো ছত্রাকার। রঞ্জন উড়ছিল ঠিকই, দাঁড়ে ফিরে আসত। দানাপানি খেত। পড়ুয়া কাকাতুয়ার মত রাধেকৃষ্ণ না বললেও, আবোল-তাবোল কপচাত। সুখশ্রাব্য না হলেও সকলকে শুনতে হত। এবার পাখি শিকলি কেটে সত্যিই উড়ে গেছে।

রঞ্জন আমাদের বখে যাওয়া ছেলে। সিগারেট তো ছোট নেশা। তার চেয়েও বড় নেশার অভিজ্ঞতা রঞ্জনের হয়েছিল। অনিল জানে, সব জানে। মুখ দেখলে বোঝা যায় মানুষ কতটা পবিত্রতা হারিয়েছে। চোখ দেখলে মনের খবর জানা যায়। এই তো অনিলের মুখ, ওই তো রঞ্জনের মুখ। এই মুখই তো বলতে পারে, ওই মুখের কথা। সব ব্যাঙের গায়েই তো ধীরে ধীরে দেখা দেবে গরলে ভরা বিষাক্ত গুটিকা। ভেকের সন্তান তো ভেকই হবে। সাপের সন্তান সাপ। তবে কি অধিকার ছিল অনিলের রঞ্জনকে শাসনের।

অনিলকে কে শাসন করবে! অনিলের বিবেক। সে বিবে[illegible] বহুকাল নিদ্রিত, অনন্ত-শয়ানে পাপের সমুদ্রে ভাসছে। প্রবৃত্তি[illegible] ক্রীতদাস অনিল আর একজনের প্রবৃত্তিকে কি করে সংযত করবে উত্তরাধিকার বলে একটা কিছু অবশ্যই আছে! সেটা কি? [illegible]

আর ভেবে লাভ নেই। যা হয় তা হয়। রক্তের ধারা নদীর মতই চলে। কাকের পালক দেখতে দেখতেই কালো হয়ে ওঠে। রঞ্জনের ছবিটা একটা খামে ভরে রেখে অনিল উঠে দাঁড়াল। জীবনে এত জট পাকিয়ে রেখেছে, সব জট কি আর খোলা যাবে? কে খুলবে?

ঘরের দেয়ালে অনিলের বাবার ছবি কাত হয়ে ঝুলে আছে। বহুকাল কেউ ধুলোটুলো ঝাড়ে না। ফুলের মালার বদলে চারপাশে ঝুলের ঝালর ঝুলছে। অনিলের মাঝে মাঝে চোখ পড়ে যায়। জীবন আর ছবি, দু'টোকেই পোকায় কাটে। একটাকে দেখা যায় না, আর একটাকে দেখা যায়। কীটদষ্ট পূর্বপুরুষকে দেখে অনিলের তেমন কিছু ভাবান্তর হয় না। কে, কাকে, ক'দিন মনে রাখে! ভোগে দুর্ভোগে নিজেকে নিয়ে মানুষ বড় ব্যস্ত। আজ কিন্তু ছবির সেই বিবর্ণ মানুষটির দিকে তাকিয়ে অনিলের মন বলে উঠল, ঠিক তুমিও যেমন, আমিও তেমন। এখনও তোমার কত কুকীর্তি মানুষের মুখে মুখে ঘুরছে। শেষ বয়েসে একটু ধার্মিক হয়েছিলে। তাতে তুমি মোক্ষলাভ করেছ কি না জানি না। তবে তোমার নামের কলঙ্ক ধুয়ে যায়নি। আজও শোনা যায়, বকধার্মিক আশু কেমন একে একে সব কটা ভাইকে ফাঁকি দিয়ে বিষয়সম্পত্তি সব গ্রাস করে নিলে? কেউ কেউ আমার আরও এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলে, মোষের মত শরীর ছিল, যৌবনে স্ত্রী-বিয়োগ হল, রুগ্‌ণ বড় ভাইয়ের স্বাস্থ্যবান স্ত্রীটিকে বেশ মনে ধরল। তারপর কি হল? মধু ডাক্তারের ইণ্টারভেনাস ইনজেকসান। তারপর কি হল? তিনি গেলেন। আপনি রইলেন। কে কাকে কতদিন মনে রাখে। কত মাছই তো বঁড়শি গেঁসে তবু সব মাছই তো মুখিয়ে থাকে টোপের আশায়। মাছের তো শিক্ষা হয় না। আপনার বউদি কি ঠিক থাকতে পেরেছিলেন? দেহের মধ্যে যারা থাকে তারা কুরে কুরে খায়। সুখ আগে, না ত্যাগ আগে? যে যায় সে কি আর দেখতে আসে কে কি করছে? আসে না। মৃতের জগৎ আর জীবিতের

জগৎ আলাদা। আমি জানি মা, লোকে বলে, ওই যে তোমার বাবা মাঝে মাঝেই বউদিকে নিয়ে তীর্থে যেতেন, ধর্মের টানেই যেতেন, তবে সে হল মানবধর্ম। মনে নেই, শেষ বয়েসে তোমার জ্যাঠাইমার কি রকম ছুঁচিবাই হয়েছিল। তোমার বাবার বুলডগের মত মুখ একজিমায় কালো হয়ে গিয়েছিল। মানুষ কিসের সঙ্গে কি যে সব জুড়ে দেয়। কিন্তু!

অনিল ভয়ে কেমন যেন কুঁকড়ে গেল। যখনই সে এসব ভাবে তখনই ধাক্কা খায় এই 'কিন্তু'তে এসে। পাপ করলে একজিমা কি কুষ্ঠ হয় কিনা, সেকথা শাস্ত্রে লেখা নেই। মনে পড়ে, জ্যাঠাইমার শেষ বয়সে বাবা যখন প্রায় না খেতে দিয়ে মৃত্যুকে আরও কাছিয়ে আনলেন, তখন তিনি মাঝে মাঝেই চিৎকার করে বলতেন, তোমার কুষ্ঠ হোক। আর তার বাবা কিছু দূরে বসে মৃদু মৃদু হেসে বলতেন, পাগলে কি না বলে? তোমরা বুঝলে, পাগলে কিনা বলে। পাগলে যাই বলুক, দগদগে একজিমার ঘায়ে সারা শরীর ঢেকে গেল। পাপ হয় তো রক্তে ঢোকে না কিন্তু কিছু অসুখ রক্ত থেকেই রক্তে ছড়ায়। একজিমা সেই রকম একটি অসুখ। তার মানে আমরাও ওই এক পরিণতি। বীজের আকারে প্রবাহে ঢেলে দিয়ে গেছ। আসছে, তারা আসছে। পায়ের চেটো বেয়ে ধীরে ধীরে মুখে উঠে আসবে। তোমার কিছু না পাই ওটা পাবই। কিছুই যে পাইনি তাও তো নয়। এত বড় একটা বাড়ি পেয়েছি, তোমার রক্তে যারা কাঁদত তারা আমার রক্তেও কাঁদছে, তোমার সন্দেহ, সঙ্কীর্ণতা, কৃপণতা, লোভ, ভোগের ইচ্ছে সবই তো পেয়েছি। শেষ বয়েসে তোমাকে ছুঁতে যেমন ভয় পেতুম এখন তোমার ছবিটাকেও তেমনি ছুঁতে ভয় করে। তবে আমিও আসছি। তুমি ডান দিকে হেলে আছ আমি বাঁ দিকে হেলে থাকব।

অনিল বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল। মাথার ওপর বিরাট এক মামলার ছায়া ঘনিয়ে আসছে। কেসটার একটু তদবির করা

দরকার। চাকরি তো যাবেই উলটে জেলও হয়ে যেতে পারে। এ সব কথা মাধবী জানে না। এক সময় মাধবী শয্যাসঙ্গিনী ছিল। তখন একটু প্রেমট্রেম হত। ভালোবাসার কথা হত। সুখ-দুঃখের কথা হত। জীবন-পরামর্শ হত। এখন মাধবী অ্যাপেনডিক্সের মত। আছে থাক। মাঝে-মধ্যে যখন সাইটিস হয়ে ওঠে তখন কেটে ফেলার চিন্তাই আসে। ফেটে বসলে পেরিটোনাইটিস হয়ে জীবন বিপন্ন করে দেবে। মাধবীকে এমন কিছু দেওয়া হয়নি যাতে বলা চলে ওহে আমি রত্নাকর, তুমি কি আমার পাপের ভাগ নেবে? যেমন রঞ্জনকে বলা সম্ভব হয়নি, আমি তোর আদর্শ পিতা, আমার ত্যাগ, তিতিক্ষা, সংযমের কাছে নতি স্বীকার কর। যাকে বলা যায়, সে হেসে বলবে, ভোগের মাসুল দেবে না মধুকর?

ভবেশবাবুর চেহারা বাঘা উকিলের মতই। কথা কম। ফি বেশি। যা বলার তা এজলাসেই তো বলব। মক্কেলের সঙ্গে বৃথা বাক্যব্যয়ে পরমায়ু ক্ষয় করে লাভ কি? এখনও অনেক বছর কোর্টে দাঁড়িয়ে চোরকে সাধু, সাধুকে চোর করতে হবে। অনিলের দিকে তাকিয়ে গম্ভীর মুখে বললেন, 'স্টক থেকে অতগুলো টাকার মাল সরালেন, কাজটা একটু আটঘাট বেঁধে করলেন না। চুরিতে এত ফাঁক থাকলে উকিলকে পয়সা ঢাললে কি হবে? আমার কি এত ক্ষমতা যে, রাতকে দিন করে দোব। আগেই বলে রাখি আপনার কেসের অবস্থা তেমন ভাল বুঝছি না।'

অনিল আমতা আমতা করে বললে, 'আজকাল মানুষ খুন করে বেঁচে যাচ্ছে, বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর এই সামান্য ব্যাপারে ফেঁসে যাব?'

'ওই তো ভয় মশাই। ডাকাতি করে কিছু হল না, ছিঁচকে চুরি করে জেলে চলে গেল। আপনার এখন একমাত্র বাঁচার রাস্তা, দপ্তরের ওই নতুন নিরীহ ছেলেটিকে জড়িয়ে দেওয়া। কি যেন নাম বলেছিলেন?'

'নীহার বোস।'

'হ্যাঁ, ওই নীহারকে বলি দিয়ে নিজেকে বাঁচতে হবে। সে রাস্তা কি খোলা রেখে এসেছেন?'

'আপনি কি আমাকে অত বোকা ভাবেন? চাকরিতে চুল পাকিয়ে ফেললুম আর বলির পাঁঠা তৈরি রেখে আসব না।'

'কেসটা আমি ওইভাবেই তা হলে সাজাই। তারপর দেখা যাক, জজে মানে কি না। ও-পক্ষের উকিলও তো কিছু কম যায় না।'

'তা ঠিক। তবে ওটা তো চুরিরই জায়গা। ও-চেয়ারে যেই বসে সেই চুরি করে। ওপরঅলা মিত্তিরের সঙ্গে ভাগের গোলমাল না হলে আমার ফেঁসে যাবার কোনও কারণ ছিল না।'

'ওই তো হয়, সেই চোরই ধরা পড়ে, দারোগার সঙ্গে যার অবনিবনা।'

অনিল ভবেশবাবুর হাতে একটা খাম গুঁজে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। রাস্তায় নেমে মনে হল, কাজটা কি ঠিক হবে। নীহার ছেলেটাকে জড়িয়ে ফেলা। সবে বিয়ে করে চাকরিতে ঢুকেছে। অনিলদা, অনিলদা করে। করুক। অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বলেছিলেন, তুমি মারবে কি? এই দেখ বিশ্বরূপ, আমিই তো মেরে রেখে দিয়েছি। তুমি তো উপলক্ষ মাত্র। জীবই তো জীবের আহার। নীহারকে ফাঁসাতে পারলে তার নিজের পোজিসান ভাল হয়ে যাবে। চোরের জায়গায় সাধু সাধুর জায়গায় চোর। বড়কত্তারা বলবে, বাবা, অনিল হল ঝুঁদে লোক। ঘাঁতঘোত সব জানে। ওর সঙ্গে চালাকি। সঙ্গে সঙ্গে অনিলের আরও প্রোমোশন। নীহারের সাসপেনসান। জেল। আর তখন?

ভবেশবাবুর বাড়ির সামনে ফুটপাথে অনিল কিছুক্ষণের জন্যে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। রাস্তায় ব্যস্ত জগতের প্রবাহ বইছে হু হু করে। যত দিন যায় জীবন ততই দ্রুত হতে থাকে। আবার নীহারের চিন্তা মাথায় এল। সাসপেনসান। হাজার হাজার টাকার ডিফালকেসান কেস। বছর পাঁচেকের জেল তো হবেই। আর তখন?

অফিস রিক্রিয়েশন ক্লাবের ফাংসানে নীহারের সত্ত বিয়ে করা বউকে দেখেছি। বেশ ভাল। অভিনয়-টভিনয় করে। ভাল নাচে। হাতকাটা ব্লাউজ পরে। ভুরু কামিয়ে আবার আঁকে। ও জিনিস নীহারের একার জন্যে নয়। সকলের জন্যে। নিশ্চয়ই অ্যামবিশান আছে। প্রেম করে নীহারের মত ছেলেকে বিয়ে করে ফেলেছে। ও প্রেম চটকে যাবেই। কেরিয়ারের লোভ দেখালেই বেরিয়ে আসবে। বিলাস বাঁড়ুজ্জ্যের হাতে একবার কোনও রকমে ঘুরিয়ে ফেলে দিতে পারলে ও ঠিক লাইনে নিয়ে আসবেই। ধর্মতলার সেই জমাটি দোকানে বারকতক আসা যাওয়া। দু-চারটে ডিরেকটার আর ক্যামেরাম্যানেব হাতে লোফালুফি হতে হতে নৈবেদ্যর থালায় চলে আসবে। সারা জীবনে ওরকম মেয়ে কত দেখা হয়ে গেল। নাঃ বয়স যত বাড়ছে খিদে ততই বাড়ছে। নতুন কি আছে কে জানে। সবই তো সেই এক। তবু রক্তে যেন কিসের জীবাণু ছটফট করিয়ে বেড়াচ্ছে। কিছুতেই শান্ত হতে দিচ্ছে না। আরো লোভ, আরো ভোগ। যত রাত বাড়তে থাকে, ততই মনটা নাচতে থাকে।

অনিল হাত তুলে একটা ট্যাকসি থামাল। ড্রাইভার মনে হয় লোক চেনে। থেমে পড়ল। নীহারের বউয়ের কথা ভাবতে ভাবতে মুখে একটা লম্পট লম্পট ভাব এসেছে। এরা লম্পটদের বেশ খাতির করে। তা না হলে মাতালরা বাড়ি ফেরে কিকরে। অনিল বহুদিন লাল আলোর এলাকা থেকে সহজেই ট্যাকসি ধরে মাঝরাতে বাড়ি ফিরেছে। কখনো কোনো অসুবিধে হয়নি।

বউবাজার স্ট্রীটে একটা গয়নার দোকানের সামনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখে অনিল একটা লকেট কিনে ফেলল। এতকাল লোকে তাকে তদবির করেছে। ঘুস-ঘাস দিয়েছে। হোটেলে ঘর বুক করে ফুর্তির ব্যবস্থা করে দিয়েছে। জীবনে ঝাড়বাতি জ্বেলে দিয়েছে। আজ তাকে তদবির করতে হবে। চাকা তো এইভাবেই ঘুরে যায়। আবার যেদিন মওকা মিলবে সেদিন দেখে নেওয়া যাবে। লকেটটা হাতে

নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে দেখতে অনিলের মনে হ'ল, সেই বর্ষার রাতে, নাটু ঘোষের সঙ্গে রোশান বাঈয়ের ঘরে বসে বসে মাইফেল শুনছে : দেখকুর রঙ্গ-এ-চমন হো ন পরেশাঁমালী। কৌকবে গুঁচ : সে শাখেঁ হেঁ চমকতে বালী।

নরেন হালদার-এর বাড়ির গলিতে গাড়ি ঢোকে না। অনিল বড় রাস্তাতেই গাড়ি ছেড়ে দিল। দু'পাশে নোনা ধরা দেওয়াল উঠে গেছে। মাছখানে পড়ে আছে সরু গলি। দু' হাত অন্তর অন্তর আঁস্তাকুড়। ভ্যাপসা গন্ধ। রাস্তায় আলো নেই। মাঝে মাঝে খোলা জানালা গলে একটু আধটু আলোর রেখা এসে পড়েছে। ড্যাম্প ঘরে সংসারের খেলা কিছু কম জমেনি। খোলা জানালা দেখলেই অনিলের চোখ চলে যায়। অনেক দিনের অভ্যাস। খাটে উপুড় হয়ে শুয়ে, ডুরে শাড়ি পরে সন্ত বিবাহিতা বই পড়ছে। পা দুটো হাঁটুর কাছ থেকে ভাঁজ হয়ে ওপর দিকে উঠে রেলের সিগন্যালের মত হয়ে আছে। কোনও জানালায় চুল বাঁধার দৃশ্য। রাত ঘন হয়ে আসছে। আর কিছুক্ষণ পরেই হাঁসফাঁস শহর ঘুমোতে যাবে। নরেন হালদার আচ্ছা জায়গায় থাকে।

নরেন হালদারের বাড়িতে বাচ্চাদের কান্নার মাইফেল বসেছে। অন্ধকার ঘুপচি নিচের তলায় খানতিনকে ঘরে নরেন চোখ-কান বুজিয়ে তার বংশ বিস্তার করে চলেছে। মাঝখানে শ্যাওলা-ধরা উঠোন। চারপাশে তলার ওপর তলা খাড়া মাথা তুলেছে। ভেতরে দোতলা তিনতলার বারান্দা থেকে ভিজে শাড়ি নিথর ঝুলছে। বাতাস ঢুকতে ভয় পায় এ বাড়িতে। নিচের জানালায়-জানালায় এক সময় তারের জাল পড়েছিল। ধুলোয়, ধোঁয়ায়, ঝুলে এমন চেহারা হয়েছে! সংসারটাকেই অস্পষ্ট করে তুলেছে।

অনিল ঢুকেই দেখল নরেনের বউ একটা বাচ্চাকে বেধড়ক ঠ্যাঙাচ্ছে। আর একটা মায়ের শাড়ির আঁচল ধরে টানছে। অনিলের হাসি পেল, এর জন্য সোনার লকেট! এক নজরে মেয়েদের শরীর

দেখে নেবার অভ্যাস অনিলের আজকের নয়, অনেক দিনের। গুরু ধরে শিক্ষা। মহিলার ছিল সব। নরেনের হাতে পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। ঠিকমত ব্যবহার হয়নি, তদবির হয়নি, সার্ভিসিং হয়নি। করপো-রেশানের লরির মত ইঞ্জিন শব্দ ছাড়ছে। এগজস্টে ডিজেলের ময়লা জমেছে। মুখটা ধারালো। অনিলের হাতে থাকলে বীয়ার খাইয়ে মাসখানেকেই মাংস ধরিয়ে দিত। রঙ খুবই ফর্সা। একটু রক্ত ঢোকাতে পারলে গোলাপী আভা ছাড়ত। এক সময় যথেষ্ট চুল ছিল। শ্যাম্পু করে এলো খোঁপা বেঁধে দিলে মন্দ হবে না। দু একটা ভাল শাড়ি আর ব্লাউজ। তারপর পাশে এসে বোসো। বুকের ওপর লকেটটা কেমন মানায় দেখি।

অনিল পেছন দিক থেকে মহিলাকে দেখছিল। শাড়িতে আটার গুঁড়ো লেগে আছে। জল-হাত মুছেছিল। এখনও খামচা হয়ে আছে। মায়া লাগছিল। সম্ভাবনাময় মেয়েরা অন্যের হাতে থাকলে বড় কষ্ট হয়। মানে, কি হতে পারত, কি হয়ে আছে। পরে অবশ্য মায়াটায়া আর তেমন থাকে না। তা হলেও পার্কের গাছের মত প্রথমটায় যত্ন করে ছেড়ে দাও, তারপর সে তো আপনিই ফুলে-ফলে শোভা হয়ে থাকবে। পাড়ো, খাও। ছায়ায় গিয়ে বস। ভাল জিনিসের কদর বুঝতে হয়। মাধবী যখন এসেছিল, কি ছিল? এখন কি রকম হয়েছে? তবে একটু বেশি হয়ে গেছে। সবই বেশি বেশি। এখন আর মানুষের নোলায় জল পড়বে না। বাঘ জিভ ঢোকাবে।

অনিল গলা উঁচু করে বললে, 'নরেন কোথায়?'

মহিলা চমকে মুখ ফিরিয়ে বাঁ হাতে মাথায় আঁচল টেনে বলল, 'ডেকে দিচ্ছি।'

ডেকে দিতে হবে। ডাকলে শুনতে পাবে না। বাচ্চাটা যা চেল্লাচ্ছে। সত্যি কথাই। শব্দ ব্রহ্ম। নরেন কোণের দিকের রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এল। দু' হাতে আটা। রুটির আটা মাখছিল। বউকে সাহায্য করছিল।

'আরে দাদা আপনি ? কি মনে করে ?'

অনিল মধুর হেসে বললে, 'তোমাকে মনে করে। খুব ব্যস্ত মনে হচ্ছে।'

'না, না, ব্যস্ত না। এই রুবিকে একটু সাহায্য করছিলুম। শরীরটা ভাল যাচ্ছে না। দাঁড়ান হাতটা পরিষ্কার করে আসি।'

নরেন অদ্ভুত কায়দায় শ্যাওলা ধরা উঠোন পেরিয়ে অন্ধকার কলঘরের দিকে চলে গেল। আর তখনই অনিল বুঝতে পারল রুবির আবার ছেলেপুলে হবে। ভাল, এই তো বয়েস। ধর্ম, সংযম, বৈরাগ্য সবই অর্থহীন। চারপেয়ে জীবের মত সুখী হতে পারলে জীবনের চেহারাই পালটে যায়। যোগ আর ভোগ নিয়ে আজকের লাঠালাঠি অনন্তকাল ধরে দুটো মনের তুমুল লড়াই চলেছে।

নরেন অনিলকে শোবার ঘরেই নিয়ে বসাল। তাছাড়া আর বসাবে কোথায়। ঘর জোড়া খাট। বেডকভারটা বেশ চটকদার, একপাশে আলনা। মেয়েলি জিনিসপত্র ঝুলছে। দেহের গন্ধ বেরোচ্ছে। ঘরে দেবদেবীর ছবি ঝুললেও খুব একটা পবিত্র স্থান বলে মনে হচ্ছে না। দেওয়ালের দিকে খাটের বাজুতে রুবির অন্তর্বাস, শুকোচ্ছে পাখার হাওয়ায়। রান্নাঘর থেকে পেঁয়াজ কষার গন্ধ আসছে। রাস্তার দিকের নর্দমা দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে।

সময় নষ্ট করা অনিলের স্বভাব নয়। স্বার্থের কথা তাড়াতাড়ি বলে ফেলাই ভাল।

'নরেন, তুমি তো জানো, আমি সাসপেণ্ড হয়ে আছি। যাই করুক কোর্টে আমাকে ফাঁসাতে পারবে না। তুমি যদি আমাকে একটু সাহায্য কর তাহলে আমি আরও কিছুটা নিশ্চিন্ত হতে পারি। এই নাও। এটা তোমার স্ত্রীকে দিও।'

অনিল ভেলভেটের বাক্সটা নরেনের হাতে দিল। নরেন খুলে দেখল। নীল ভেলভেটের ওপর সোনার লকেট সাপের মত কুণ্ডলি পাকিয়ে শুয়ে আছে। নরেন মনে মনে চমকে উঠল। জীবনের

প্রথম ঘুস। টাকার অঙ্কে নেহাত কম হবে না। সৎ পথে নিজের উপার্জনের পয়সায় রুবিকে এমন একটা উপহার কিনে দেবার ক্ষমতা তার নেই। আলো নেবানো ঘরে অন্ধকার বিছানায় দু'চারটে প্রেমের কথা ছাড়া আর কিছু দেবার মুরোদ তার নেই। দুটি সন্তান দিয়েছে, আর একটি আনছে।

অনিল বললে, 'খুব সুন্দর মানাবে। তোমার বিয়ের সময় আমার সঙ্গে তো তোমার পরিচয় ছিল না। তোমরা দু'জনে সুখী হও। হ্যাঁ, যে কথা বলছিলুম। সমস্ত খাতাপত্তর এখন তোমার হাতে। স্টক, ইস্যু রেজিস্টার, কোটেসান, চালান, পারচেজ ভাউচার। তুমি সামান্য এদিক ওদিক করে দিলেই স্টোরকিপার নীহার জড়িয়ে পড়বে। নীহারের বয়েস কম, চাকরি গেলে আবার পাবে। জেলে গেলে তেমন কষ্ট হবে না। আমি বুড়ো হয়ে গেছি নরেন। চুলে কলপ দিয়ে আর কতকাল বয়েস চেপে রাখব। চুরি সবাই করে। আমি তো কারুর বাড়িতে সিঁধ কাটতে যাইনি। যার অঢেল আছে, সেই সরকারের ভাণ্ডার থেকে সামান্য কিছু সরিয়েছি, এতে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেছে! ওই ব্যাটা ডিসপেপটিক ডিরেক্টার প্রোমোশানের ফিকিরে আমার পেছনে লেগেছে। ব্যাটা দশরথপুত্র শ্রীরামচন্দ্র! নাও, তোমার স্ত্রীকে একেবারে ডাকো, রাত হয়ে যাচ্ছে। তোমাদের বিশ্রামের সময়।'

নরেন গম্ভীর মুখে লকেট কেসটা অনিলের টেবিলের পাশে রেখে দিল।

'অনিলদা, আমার স্ত্রী তেমন মডার্ন নয়। বাইরের লোকের সামনে বেরোতে ভয় পায়। তাছাড়া, যে কারণে এটা আপনি দিতে চাইছেন, তার কিছুই করা যাবে না। সমস্ত খাতাপত্তর সিল করে গভর্নমেন্ট প্লিডারের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া, উপায় থাকলেও আমি আপনার মত একজন নোংরা লোকের সঙ্গে হাত মিলিয়ে কোনো অন্যায় কাজ করতুম না। আমার তেমন অ্যামবিশান নেই অনিলদা। নেহাতই ছা-পোষা মানুষ।'

অনিল গালাগাল তেমন গায়ে মাখল না। ওসব অনেক শুনে শুনে চামড়া পুরু হয়ে গেছে। শুধু জিজ্ঞেস করলে 'সব রেকর্ডই এখন তা হলে হাত-ছাড়া ?'

'হ্যাঁ, হাত-ছাড়া, আমাদের আর কিছুই করার নেই। যা হবার তা কোর্টেই হবে। ওখানেই আপনাকে লড়তে হবে।'

'আচ্ছা, আমি তাহলে চলি। তুমি এইরকমই সৎ থাকো সারা জীবন। চরিত্রই সব চেয়ে বড় জিনিস, সোনার চেয়েও দামী।'

বাক্সটা তুলে নিয়ে অনিল আবার গলিতে নামল। সেই অন্ধকার, আবর্জনাময় পথ। এবার অবশ্য আরও অন্ধকারের দিকে প্রসারিত নয়। চলে গেছে আলোকিত বড় রাস্তার দিকে। নাঃ, জীবনের চালে এবার হারের সময় এসেছে। সব খেলাতেই কি আর জেতা যায়! এতক্ষণে রঞ্জনের কথা বড় মনে হচ্ছে। শরীর ভেঙে আসছে। প্রস্টেট গোলমাল দেখা দিচ্ছে। হয় তো, ক্যানসার! মামা তো প্রস্টেট ক্যানসারেই গত হয়েছিলেন। পঞ্চাশের কিছু পরেই। চাকরিটা তো যাবেই বোঝা যাচ্ছে। জেলের হাত থেকে বাঁচতে হলে সর্বস্বান্ত হতে হবে। একমাত্র ভরসা রঞ্জন। ছেলে যদি শেষের সময় বাপকে না দেখে, কে দেখবে ? কোথায় গেল ছেলেটা।

শালা নরেন, কোন দিন যদি সুযোগ আসে, তোমার বারোটা আমি বাজাবই। যে হারে বংশ বিস্তার করছ, ছানাপোনা নিয়ে একদিন তোমাকে ন্যাজে-গোবরে হতেই হবে। তখন মারব তোমাকে কোপ। হাঁড়ি শিকেয় তুলে ছেড়ে দোব! লুচি দিয়ে ডিমের কারি খেয়ে, বউ জড়িয়ে শুয়ে পড়া বেরিয়ে যাবে! তখন আর নারী-শরীর জরিপ করতে হবে না। জরিপ করবে অভাব। সে সুযোগ কি আসবে অনিল ? কত লোককেই তো দেখে নেবার ইচ্ছে ছিল ? পারছি কই! প্রতিহিংসার শেষ নেই, শক্তি বড় কম। নাঃ, রঞ্জনটার কি হল ? একটিমাত্র ছেলে ?

রঞ্জনের একটা ঘাঁটি ছিল। স্যাঙাত ছিল অনেক। তারা বলেছিল, আপনি খোঁজ করুন, আমরাও দেখছি। আজকাল খুব মার্ডার হচ্ছে। কেউ ঝেড়ে দিলে কি না, কে জানে? ঝেড়ে দিলে তো হয়েই গেল। আর সে বয়েসও নেই, শক্তিও নেই, যে নতুন করে সন্তান লাভ করে আবার নব ধারাপাত থেকেও শুরু করবে। এখন যা পারা যায়, একটা ট্যাকসি ধরে মায়ার কাছে যাওয়া। রাত বেশ হালকা ফুরফুরে, মনে বেশ অন্ধকার, মায়া বেশ পুরনো মদের মত সোনালি বুজবুজে। পাপের শরীর আর সাপের শরীর একই রকম। দেখলে গা শিউরে ওঠে, ছোবলে বেশ নেশার মৌতাত আসে। গ্যাঁড়া মিত্তির বেশ ভালই আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। গ্যাঁড়া নিজে সেরিব্র্যাল থ্রম্বোসিসে পঙ্গু হয়ে পড়ে আছে। তা থাক। আমি তো এখনও খাড়া আছি। মায়া অনেক ঝেড়েছে। না হয় আর একটা লকেট ঝাড়বে। ক্ষতি কি? কত জাহাজই তো সমুদ্রে তলিয়ে যায়!

থাক, মায়া এখন মায়াতেই থাক। রঞ্জনের সন্ধ্যের ঘাঁটিতে একবার যাওয়া যাক। নেতার নাম বুল। কিসের নেতা কে জানে? ওয়াগন ভাঙার, কি চোরা চালানের, কি চোলাই মদের, বুলই জানে। তবে পাড়ায় বেশ দাপট আছে। 'এই শোন' বলে ডাকলে সকলেই থমকে দাঁড়ায়। মাঝেমধ্যে জিপে চড়ে ঘুরে বেড়ায়। সাবেক কালের বাড়ির নিচের ড্রইংরুমে রোজই চক্র বসে। লোকজনের আসা-যাওয়া। দেয়ালে কাত হয়ে থাকা সাইকেল। দু' চারটে মোটর বাইক, স্কুটার। গভীর রাত পর্যন্ত কিসের যে ষড়যন্ত্র চলে! মাঝে মাঝে ফোন বেজে ওঠে। রঞ্জন এই আড্ডায় কি করে এসে পড়েছিল, কেনই বা এসেছিল?

বুলের চোখ দেখলেই বোঝা যায়, সারা দিনই চড়িয়ে থাকে। ছেলেটাকে দেখতে ভারী সুন্দর। অপঘাতেই মরবে। কোনো সন্দেহ নেই। এসব ছেলে বেশিদিন বাঁচে না। অনিলকে দেখে

বুল ঘর থেকে বেরিয়ে এল। মুখে সিগারেট। অনামিকায় হীরের আঙটি চকচক করছে। ফর্সা কপালে এলোমেলো ঘন কালো চুল। অনিল জিজ্ঞেস করলে, 'কোনো সন্ধান পেলে?'

'হ্যাঁ, একটা উড়ো খবর পেয়েছি। রেণ্টুর বউয়ের সঙ্গে দীঘা যাবার কথা ছিল। হয়ত তাই গেছে।'

'রেণ্টুটা কে? নাম শুনেছি বলে মনে হচ্ছে না তো!'

'রেণ্টু ছিল রেসের বুকি। দীঘায় একটা হোটেল করেছিল। বছর চারেক আগে দীঘাতেই জলে ডুবে মারা যায়। লোকে বলে মার্ডার। ওর বউই নাকি খুনটা করায়, মহিলার অনেক উপ ছিল। এখনও আছে। ওপরতলার জিনিস। কেস-ফেস দাঁড়ায়নি। সেই মালের খপ্পরে আপনার ছেলে পড়েছে। আমরা বারণ করেছিলুম। শোনেনি। চুষে শেষ করে ছিবড়ে ফেলে দেবে। একবার খবর নিয়ে দেখতে পারেন।'

'কোথায় নিতে হবে?'

'ডিকসন লেনে চলে যান। মঞ্জুলা চ্যাটার্জিকে সবাই চেনে। একটা নীল রঙের ওপেল গাড়ি আছে। নিজেই চালায়। বিলিতি স্টাইলের বাড়ি। বাগান আছে। কুকুর আছে।'

ঘরে ফোন বেজে উঠল। বুল চলে গেল। সামনের বাড়িতে রেকর্ডে ঠুংরি বেজে উঠল। শরৎকাল। আকাশে মানচিত্রের মত সাদা মেঘ উঠেছে। কোন্ বাড়িতে রেডিও খুলেছে। কাঁপা কাঁপা গলা শোনা যাচ্ছে, ট্রেন দুর্ঘটনায় বত্রিশ জনের জীবনাবসান। ধবধবে সাদা পাজামা আর পাঞ্জাবি পরে রোগা চিমসে মত একটা লোক কুকুর নিয়ে ফুটপাথে বেড়াতে বেরিয়েছেন। চোখে রিমলেস চশমা। কুকুরটার পেটে ক্রশ বেল্ট, প্রভুর হাতে লিড। ভদ্রলোকের মুখে সিগারেট। সামনে টাক পড়ে এসেছে। রাতের আহার শেষ করে সারমেয় নিয়ে হজমে বেরিয়েছেন। কুকুরটা একটা ল্যাম্পপোস্টে ঠ্যাং তুলে পেচ্ছাপ করে, ফোঁস ফোঁস করে শুঁকে, খুড়খুড় করে

উত্তর দিকে চলল। অনিলও চলল পেছন পেছন। রাত হয়েছে। বাড়ি ফিরতে হবে। খবর হচ্ছে রেডিওয়। মাঝে রেকর্ডের রাগপ্রধান মিশে যাচ্ছে, কোয়েলিয়া গান থামা এবার। রেলমন্ত্রী দুর্ঘটনা সম্পর্কে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন। তোর ওই কুহু তান, ভাল লাগে না আর।

অনিল রিকশা চেপে, শরতের হাওয়া খেতে খেতে, মেঘ-ভাসা আকাশের তলা দিয়ে বাড়ি ফিরে এল। অন্য দিন এলিয়ে পড়ে। আজ খাড়া আছে। শহর বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। রিকশার পা তেমন চলছে না। পাশ দিয়ে শেষ বাস চলেছে ধুঁকতে ধুঁকতে। সাদা একটা মোটর গাড়ি পেছনে লাল চোখ মেলে ক্রমশ দূর থেকে দূরে চলেছে। দু' পাশের ফুটপাথে খাটিয়া পড়েছে। সারি সারি চাদর ঢাকা মানুষ লাশের মত পড়ে আছে। একটা মরদের কোমরের ওপর একজন জোয়ান ছুকরি দাঁড়িয়ে উঠে খুব দাবাচ্ছে। পায়ের মল বাজছে ছিনিক ছিনিক শব্দে।

বাড়ির সামনে রিকশার ঠুনুর ঠুনুর শব্দ শুনে মাধবী তাড়াতাড়ি দরজা খুলে ছিল। অন্য দিন অনিলকে দরজার সামনে থেকেই ধরে নিয়ে চৌকাঠ পার করাতে হয়। আজ তার আর প্রয়োজন হল না। কত বছর পরে অনিল সোজা হয়ে, শক্ত পায়ে বাড়ি ফিরল! অনিল বুঝতে পারল, মাধবী অবাক হয়েছে। দরজা বন্ধ করতে করতে মাধবী জিজ্ঞেস করল,

'কোনও খবর পেলে?'

'না তেমন কিছু নয়, তবে দীঘায় যাবার সম্ভাবনা আছে। কাল আবার দেখব। আমার কিছু খাবার আছে?' অন্যদিন অনিল খাবার মত অবস্থায় থাকে না। আজ খুব খিদে। মাধবী বললে, 'হাত মুখ ধোও, দিচ্ছি।' ঢাকা বারান্দায় মৃদু আলো জ্বলছে। উপরি টাকায় অনিল বাড়িতে অনেক রকম কায়দা করেছে। আলোর আবরণ দুধের মত সাদা। চারপাশ মায়াবী।

দেয়ালে বিদেশী পেন্টিং, গিল্‌টির কাজ করা ফ্রেমে। বাঁ পাশে জাফরির কাজ।

মাধবী আগে আগে চলেছে। পেছনে অনিল। পায়ের কাছে শান্তিপুরী ধুতির কোঁচা লুটোচ্ছে। গ্রিসিয়ান নিউকাটের হালকা মুচ মুচ শব্দ দেয়ালে ধাক্কা খাচ্ছে। কোথা থেকে শিউলি ফুলের গন্ধ আসছে। বেশ লাগছে মাধবীর পেছন পেছন যেতে। এতদিন তো অনেকের পেছনেই ঘুরেছে। নিজের স্ত্রীকে তো তেমন খারাপ লাগছে না। মায়ার সঙ্গে এর তফাত কোথায়! কেমন পবিত্র শরীর। ঘটের মত নিতম্ব। পুরুষ্টু বাহু। চওড়া পিঠ।

অনিল বললে, 'দাঁড়াও।'

মাধবী অবাক হয়ে ঘুরে দাঁড়াল। আদেশ, অনুরোধ, স্নেহ, অত্যাচার কোনটা! শেষেরটাই তো এতকাল জুটে এসেছে। মাধবী দেয়ালে কাঁধ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়েছে। অনিল আরও দু'পা এগিয়ে এসেছে। দু'হাতে ধরে আছে সেই লকেটটা। এর চেয়ে অবাক কাণ্ড আর কি হতে পারে? গলায় পরিয়ে দিতে দিতে অনিল বললে, 'তোমার আমি, আর আমার তুমি ছাড়া সংসারে কে আছে?'

মাধবী গলায় হাত দিয়ে জিনিসটার স্পর্শ নিতে নিতে বললে, 'হঠাৎ এই দুঃখের দিনে?'

'জীবনটাই তো' হঠাৎ গো। এই আছে তো এই নেই। হঠাৎই তো সব পালটে যায়।'

'ছেলেটা কোথায় চলে গেল?'

'আসার হলে আসবে, যাবার হলে যাবে। আমিও তো রোজ এসেছি। আজকের মত কোনদিন এসেছি কি?'

অনেক দিন পরে অনিল মাধবীর পায়ে পা জড়িয়ে বুকের ওপর আদরের হাত ফেলে ঘুমোবার চেষ্টা করল। কারুরই কিন্তু ঘুম এল না। আকাশে আজ অনেক তারা। বাতাস বড় এলোমেলো প্রকৃতিতে যেন কিসের মাতন লেগেছে আজ। এমনও তো হতে পারে.

বুল যা বললে, রঞ্জনকে হয় তো খুন করে কচুরিপানা ভরা কোনো এঁদো পুকুরে ফেলে দিয়েছে। আলকাতরার মত কালো জলে রঞ্জন তলিয়ে আছে। কেউ জানে না। শকুনরাই শুধু অপেক্ষায় বসে আছে।

পরের দিন দুপুরে অনিল বেরোল ডিকসন লেনের মঞ্জুলার সন্ধানে। মঞ্জুলা প্রকৃতই খুব পরিচিতা মহিলা। সকলেই তাকে চেনে। নাম শুনে এক ধরনের মুচকি হাসি খেলে যায় মুখে। বুল যেমন বলেছিল বাড়িটা ঠিক সেই রকমই। তবে বড় বেশি নির্জন। চার পাশে বাগান। আলিবাবার চিচিং ফাঁকের মত বিশাল একটা গেট। অল্প একটু ফাঁক হয়ে আছে। ঢুকেই ডান পাশে কোনো কালে বোধ হয় একটা কারখানা ছিল, টিনের ঘরে। মরচে ধরা কিছু খালি ড্রাম পড়ে আছে। যেন নেশাখোরদের আড্ডা। কোনোটা খাড়া, কোনোটা গড়াগড়ি।

কোনও একটা ঝোপে বসে দুটো হাঁড়িচাচা পাখি থেমে থেমে ডাকছে। দুপুরের ইস্পাত চাদরে যেন হাতুড়ি পিটছে। গাড়ি বারান্দার একপাশে ঝকঝকে গাড়ি পার্ক করা। রেণ্টু চট্টোপাধ্যায় কত বড় লোক ছিলেন রে বাবা! কে জানে ঐশ্বর্যের গোপন কথা। কেউ কি প্রকাশ করতে চায়। বর্মাকাঠের ঝকঝকে বিশাল দরজা। সোনার মত পেতলের কারুকাজ করা, বিচিত্র কড়া। দুধ-সাদা কলিংবেলের বোতাম। বোতাম টিপতেই ভেতরে একটা কুকুর মিহি গলায় ঘেঁউ ঘেঁউ করে উঠল। দরজা খুলল আয়াশ্রেণীর এক মহিলা।

অনিল ইতস্তত করে বললে, 'মঞ্জুলাদেবী আছেন।'

'হ্যাঁ আছেন ভেতরে এসে বসুন।'

অনিল ভেতরে ঢুকতেই গাঢ় বাদামী রঙের একটা কুকুর এসে ফোঁস ফোঁস করে ঘুরে ফিরে শুঁকতে লাগল। সোফায় বসেও নিস্তার নেই। লাফিয়ে পাশে উঠে বার কতক নাক মুখ চেটে দিল। লোমে পাউডারের গন্ধ। বসার ঘরটা বিশাল।

কাঠের ওপর ফুল তোলা সব সোফা সেট। নিখুঁত করে সাজানো। দেয়াল ঘেঁসে এখানে ওখানে পেতলের কাজ করা, নানা মাপের সাইড টেবিল। বড় বড় জানালায় ফিনফিনে নীল পর্দা। একেবারে শেষ প্রান্তে একটা অর্গান। এক পাশের দেয়ালে একটা মুখোস ঝুলছে। তিনটে ঝাড় লণ্ঠন। কার্পেট। বেলজিয়াম কাঁচের বিশাল আয়না। সব মিলিয়ে রাজকীয়।

মঞ্জুলা ঘরে ঢুকতে অনিল ভীষণ অবাক হয়ে গেল। প্রায় মাধবীর বয়সী। তাছাড়া এ মুখ কোথাও যেন দেখেছে দেখেছে। নিশ্চয়ই কোনও পাপের আস্তানায়। পাপের পথই ঐশ্বর্যের পথ। মঞ্জুলা খসখসে গলায় বলল,

'কে আপনি ?'

অনিল চমকে উঠল। মনোযোগ দিয়ে মঞ্জুলাকেই দেখছিল। দেখার মতই জিনিস। শাড়ি এত ফিনফিনে হয়! পারসীদের অবশ্য এমন শাড়ি পরতে দেখেছে। সারা গায়ে মিষ্টি সুবাস। নির্জন দুপুর যেন সম্ভাবনায় ভরে উঠেছে। এক সময় মহিলা খুবই ফর্সা ছিলেন। এখন যেন গায়ে ধোঁয়া লেগেছে। বেশ প্যাক করা শরীর। অনিলের হঠাৎ সেই বাউল গানটা মনে পড়ে গেল: চারিদিকে পাপ রে ভাই/ নেই কোথাও কোনো আলো/এর চেয়ে অন্ধ হওয়া ছিল রে ভাই ভাল। অনিল বললে,

'আমি রঞ্জনের বাবা।'

'ও তাই নাকি।'

মঞ্জুলা পায়ের ওপরে পা তুলে বসল। অনিলের গত রাতের আত্মোপলব্ধি ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে। রক্তে আবার সেই চিৎকার। মশলার গন্ধ। দূর থেকে যেন ভেসে আসছে পেঁয়াজ আর রসুন দিয়ে মাংস কষার মোগলাই মেজাজ। মঞ্জুলার পায়ের অনেকটাই অনাবৃত হয়ে পড়েছে। লোমনাশক মেখে মেখে গোলাপী বর্ণ। সেই পা আবার মৃদু মৃদু দুলছে। চেতনাকে যেন টুকুস টুকুস ঠোকরাচ্ছে।

অনিল বললে,

'আমার ছেলের খবর আপনি কিছু জানেন ?'

মৃদু হেসে মঞ্জুলা বললে, 'হ্যাঁ ছেলেটি ভাল, বেশ কথা শোনে, তবে একটু খেয়ালি।'

'সে খবর নয়, আজ চারপাঁচ দিন সে নিরুদ্দেশ, কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছে না। আপনি কি তাকে দীঘায় পাঠিয়েছেন ?'

'নাঃ, তার তো কাল আমার সঙ্গে যাবার কথা।'

'আপনার কাছে এর মধ্যে আসেনি ?'

'সাত আট দিন আগে রাতের দিকে এসেছিল। আমি একটু ইনটকসিকেটেড ছিলুম। সেই সময় কি একটা ব্যাপারে, আমি টেম্পার চেক করতে পারিনি, ঠাস করে একটা চড় মেরেছিলুম। ইমিজিয়েটলি হি লেফ্‌ট। তবে সেটা কোনো কারণ নয়। আগেও আমাদের ও রকম হয়েছে। হি টেকস ইট ভেরি স্পোর্টিংলি।'

'এখানে কি জন্যে আসে ?'

'আমাকে ভালবাসে বলে। আই অলসো লাইক হিম। হোয়েন আই ফিল লোনলি, আই নিড কম্প্যানি। এতে তো দোষের কিছু নেই! উল্‌ফের মত মানুষও প্যাক অ্যানিম্যাল। সঙ্গ চায়।'

'তা বলে, ওর একটা ভবিষ্যৎ আছে তো ?'

'ভবিষ্যৎ আবার কি ? পুওর ডাইজ পুওরার, রিচ ডাইজ রিচার, সিন ডাইজ উইথ দি সিনার। সো হোয়াট।'

'আমি ওর বাবা।'

'সো হোয়াট! সে তো কেউ না কেউ কারুর বাবা হবেই। ল' অফ নেচার।'

'আমার একটা দুশ্চিন্তা আছে।'

'ডাই উইথ ছাট।'

'আপনার হচ্ছে না ?'

'না, আমি আমার সব সেন্টিমেন্ট মেরে ফেলেছি। পৃথিবীটা

আমার কাছে একটা ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট ওয়ার্লড। টুলস অ্যাণ্ড ইমপ্লিমেণ্টসে ভরা। আই হ্যাভ লস্ট আ স্ক্রুড্রাইভার, আই উইল গেট অ্যানাদার স্ক্রুড্রাইভার।'

'ও!' অনিল কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা হয়ে গেছে। এ আবার সম্পূর্ণ অন্য ধাতু। অন্য শব্দ।

মঞ্জুলা বিরাট একটা বৃত্ত তৈরি করে পায়ের ওপর থেকে পা নামিয়ে উঠে দাঁড়াল। বেশ কাটা গলায় বললে, 'ইও লুক সিলি। ডোণ্ট ওয়েস্ট মাই টাইম অ্যাণ্ড ইয়োর টাইম।'

ঘাড়ধাক্কা খেয়ে অনিল খাঁ খাঁ ডিকসন লেনে এসে দাঁড়াল। ভাদ্রুয়া রোদে পৃথিবী জ্বলছে। শরীর জ্বলছে। মেয়ে মাকড়সার গল্প শুনেছে। একটা বিশেষ সময়ের পরে পুরুষ মাকড়সাকে চুষে খেয়ে ফেলে। ভীমরুল দেখছে। হলুদ বোলতাকে পায়ে চেপে ধরে মাথায় হুল ফোটাচ্ছে। কড়কড় শব্দে। ঘিলু চুষে নিয়ে উড়ে যাবার পর, বোলতাটা পড়ে পড়ে অনেকক্ষণ ছটফট করতে করতে মরে যায়। অনিল বাড়িটার দিকে পেছন ফিরে একবার তাকাল। মনে হল চাবুকের শব্দ শুনতে পাচ্ছে।

এবার তাহলে কি হবে? দীর্ঘ অপেক্ষা। তুই ফিরে আয়। শেষ আর একবার দেখতে হবে মিসিং পার্সনস স্কোয়াডে। তারা কিছু তো একটা করবেই। অনিল একটা ট্রামে উঠে পড়ল। নিজেকে কেমন যেন অসংলগ্ন আর বিক্ষিপ্ত লাগছে। দড়ির বাঁধন খুলে মাঝ রাস্তায় জিনিসপত্র ছড়িয়ে পড়লে যেমন লাগে।

অনিল সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী বললেন, 'এসেছেন ভাল করেছেন, এই ছবিগুলো দেখুন তো।'

অনিলের হাতে একগাদা ফটোগ্রাফ। ধুলোপড়া চায়ের দাগ লাগা টেবিল। টিনের চেয়ার। অল্প আলো। অনিল একের পর এক অনাসক্ত মৃত মুখের ছবি দেখে চলেছে। যেমন তোলার কায়দা তেমন প্রিণ্ট। দায়সারা কাজ। তবু দেখলে চমকে উঠতে হয়। যন্ত্রণার

মৃত্যু নিয়ে যাবার আগে পদাঘাত করে গেছে। ঠেলে আসা ভাষাহীন নিমীলিত চোখ। ঈষৎ ফাঁক হয়ে থাকা ঠোঁট। গভীর সব ক্ষতচিহ্ন। এদেরই হয়ত কত বোলচাল ছিল। কত অহঙ্কার ছিল, পাপ ছিল! আর কোনো দিন জেগে উঠবে না। অলিখিত ইতিহাস সরকারী ফাইলে চাপা পড়ে রইল। এসব ছবি দেখা যায় না। মনে ভূমিকম্প হয়। বিশ্বাস, অবিশ্বাস সব ভেঙে ভেঙে পড়ে যায়। একটা মুখের সঙ্গে রঞ্জনের মুখের ভীষণ মিল; কিন্তু বয়েসটা বেশি। গলার কাছে গভীর ক্ষত। অনিল খুব ভাল করে দেখল। না রঞ্জন নয়।

ছবির প্যাকেট ফিরিয়ে দিয়ে সে আবার পথে এসে দাঁড়াল। চড়া আলোয় নিজের হাত পা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল বারে বারে। মানুষের ভেতরটা যত শক্ত, বাইরেটা তত নয়। বড় নরম, বড় অপলকা। একটু ঘষা লাগলে ছড়ে যায়। এক কোপে কণ্ঠনালী দু ফাঁক হয়ে প্রাণবায়ু সরে পড়ে। অথচ ভেতরে কত দাপট, কত সব ইচ্ছা অনিচ্ছা। কত বদমায়েসি। ওই তো, শেষকালে ওই ছবির মত মরামাছের চোখ ঝুলে পড়া ঠোঁট। মুখ বিস্বাদ, মন ভারাক্রান্ত। উঁচু টিলায় দাঁড়িয়ে দাম্ভিক সেনানায়ক দেখছে, যুদ্ধে হার হয়েছে। ছত্রাকার রণক্ষেত্র।

বিষ দিয়েই বিষ মারতে হবে।

মায়া! নামটা বেশ। সবই, তো মায়া। বর্ণমালায় আর কয়েকটা অক্ষর এগোলেই সায়া। অনিল মনে মনে হাসল। হয় না। কুকুরের বাঁকা ন্যাজ সোজা হয় না। দৈত্যেও পারবে না, দেবতাতেও পারবে না। রক্ত বেরোলেও উট সেই কাঁটা গাছ খাবেই। কাক যত চেষ্টাই করুক গলা দিয়ে কোকিলের সুর বেরোবে? ভেতর থেকে যাকে যেদিকে ঠেলবে তাকে সেদিকে যেতেই হবে। মঞ্জুলার কাছে রঞ্জন কেন? মঞ্জুলা তো তারই বিষয়। রঞ্জন? সে তো ছোট অনিল। ছোট হয়েও বড়। তাকে মেরে বেরিয়ে গেছে।

মায়া-বাঁধন কেটে অনিল ন'টা নাগাদ উঠে পড়ল। নখর দন্তহীন ব্যাঘ্র আর কত খাবে। থাকত রঞ্জনের মত একটা শরীর? ভেতরের কলকব্জার অর্ধেক অচল। ঘড়ির মত অবস্থা। ছোটোখাটো মেকানিকে আর হবে না। খোদ কম্পানিতে পাঠাতে হবে।

অনিল যখন রিকশা থেকে বাড়ির সামনে নামছে, মাধবী তখন দেখেই বুঝল, আজকের অনিল কালকের অনিল নয়, চিরকালের অনিল। নাকটা লাল। চোখে সন্দেহের লাল নজর। বাতাসে ভেসে আসা গন্ধ। তবে একটু কম। ভেতরটা বেরিয়ে পড়লেও সবটা বেরোয়নি। অনিল মাধবীর কাঁধে ভারী ডান হাতটা রাখল। হাতের বড় বড় লোম গলার কাছে লাগছে। সমুদ্রের ফেনার মত আলো ছড়ানো, চাপা বারান্দায় মাধবীর পাশে পাশে পা ঘষে ঘষে অনিল হেঁটে চলেছে। ডান পাশেই ঘরের দরজা। একটা পা তুলে ঢুকতে গিয়েও কি ভেবে ঢুকল না, টাল খেয়ে পেছিয়ে এল। বাতাস লাগা গোলপাতার মত দুলতে দুলতে মাধবীর চিবুকের তলায় একটা আঙুল রেখে মুখটা সামান্য ওপর দিকে তুলে ধরে জড়ানো গলায় বললে, 'ভেবো না, বুঝলে, ভেবো না। আসার হলে সে ফিরে আসবে। আর যদি না আসে তা হলে আসবে না। আমি কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে এসেছি। কাল সকালে তোমার ছেলের ছবি কাগজে বেরোবে। রঞ্জন, ফিরে আয়।'

সকালের কাগজে দুইয়ের পাতায় বিজ্ঞাপন বেরিয়েছে। ওপরে রঞ্জনের ছবি। তলায় লেখা, 'অনিল, ফিরে আয় তোর মা শয্যাশায়ী। টাকার দরকার থাকলে লিখে জানা। ফিরে এসে মাকে বাঁচা। 'তোর বিরুদ্ধে আমাদের কোনও অভিযোগ নেই।'

মাংস

অরিন্দমের হঠাৎ মনে হলো শরীরটা কেমন ম্যাজ ম্যাজ করছে। মাথাটা ভার ভার। রগের পাশের শিরা দুটো টিপটিপ করছে। অফিসে তেমন কোন কাজ ছিল না। অরিন্দম ভাবলে তাড়াতাড়ি বাড়ি গিয়ে একটু বিশ্রাম করবে। চা-টা খাবে। একটু গল্প-গুজব করবে, রেডিও শুনবে। বই পড়বে। বৌয়ের সঙ্গে গল্প-টল্প করবে। অর্থাৎ বিকেল আর সন্ধেটা একটু মজায় কাটাবে। শীতের সময়টায় অফিসের বড় কর্তারা সাধারণত ট্যুর কিংবা নানা ধরনের পার্টি নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। সুতরাং তিনটে নাগাদ অরবিন্দ তার দপ্তর বন্ধ করে উঠে পড়লো।

অফিসপাড়ার বিশাল বিশাল বাড়ির আড়ালে বিদায়ী সূর্য তখন মুখ লুকিয়েছে। রাস্তার ছায়া নামলেও বড় বড় গাছের মাথায় তখন সূর্য মাখামাখি হয়ে আছে। বেশ ভালো লাগছিল অরিন্দমের। পশ্চিম থেকে একটা হিমেল হাওয়ায় রাতে যে আরো শীত পড়বে তারই জানান দিচ্ছিল। অরিন্দম চাদরটাকে ভালো করে গলায় জড়িয়ে নিল। বলা যায় না ঠাণ্ডা লেগে জ্বর টর হয়ে গেলেই মুশকিল।

বাসে বা ট্রামে তেমন ভিড় নেই। মিনি বাস একের পর এক লাইনে দাঁড়াচ্ছে গন্তব্যস্থল হেঁকে যাত্রী জড়ো করছে। অরিন্দম একটু আরামে এবং তাড়াতাড়ি যাবার জন্য এক টাকা তিরিশ পয়সার একটা ঝুঁকি নিয়ে ফেললো। মিনি বাসে উঠে একেবারে শেষের দিকে একটা কোণের আসনে বসে পড়লো। অরিন্দম একটু সৌখিন মানুষ। সাজে পোশাকে ছিমছাম পরিপাটি। খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারেও বেশ ভোজনবিলাসী।

বাড়ির কাছাকাছি বাস থেকে নেমে তার মনে হলো একটু মাংস কিনে নিলে মন্দ হয় না। সকালের খাওয়াটা তেমন জুতসই হয়নি। রাতের দিকে হিটারে প্রেসার কুকার চাপিয়ে সে নিজেই খাসা একটা স্টু বানাবে। গাজর থাকবে, লম্বা লম্বা আলু, বীনস্, বাঁধাকপি আর নামাবার সময় ছোট এলাচ। গন্ধ আর স্বাদ দুটোই যেন মুহূর্তে অনুভব করতে পারলো! আজকের রাতটা আহারে, বিশ্রামে, গল্পে-গানে একেবারে আরব্য রজনীর মতো হয়ে উঠবে।

অরিন্দমের মাংস কেনার একটা আলাদা ধরন আছে। বিশেষ কোন একটি অংশ থেকে সে একেবারে বেশ খানিকটা তুলে নেয়। তারপর নিজের সুবিধেমতো সহজ করে নিজস্ব ঢংয়ে রাঁধে। যে কোন দোকানে অরিন্দমের বেশ খাতির। দরদস্তুরের বালাই নেই। সেরা জিনিস চাই। পরিমাণে বেশি চাই।

ব্যাগ ছিল না। রুমালেই মাংসের টুকরোটা বেঁধে নিয়ে, এক-রাউণ্ড রুটি বগলদাবা করে অরিন্দম একটা সাইকেল রিক্শায় উঠে বসলো। শরীরটা আর তেমন খারাপ লাগছে না। মাথায় নানা পরিকল্পনার ভিড়। প্রথমত অপর্ণাকে চমকে দেবে, দ্বিতীয়ত জমিয়ে রাঁধাবে তারপর সকাল সকাল বিছানায় আরাম করে শুয়ে শুয়ে হেডলি চেজ পড়বে!

রিক্শার ভাড়া মিটিয়ে বাড়ি ঢুকে অরিন্দম অবাক হয়ে গেল। সদর দরজায় বিশাল একটা তালা ঝুলছে, কেউ কোথাও নেই। দোর, তালা সব বন্ধ। সামনের ফ্লাওয়ার বেডে নিঃসঙ্গ কয়েকটা কসমস উত্তুরে শীতের হাওয়ায় কাঁপছে।

অপর্ণা কোথায় গেল, কোথায় যেতে পারে? না বলে বিনা অনুমতিতে তো সে কোথাও যায় না। আশে পাশে কোন বাড়িতে গেছে হয়তো সময় কাটছিল না বলে। নাকি কোন কেনাকাটায়··· কিন্তু কেনার কি থাকতে পারে? বাড়িতে সব কিছুই তো মজুত। অরিন্দম তো কৃপণ নয়। সব কিছুই বেশি বেশি কিনে রাখে।

আশ্চর্য ঘটনা। অবশ্য কোনদিনই এতো তাড়াতাড়ি ফেরে না। তাহলে রোজই কি অপর্ণা এইভাবে তালা ঝুলিয়ে দুপুরের অবসরের সদ্ব্যবহার করে? সিনেমায় যায়। না কি আইবুড়ো বেলার তার বন্ধু-বান্ধবের বাড়ি···

'তুমি ভীষণ সুড়সুড়ি দাও' অপর্ণার শরীরটা এঁকে বেঁকে গেল। বিছানার চাদরে ভাঁজ পড়লো।

কেন সুড়সুড়ি তোমার ভালো লাগে না, তোমার কর্ত্তা বুঝি সুড়সুড়ি দিতে জানে না! পার্থ তার লোমশ বুকে অপর্ণার মুখটা চেপে ধরে তার শরীরের এখানে ওখানে যেখানে সেখানে খুশিমতো হাত বোলাচ্ছিল। মধ্য কলকাতার নির্জন একটা ফ্ল্যাটবাড়ির চারদিকে ভারি পর্দা ঝোলানো। বন্ধ দরজা, প্রায় অন্ধকার একটা ঘরে তখন পরকীয়া প্রেমের লীলা চলছে।

নায়ক পার্থ একটা বিলিতি ওষুধ কোম্পানির সেলস্ রিপ্রেজেণ্টেটিভ। অপর্ণার এক সময়কার সহপাঠী, প্রেমিক। ছাত্রজীবনে বহুদিন তারা পাশাপাশি ইডেনে, আউটরামে, বোটানিক্সে কাটিয়েছে। অপর্ণা আদর খেতে খেতে অনেকটা বেড়ালের মতো ঘড়ঘড়ে গলায় বলল, কি করছো, কামড়াচ্ছো কেন? দাগ বসে যাচ্ছে না! আমার ভদ্রলোকটি দেখলে কি হবে বল তো!

—কি আবার হবে? তুমি বলে দিও অ্যালার্জি হয়েছে।

—ঠিক বলেছো। লোকটা একটু বুদ্ধু টাইপের। ঠিক বিশ্বাস করে নিয়ে কাঁড়ি কাঁড়ি ওষুধ কিনে আনবে।

—বিয়ের আগে কখনো মেয়েছেলে দেখেনি বোধ হয়। বলতে বলতে পার্থ হো হো করে হাসলো।

অপর্ণা একটু ভেবে বললো, 'যদি আমার মাতৃত্ব দেখা দেয়!'

পার্থ নিশ্চিন্ত মনে বললো, 'তাতে কি? তোমার কর্তার ঘাড়ে দোষ চাপাবে। যাকে বলে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে।'

'এবার আমি যাই পার্থ। ওর আসার সময় হয়েছে। .গুড হাউস ওয়াইফের কর্তব্য এবার করতে হবে।'

পার্থর ঘরের টাইমিং ঘড়িতে ঢং ঢং করে ছটা বাজলো।

অপর্ণা গেট খুলে দেখলো, একটা কালো কুকুর বড় একখণ্ড মাংসের টুকরো আয়েস করে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছে। কিছু দূরে পড়ে আছে ছিন্নভিন্ন রক্তমাখা একটা রুমাল। ইস্ কার মাংস, কিসের মাংস ? কুকুরটা ভীষণ আন্‌সিভিলাইজড্ হয়ে গেছে তো! অপর্ণা জোরে ধমক দিল, রেক্স, কি হচ্ছে কি ? খেতে পাস না ? কোথা থেকে মরা জন্তুর মাংস এনেছিস ?

অপর্ণা একটা গাছের ডাল ভেঙে রেক্সকে শাসন করতে গেল। কুকুর কিন্তু শুনলো না, রাগে একটা চাপা গর্জন করে তার অবাধ্যতা প্রকাশ করলো। অপর্ণা গাছের ডাল দিয়ে রক্তমাখা ছেঁড়া রুমালটা কায়দা করে পাঁচিল টপকে পাশের মাঠে ফেলে দিল। একবারও দেখল না রুমালটার কোণে তারই হাতের কাজ করা সুতো দিয়ে লেখা আছে একটি ছোট্ট 'এ'।

গভীর রাত। অরিন্দম আর আর অপর্ণা পাশাপাশি শুয়ে আছে। অপর্ণা ভাবছে রেক্সটাকে কাল থেকে শাস্তি দিতে হবে। দুদিন খাওয়া বন্ধ করতে হবে। রাস্তা থেকে মাংসের টুকরো মুখে করে এনে খেয়েছে। চাবুক টাবুক মারতে হবে। আর অরিন্দম ভাবছে কিছুতেই আজ আর অপর্ণাকে স্পর্শ করবে না। অপর্ণার গোড়ালি ফেটেছে। ল্যানোলিন ক্রিম এনেছিল, নিজ হাতে মাখিয়ে দেবে বলে। তারপর ধীরে ধীরে ওপর দিকে উঠবে। না সে সব কিছুই সে আজ করবে না।

আর একটি ফ্ল্যাটে ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে আছে পার্থ। মুখে তার মৃদু হাসি। মেয়েরা কি বোকা, কি মূর্খ। আমি ডন জুয়ান, বিয়ের কি প্রয়োজন, মাংস তো সব দোকানেই ঝোলে, সব রকমের মাংস। আগলি রাং, পিছলি রাং, শিনা, গর্দান।

পয়সা

হঠাৎ আমার প্রচুর পয়সা হল। কি করে হল তা বলব না। তবে হল। পয়সা হবার সঙ্গে সঙ্গে আমার চেহারাও পাল্টে গেছে। সামনের চুল পাতলা হয়ে টাক বেরিয়েছে। সামনে ভুঁড়ি নেমেছে। দু' চোখের কোলে দুটো ব্যাগ তৈরি হয়েছে। মেজাজটাও ইদানীং বেশ চড়েছে! পয়সা হলে যা হয় আর কি!

বড়লোকদের চালচলন কেমন হয় আমার জানা নেই। বিনয়ী বড়লোক আমি দেখেছি। এঁরা হলেন সাতপুরুষে বড়লোক। ভিটেয় ঘুঘু চরলেও লোকে পুরনো আমলের বড়লোক বলে খাতির করে। তার মানে, কবে ঘি খেয়েছেন, সেই গন্ধ এখনও হাতে লেগে আছে। আমি একপুরুষে হঠাৎ বড়লোক। আমার কি হওয়া উচিত জানা নেই। তবে শুনেছি বড়লোকেরা বিকেলের দিকে গাড়ি চড়ে হাওয়া খেতে বেরোয়। হাতে ছড়ি। সোজা পা ফেলে দ্রুত বেড়িয়ে বেড়াতে হয়। হজমশক্তিও বাড়ে, তাছাড়া সাধারণ মানুষ বুঝতে পারে। কি বুঝতে পারে! খাবার জিনিস প্রচুর, হজমশক্তি একটু কম। হাঁটার ধরন দেখে বুঝতে পারবে, শরীরে শক্তি রাখে, দৃপ্ত ভঙ্গি। কারণ অপুষ্টিতে ভোগে না, কারণ পয়সাওলা। পয়সাই জগৎ। আমি তাই জগৎপিতা!

ড্রাইভার গাড়ি থামাও।

স্ট্র্যাণ্ডের বাঁ পাশে ময়দান ঘেঁসে গাড়ি দাঁড়াল। বাঃ, চমৎকার বিকেল। পশ্চিমে সূর্য নেমে পড়েছে। আকাশ লালে লাল।

অজয়, চমৎকার বিকেল, কি বল? অজয় আমার ড্রাইভার।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

আজ্ঞে হ্যাঁ না, আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার। কবে তোমার অভ্যাস হবে!

হয়ে যাবে স্যার। আগে যাঁদের ড্রাইভার ছিলুম তাঁদের তো স্যার বলতে হত না। লাস্ট যাঁর গাড়ি চালাতুম তাঁকে বলতুম দামুদা।

দামুদা! যাচ্ছেতাই নাম।

নামে কি আসে যায় স্যার! পয়সা তো আর নাম দেখে আসে না।

ছেলেটা যেন দার্শনিক! বয়েস কম হলে কি হবে, অনেক ঘাটের জল খেয়েছে। সত্যিই তো নামে কি যায় আসে। এই তো আমার নাম পাঁচুসুন্দর। অজয়ের চেয়ে অনেক বিশ্রী নাম। অথচ গাড়ির মালিক আমি, চালায় অজয়।

আমার নিয়ম হল, প্রথমে বেশ কিছুক্ষণ গাড়িতে বসে থাকা। চারপাশে তাকিয়ে দেখা। তারপর দরজা খুলে নেমে, গঙ্গার ধারের বাঁধানো রাস্তায় পায়চারি। যতক্ষণ গাড়ি থেকে না নামছি ততক্ষণ অজয়ের সঙ্গে বকর বকর করি। বড়লোকদের চালচলন অজয় জানে ভালো। আমি তো সগু বড়লোক। টাকাটাই হয়েছে, বড়লোকী চালচলন এখনও শেখার অনেক বাকি। অজয়ের সঙ্গে তাই মাঝে মধ্যে কথা হয়। এই কথার সময় অজয় আর আমার গাড়ির ড্রাইভার নয় আমারও ড্রাইভার। আমার শিক্ষক।

কাঁচা বয়েসের মেয়েরা কাঁচা বয়েসের ছেলেদের সঙ্গে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছে। আইসক্রিম চলছে, ফুচকা চলছে, ভেলপুরি চলছে, কোলড্ ড্রিঙ্কস চলছে।

অজয়, কে যেন বলেছিল, কলকাতার হাওয়ায় টাকা উড়ছে?

আজ্ঞে স্যার হরিরাম গোয়েঙ্কা।

সে আবার কে? অজয়কে কখনও ঠকানো যায় না। যা জিজ্ঞেস করব, সঙ্গে সঙ্গে উত্তর। কোন্‌টা ভুল কোনটা ঠিক বলা শক্ত। চাকরির জন্যে ইন্টারভিউ দিতে দিতে অজয় পৃথিবীর প্রায় সব কিছু জেনে ফেলেছে। বরাতে চাকরি অবশ্য জুটল না। শেষে ড্রাইভিং শিখে ড্রাইভারি।

মেয়ে দেখছিলুম, মিথ্যে বলব না, মেয়েই দেখছিলুম। পয়সা যখন ছিল না তখন হাঁ করে আকাশ, পাখি, গাছপালা চন্দ্র, সূর্য অনেক দেখেছি। এখন পয়সার সঙ্গে সঙ্গে দুটো 'ম' যেন হামাগুড়ি দিয়ে মনে আসতে চাইছে। আহা, যেন দুটি বালগোপাল, হামা দিতে দিতে আসছে। হাতে নাড়ু।

বুঝলে অজয়, মাঝে মাঝে মনে হয় অ্যারিস্টটল ওনাসিস হয়ে যাই। জীবনটাকে একটু ভোগ করে দেখি।

দেখুন না স্যার! ক্ষতি কি!

ওনাসিসের নাম শুনেছ?

খুব শুনেছি স্যার। জ্যাকলিন কেনেডি যাঁকে বিয়ে করেছিলেন।

তুমি দেখছি সব জানো? কি বল?

কি বলব স্যার?

আমার সেকেলে বৌটাকে বাতিল করতে হবে। ঠিক যেন বড়াই বুড়ি।

বাতিল করবেন কেন? বউদি তো ঘরে থাকবেন। আপনি ফুর্তি করবেন বাইরে। টাকা দিয়ে তো আর স্নেহ ভালোবাসা কিনতে পারবেন না। স্নেহ ভালোবাসা সেকেলে জিনিস, ওসব সাবেককালের মহিলারাই দিতে জানেন।

ও কথা কেন বলছ? ওই তো সব জোড়ায় জোড়ায় কেমন ঘুরছে লাল লাল ঠোঁটে আইসক্রিম চুষছে।

হ্যাঁ চুষছে। ওকে চোষাই বলে। এরপর কাঠিটা ছুঁড়ে রাস্তায় ফেলে দেবে। আজ প্রশান্তদাকে, কাল অসীমদাকে। ওর মধ্যে ক'টা বউ ঘরে ওঠে দেখুন! ঘুরতে ঘুরতে যৌবন একদিন চলে যাবে। মেক-আপের যৌবনে আরও কিছুদিন চলবে, তারপর ভোঁ ভোঁ।

মেয়েদের ওপর তোমার দেখছি ভীষণ রাগ। কারণটা কি?

আজ্ঞে, এ বাজারে চাকরি আর বউ দুটোই পাওয়া যায় না।

যদ্দিন টাকা ওড়াতে পারবেন, তদ্দিন পরীরা উড়ে উড়ে আসবে। যেই আপনার ট্যাঁক গড়ের মাঠ হয়ে যাবে অমনি সব হাওয়া।

নাঃ, এইবার একটু বাইরে বেরিয়ে হাওয়া খাওয়া যাক। অনেক জ্ঞানের কথা শোনা গেল।

আচ্ছা অজয়, তুমি কখনও রেস খেলেছ ?

আজ্ঞে না। তবে রেসের মাঠে গেছি। বাইরে থেকে দেখেছি, ঘোড়া ছুটছে। এই সময় রেস হয় ?

হ্যাঁ, এখন মনসুন রেস।

নেমে পড়লুম গাড়ি থেকে। একপাশে নরম ঘাস, অন্যপাশে পিচের রাস্তা। দূরে গঙ্গা, জাহাজ ভাসছে। মাস্তুলে দেশ বিদেশের পতাকা। পয়সা হবার পর থেকেই লক্ষ করছি, মনটা মাঝে মাঝেই কেমন যেন ভাবুক ভাবুক হয়ে যায়। এতকাল ছিল অন্নচিন্তা চমৎকারা, সেই চিন্তা থেকে মন যেই সরে এসেছে, হয়ে গেছি উদাসীবাবা। ভোগের বয়েসে ভোগ হল না, এই বয়েসে আর কি হবে। এই তো মিহি ধুতি, আদ্দির পাঞ্জাবি পরে, চুল ফিরিয়ে মেজাজে ঘুরছি, কেউ তাকাচ্ছে আমার দিকে ? কেউ না। ওই তো সিল্কের শাড়ি পরে নধর একটি মেয়ে চোয়াড়ে একটি ছেলের বগলদাবা হয়ে আসছে। নিজেদের ভাবেই মশগুল। যৌবন যৌবনকেই চায়, প্রৌঢ়ে আর কদর কি।

এখন মেয়েছেলে চাইলে মুখ নিচু করে সেই পাড়ায় যেতে হবে ! এখন চরিত্রহীন না হলে ভোগ হবে না। অজয় যত বাজে কথা বলে। কোনদিন বলে বসবে, পয়সা হলে টাকেও চুল গজায় ! আসলে ও ব্যাটা একটা চামচা। মন জোগানো কথা বলে।

বেড়াতে বেড়াতে একটা আইসক্রিম স্টলের কাছে এসে পড়েছি। যুবক হলে ঝট করে একটা খাওয়া যেত। এখন খেতে গেলে কেউ হয়তো গ্রাহ্যই করবে না, আমার নিজের মনটাই হেসে উঠবে, বুড়ো বয়সে ঘোড়া রোগ ! ভয়ও আছে, গলা-খুসখুস কাশি।

আবার ফিরে এলুম নিজের গাড়িতে। অজয় বসে ছিল ঘাসের ওপর। মনটা যেন বিষণ্ণ। হবেই তো। ওই বয়সের ছেলে, জীবনে কত সাধ আহ্লাদ! গাড়ি চালিয়ে সামান্য ক'টাকাই বা পায়! আমাকে দেখে উঠতে যাচ্ছিল, বললুম, বস বস, আমিও তোমার পাশে একটু বসি। ওদিকটায় একা একা তেমন ভালো লাগলো না।

অজয়ের পাশে বসতেই, সামনের আকাশটা নীচে নেমে গেল। পিছন দিকে দুটি শিশু দৌড়াদৌড়ি করছে।

আচ্ছা অজয়, তোমাকে যদি এখন একলাখ টাকা কেউ দিয়ে দেয়, তুমি কি করবে?

ব্যাঙ্কে ফিক্সড্ ডিপোজিট করে দিয়ে যেমন গাড়ি চালাচ্ছি তেমন চালাব।

সে কি? আর কিছু করবে না! প্রেম, ভালবাসা, ফুর্তি?

আজ্ঞে না, এক রাত কা আমির হয়ে পরের দিনই ফকির হয়ে রাস্তায় ঘুরতে চাই না। ওটা তো আমার রোজগার নয়। আমার রোজগারের ক্ষমতায় যেমন আছি তেমনই থাকব। ডাল ভাত, নুন ভাত, যেমন জোটে জুটবে।

টাকাটা তো ইনভেস্ট করতে পারো, ব্যবসায়, কি বাড়িতে, এক লাখ থেকে দু' লাখ, দুই থেকে তিন, তিন থেকে চার…।

আজ্ঞে না, সে মুরোদ আমার নেই। নিজেকে নিজে যত ভালো করে চিনি অত ভাল করে আর তো কেউ চিনবে না। নিজের দৌড় নিজে জেনে গেছি। বড়লোক হবার জন্যে আমি জন্মাইনি।

আমি তো হয়েছি! আমারও তো এক সময় দিন চলত না!

আপনি বরাতে হয়েছেন, কপালে ছিল।

এ সব মানো?

খুব মানি।

দুই

বাড়ির সামনে গাড়ি থেকে নামতে নামতে নামতে শুনছি গানের সুর ভেসে আসছে। মেয়ের বায়নায় একটা স্টিরিও রেকর্ড প্লেয়ার কিনে মহা বিপদ হয়েছে। আমার বিপদ পাড়ার আর পাঁচজনেরও বিপদ। কান ঝালাপালা। একে তো বিশাল এক বাড়ি হাঁকিয়ে অনেকের আলো বাতাস কেড়ে নিয়েছি।

কেড়ে না নিলে বড়লোক হওয়া যায় না। যতদিন চেয়েছি কিছুই পাইনি।

ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে মনে হল, অজয়টা ভীষণ ভীতু, ম্যাদামারা বাঙালী। বরাত মেনে স্টিয়ারিং ধরেই জীবনটা কাটাতে চায়। মনে মনে অদৃশ্য অজয়কে উপদেশ দিলুম, ওহে যুবক! জীবনে উচ্চাশা না থাকলে কিছুই পাওয়া যায় না! আমার পায়ের জুতো জোড়া সমঝদারের মতো মচমচ শব্দ করছে। সিঁড়ির ঝকঝকে মসৃণ হাতলে হাত ঘষতে ঘষতে উঠছি। চারদিক ঝলমল করছে। নতুন বাড়ি, নতুন মোজাইক, নতুন ফার্নিচার। পয়সার একটা আলাদা জেল্লা আছে। জেল্লা সহ্য হয়, শব্দটা সহ্য হয় না। যত ওপরে উঠেছি গানের আওয়াজে কানের পর্দা ফেটে যাবার জোগাড়। ওরে গান থামা! থামা বললেই কি থামবে! আমার পয়সা এদের স্ফূর্তিতে জোয়ার এনেছে।

বাপি! তুমি এসে গেছ!

সামনেই আমার মেয়ে। বেশ বড়সড় হয়েছে। কি একটা পরেছে, আরও যেন বড় দেখাচ্ছে। নাঃ, এবার বিয়ে দিতেই হবে। আর ধরে রাখা যাবে না। এই বয়েসটা বড় ভীষণ। ওই গঙ্গার ধারে দেখে এলুম যে একটু আগে। গালে দুটো একটা ব্রণ বেরিয়েছে।

তোমার গাড়িটা নিয়ে আমরা একটু বেরোচ্ছি।

অ্যাঁ, এখন বেরোবি! অজয়কে এখন ছুটি দোব ভেবেছিলুম। ও-ও তো একটা মানুষ। কোথায় যাবি?

আমরা তিন বন্ধু একটু মার্কেটের দিকে যাব।

অজয় রাগ করবে না?

সে আমরা বুঝব।

সমান বয়েস, সমান চেহারার তিনটি মেয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগল। মিষ্টি গন্ধ উড়ছে হাওয়ায়। ফুরফুরে চুল উড়ছে। পোশাকের খসখস শব্দ।

আমি উঠছি। ঘুরে ঘুরে ক্রমশই ওপরে উঠছি। ওরা নেমে যাচ্ছে নীচে। দু'পক্ষের দূরত্ব বাড়ছে। বাড়বেই তো। আরও বাড়বে। ওরা এক জগতের, আমি আর এক জগতের।

ঘরে এসে দেখি আমার গৃহিণী জড়ভরতের মতো বসে আছে।

কি গো, এই ভাবে বসে?

কি-ই করব?

সত্যিই তো, কি আর করবে! কেন, টি ভি দেখ। গান, ফিল্ম।

দূর, ভালো লাগে না। ও সব আমি তেমন বুঝি না।

তা হলে কিছু খাও।

কত খাব! হজম হয় না।

তা হলে এসো দুজনে ঘুরে ঘুরে নাচি।

সে বয়স আর নেই।

বেশ, তাহলে এসো দুজনে ঝগড়া করি।

কি নিয়ে ঝগড়া করব? কোন অভাবই তো আর নেই! তখন ঝগড়া, হত এটা ওটা নিয়ে, এখন কি নিয়ে হবে?

তাও তো বটে। তা হলে এসো কীর্তন করি, সাঁই ভজন।

ভক্তিও নেই তেমন, গলাও নেই।

তা হলে ঘুমোও, ওভাবে পুঁটলির মতো বসে থেক না।

কত ঘুমোব। ঘুম আর আসে না।

সে কি! ঘুমও আসে না?

না। তুমি এবার মেয়েটার বিয়ের ব্যবস্থা কর। ওর চালচলন তেমন সুবিধের মনে হচ্ছে না।

যাক, তাহলে ভাববার মতো একটা দুশ্চিন্তা পাওয়া গেছে। আমি অবশ্য সুখের মধ্যে একটা দুঃখ খুঁজে পেয়েছি।

দুঃখ!

হ্যাঁ দুঃখ। একটা ছেলে না থাকার দুঃখ।

আর কি হবে। সময় চলে গেছে।

হ্যাঁ, সময় চলে গেছে। সব চুকে-বুকে গেছে। আগুন নিভে গেছে, পড়ে আছে ছাই। চললে কোথায়?

চা খাবে তো—

হ্যাঁ, চা—চা খেতে হবে। তার জন্যে যেতে হবে কেন?

বলে আসি।

ঠিক ঠিক। বেশ, বলেই চলে এসো। আমি আবার একলা থাকতে পারি না। শেষের সময় তুমি কাছে থাকবে তো!

ও সব অলুক্ষণে কথা ভর সন্ধেবেলা নাই বা বললে!

মনে হল তাই বললুম।

মনে আর আসতে দিও না।

মনকে কে বাঁধবে! বাঃ, বরোন্দায় বেশ হাওয়া দিচ্ছে। অনেকটা উঁচুতে উঠেছি। অন্য সব বাড়ির ছাদের মাথা দেখা যাচ্ছে। রাস্তা দিয়ে লোক যাচ্ছে। আলোর বিন্দু খইয়ের মতো ছড়িয়ে আছে। আমার একটাই মাত্র মেয়ে, নাম পদ্মা। অনেক ছেলে-মেয়ে আনা যেত। তখন তো উপায় ছিল। বেহিসাবী হলেও মরতে হত।

পদ্মা কি প্রেম করছে? ছেলে-টেলে ধরছে নাকি! কে বলতে পারে? অজয় পারে। ওর সঙ্গেই তো ঘোরে। অজয় আজ আমাকে অবাক করে দিয়েছে। বয়স কম, কিন্তু মনের কি সাঙ্ঘাতিক জোর। এ রকম ছেলে লাখে একটা মেলে। একালের ছেলেদের কোন বদ

খেয়ালই ওর মধ্যে নেই।

পদ্মা ফিরে এলো। গুন গুন করে গাইতে গাইতে সিঁড়ি বেয়ে পা ঘষে উঠছে। নেশা করেছে নাকি? টলছে মাতালের মতো। মাঝে মাঝে সিঁড়ির রেলিং আঁকড়ে ধরছে দু'হাতে।

পদ্মা!

বাপ্‌বা, তুমি আমার বাপ্‌বা, তাই তো! হ্যাঁগো, তুমিই আমার বাবা?

পদ্মা আমার বুকে মুখ গুঁজে দু'হাতে গলা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। তুমি জর্জকে কিছু বলতে পারো না বাবা!

জর্জ! সে আবার কে?

একটা ছেলে। আমাকে পেতনী বলেছে। আমি পেতনী!

আমার বুক থেকে মুখ তুলে পদ্মা দু'হাত পিছিয়ে গেল। মুখটা জবাফুলের মতো লাল টকটকে। চারপাশে চুল উড়ছে।

তুমি দেখ তো আমি কি পেতনী, সত্যিই আমি পেতনী?

পদ্মা একে একে জামা খুলছে। শার্ট খুলে ফেলেছে। জিন্‌স খোলার জন্য কাঁপা কাঁপা হাতে ফাস্টনারের মুখ খুঁজছে। একটানে সব খুলে ফেলল। শুধু প্যান্টি আর ব্রা পরে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আমার একমাত্র মেয়ে পদ্মা। যখন ও এতটুকু শিশু, তখন কোলে করে কত নাচিয়ে নাচিয়ে ঘুম পাড়িয়েছি। কাঁথা পাল্টে দিয়েছি। সেই পদ্মা আমার সামনে, আমাকে বিচারকের ভূমিকা নিতে হবে। এ শরীর আমার অচেনা, এর ভেতরে যে মন বাসা বেঁধেছে সে আরও অচেনা। পদ্মা দু'হাত দু' কোমরে রেখে পা দুটোকে ফাঁক করে বললে, কি, কিছু বলছ না কেন বাবা? আমি কি পেতনী! আর রুমকি পেতনী নয়!

কে রুমকি, কে জর্জ! আমার সামনে যে মহিলা দাঁড়িয়ে সে-ই বা কে! আমার ভীষণ ভয় করছে। এই শরীরটাকে এখন ধরে ধরে শোবার ঘরে নিয়ে যেতে হবে। গায়ে হাত দিতে সঙ্কোচ হচ্ছে।

তাকাতেই পারছি না ভালো করে।

পদ্মা ঘরে চল।

না-আ, আমায় অপমান করেছে। বিচার চাই, বিচার।

তুমি ঘরে চল।

পদ্মা টলতে টলতে আমার দিকে এগিয়ে আসছে। আমি ভয়ে পিছোতে শুরু করেছি। এ আমার মেয়ে নয়, অপ্রকৃতিস্থা এক মহিলা!

তুমি ভয়ে পিছিয়ে যাচ্ছ কেন জর্জ! পেত্নী তোমাকে ধরবে? অ্যাঁ, পেত্নী পেত্নী!

পদ্মা, আমি তোর বাবা, জর্জ নই, তোর বাবা!

পদ্মা ঠাস করে আমার গালে একটা চড় মারল, মিথ্যেবাদী, মিথ্যেবাদী! তারপর একেবারে কাটা কলাগাছের মতো পালিশ করা মেঝের ওপর উল্টে পড়ল।

আর একটা চড় কষিয়ে গেল অজয়। আমি সেদিন সারারাত ভেবেছি। পদ্মার ভবিষ্যৎ কি হবে? অজয়ের মতো সৎ নির্লোভ, সহিষ্ণু স্বামীর হাতে পড়লে মেয়েটা বেঁচে যেতে পারে। শুধু পদ্মা বাঁচবে না, আমিও বেঁচে যাব। আমার ছেলে নেই, অজয়ই হবে আমার ছেলের মতো। যে বলতে পারে, লাখ টাকা পেলে ব্যাঙ্কে ফিক্সড করে দোব, তার হাতে আমার বিশাল এই ঐশ্বর্য ছেড়ে যেতেও সুখ। সব থাকবে, সব রাখবে, সব বাড়াবে আরো আরো বাড়াবে।

সন্ধের দিকে, গঙ্গার ধারে ঘাসের ওপর দুজনে পাশাপাশি বসে আছি। সূর্য ডুবে গেছে। অন্ধকার তেড়ে আসছে চারপাশ থেকে। সকাল থেকেই অজয়কে মনে হচ্ছে, আমার ছেলে, আমার জামাই।

কাল তোমরা কোথায় কোথায় গিয়েছিল অজয়?

অনেক জায়গায় স্যার।

স্যার বল না, কানে খট খট করে লাগে। আমি স্যার নই, সামান্য মানুষ, তোমার বন্ধুর মতো।

আপনিই বলেছিলেন।

আমিই বলছি, আর বল না। কাল কোথায় কোথায় গেলে?

ময়দান, ফ্লুরি, ট্রিঙ্কাস, স্কাইরুম, হাজরা, ভিক্টোরিয়া, যখন যেখানে হুকুম হয়েছে।

তুমি বাধা দিলে না কেন?

আমি সামান্য ড্রাইভার, হুকুমের চাকর।

তুমি যদি আর ড্রাইভার না থাক, আরো কাছে, একেবারে কাছে সরে আস?

তার মানে?

তোমাকে আমি চিরকালের জন্যে ধরে রাখতে চাই আমার ছেলের মতো করে, জামাই করে। অজয়, তোমার হাতে আমি পদ্মাকে দিয়ে যেতে চাই। অজয়ের কব্জিতে আমার একটা হাত।

তা হয় না, হিন্দী ছবি হয়ে যাবে।

কেন হয় না! আমি যে ভেবেছি। অনেক ভেবেছি। আমার ছেলে নেই, তাছাড়া সবই আছে। তুমি আমার সেই ছেলের মতো।

স্ট্যাটাসে মিলবে না, আপনি নিলেও আপনার মেয়ে আমাকে নিতে পারবে না, আমিও আপনার মেয়েকে সহজ করে স্ত্রী হিসাবে মানতে পারবো না। প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কটা বারে বারে বেরিয়ে আসবে।

কেন আসবে?

তাই আসে, বড়লোকের মেয়ে আর গরিবের ছেলেকে মিলিয়ে দিলে স্বামী-স্ত্রীর সহজ সম্পর্ক আর থাকে না। রঙে রঙ মেলাতে হয়।

তুমি তো আর গরিব থাকছ না, বড়লোক হয়ে যাচ্ছ, আমার পার্টনার, আমার পি. এ, অ্যাসিস্টেন্ট, সব কিছু।

আমি যে বড়লোক হতে চাই না।

তোমার লোভ নেই? উচ্চাশা নেই?

লোভ তো থাকে না, তৈরি করতে হয়, উচ্চাশা! এক একজনের

এক-একরকম আশা, তার পেছনেই সে দৌড়য়।

অজয় আমার বড় ইচ্ছে, তুমি বেঁকে থেকো না।

আমি যে স্বার্থপর হতে পারবো না।

স্বার্থপর!

হ্যাঁ, আমার মা-বাবা ভাই-বোন পড়ে থাকবে নীচে, আর আমি ফানুসের মতো উঠে যাব উপরে, তা হয় না।

তাঁরাও উঠবেন, তোমার সঙ্গে সঙ্গে উঠবেন।

ক্রীতদাস কারোকে তোলার ক্ষমতা রাখে না। স্বাধীন মানুষই কিছু করতে পারে। আপনার পয়সা আছে, আপনি আমার চেয়ে অনেক অনেক ভালো ছেলে পাবেন।

এই তোমার শেষ কথা?

ঘাসের গালচে থেকে নিজেকে তুলে নিতে হল। মানুষ কেন মানুষের কাছে সহজে আসতে চায় না! অজয় গাড়িতে স্টার্ট দিল। কঠোর চরিত্রের ছেলে। কংক্রিটের বাঁধুনি। কিছুতেই নোয়ানো যায় না।

পরের দিন সকালে অজয় আর এলো না। একজন বয়স্ক মানুষ সামনে দাঁড়িয়ে। হাতে অজয়ের চিঠি! অজয় লিখছে, অসুবিধে হবে ভেবে এই বিশ্বাসী মানুষটিকে পাঠালুম। এঁর হাত ভারী ভালো। একদিন চালালেই বুঝতে পারবেন। আমাকে যা দিতেন তার চেয়ে কিছু বেশি দিলে ভালো হয়, এঁর সংসার অনেক বড়।

আমি দুর্গাপুরে ভালো একটা চাকরি পেয়েছি। আজই চলে যেতে হচ্ছে। সকালের ট্রেনে। ছুটিতে এসে দেখা করব। আপনি আমাকে যেমন ভালোবেসেছিলেন, আমিও তেমনি আপনাকে ভালোবেসে ফেলেছিলুম।

অনেক দিন আগে কোথায় যেন পড়েছিলুম, ক্ষমতা আর ঐশ্বর্য মানুষকে বড়ো নিঃসঙ্গ করে দেয়। আপনার বেদনা আমি বুঝি। উপায় নেই, সহ্য করতেই হবে। ধনবান আর কুষ্ঠ রোগী প্রায় সমান। প্রণাম নেবেন। অজয়।

শীতকাল। ভোর পাঁচটা মানে ভদ্রলোকের মাঝরাত। ছাত্র-জীবন চলে গেছে, ঘুমও গেছে। সে জীবনে বই খুললেই চোখ জুড়ে আসত কালনিদ্রায়। মাথার ওপর পরীক্ষার খাঁড়া ঝুলছে। সামনে খোলা অর্থনীতির বই। মাথা লটকে আছে চেয়ারের পেছনে। ঠোঁট ফাঁক। ফুড়ুত ফুড়ুত নিঃশ্বাস পড়ছে। কিল, চড়, ঘুসি, কানমলা, নস্যি, অন্ধকার ভবিষ্যতের ছবি, কোন কিছুতেই ঘুম আর বাগ মানে না। সংসার ঘুমের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। চিত হলেই বুকের দুপাশে পা ঝুলিয়ে গেড়ে বসে দুশ্চিন্তা। রাতের এখন তিন পর্ব। প্রথম পর্বে সমভূমিতে পাশাপাশি শুয়ে শ্বশুরমশাইয়ের দেওয়া জ্যান্ত উপহারের সঙ্গে এটা ওটা সেটা নিয়ে ঠুসঠাস, ফোঁসফাঁস। অন্তে পৃষ্ঠে পৃষ্ঠদেশ ঠেকিয়ে দেয়ালমুখো হয়ে ক্ষতস্থান লেহন। তদন্তে উসখুস, উসখুস করে সন্ধিস্থাপন। চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর। উই আর অন দি সেম বোট ফাদার, উই আর অন দি সেম খাট মাদার বলে ভাবাশ্রু বিসর্জন। দেখতে দেখতে পার্শ্ববর্তিনীর নাসিকা-গর্জন। তখন কারবালার সেই শূন্য প্রান্তরে রাত-জাগা ঘুঘু হয়ে বিচরণ। মহাশূন্য হেঁকে বলে মনে করো। মনে করো, শেষেরও সেদিনও কি ভয়ঙ্করও। অতঃপর, আয় ঘুম, ঘুম আয়। সাধ্য-সাধনা। ঘুম এল দুঃস্বপ্নের ভেজাল নিয়ে। শেষ পর্বে পরাজিত কুস্তিগির বেহুঁশ।

আর তখনই নড়ে উঠবে কড়া। এলেন। তিনি এলেন। ভি আই পি নাম্বার ওয়ান।

মাথার ওপর ধামা খোঁপা। পুরু ঠোঁটে বিগত রাত্রির তাম্বুল রাগ। কণ্ঠে সাত সাগরের গরল। চোখ ঘুরে কুঁচ ভাঁটা জিনি ইন্দিবর নাটা। পিলে কাঁপিয়ে কড়া নড়বে তিনবার। তারপর দৈববাণী, আমি তাহলে চললুম। শুয়ে শুয়ে মিঞাও শুনছেন, বিবিও

শুনছেন। দু'জনেই পড়ে আছেন মটকা মেরে। যার গরজ বেশি তিনিই তড়াক করে লাফিয়ে উঠবেন। আমি তা হলে চললুম, শুনে মিঞাই ঠেলে ওঠেন, না, যেও না, রজনী এখনও বাকি, আমি রাত জাগা পাখি। একবার লাইন কেটে গেলে তুমি সাত বাড়ি সেরে আসতে আসতে, এ সংসারে আগুন জ্বলে যাবে। আমি গেলে সংসার অচল হবে না। ইনসিওরেনস্, প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড, ফিক্সড ডিপোজিট, ফ্যামিলি পেনসানে ভালই চলবে। তুমি গেলে দিনমণি, এ-পরান যাবে। খাবার ঘরে জগাই মাধাইয়ের সংসার গড়াগড়ি যাচ্ছে। বাসনের পাঁজা। গেলাস লাট খাচ্ছে। বেসিনে কাপ ডিস গণকবরের মৃতদেহের মত ঘাড়ে ঘাড়ে চেপে আছে। ভুক্তাবশেষ নিয়ে ধেড়েরা সারা রাত দাবা খেলেছে। দুধের বাটিতে জল ঢেলেছিল, তার ওপর ওষুধের ফেলে দেওয়া ফয়েল ভাসছে। হেলে হেলে দুলে দুলে। ভিটামিন, অম্লনাশক, মাথাধরা, অনিদ্রা। বাবুদের হেঁসেল নয় তো আঁস্তাকুড়। এ জিনিস ওই প্রাতঃস্মরণীয়ার ভরসাতেই সৃষ্টি করা যায়। সকালে সাফ করার নাম শুনলেই স্বেদ, কম্প, পুলক জাগে। বিষাদযোগ তৈরি হয়। হাত ঠেকাতেই ঘেন্না হয়, মেগেঃ। কলকাতার ট্র্যাফিকজটের মত। ভয়ে পুলিস ভাগে। সৃষ্টির সামনে পা ছড়িয়ে বসে স্রষ্টারা হাপুস নয়নে কাঁদে। ওগো! কি হবে গো, তারার মা আসছে না। তারার মা না এলেই চোখে অন্ধকার। কনডিশান রিফ্লেকস বলে একটা ব্যাপার আছে, যেমন খাবার দেখলেই নোলায় জল আসা। হাত তুললেই চমকে ওঠা। ভোরে কড়া নাড়বে ভেবে জেগে উঠে চোখ পিট পিট করা। এই এলো, এই এলো করে রাত ফর্সা হয়ে গেল। সামনের বাড়ির পুবের পাঁচিলে হলুদ রঙ ধরল। তারস্বরে কাক ডেকে উঠল। রাতে যে সব কল বন্ধ করা হয় তার মুখ দিয়ে দামাল ছেলের মত জল নামল লাফিয়ে লাফিয়ে। তবু মনে হতে লাগল বাড়ি যেন সার্জিক্যাল থিয়েটারের মত শান্ত। তারার মা ঠুকে ঠুকে বাসনে টোল ধরাচ্ছে না। কড়কড়ে ছাই ঘষে ঘষে

দুধের ডেকচির বারোটা বাজাচ্ছে না। স্টিলের গেলাসে ফুটবলের শট হাঁকড়াচ্ছে না। বাবুদের পিণ্ডি চটকাচ্ছে না। বেলা দেখে মনে হচ্ছে আজ লাইন কেটে গেছে। আসতেও পারে নাও পারে।

বিপদ দেখলে খরগোস কি করে ? মাথাটা গর্তের ভেতরে ঢুকিয়ে পেছনের দিকটা উঁচু করে রাখে। ভাবে খুব লুকোনো হল। শত্রু পেছন দিক থেকে এসে পশ্চাদ্দেশটি ধরে গর্ত থেকে টেনে বের করে আনে। বালিশে মুখ গুঁজে পেছন উলটে শুয়েছিলুম। প্রথম চোট কেটে যাক, তারপর সংসারের চাতালে নেমে তাল ঠুকব। সে আর হল না। পেছনে একটি মোলায়েম খোঁচা।

'দরজা খুলে দাওনি ?'

'কাকে খুলব ?'

'কেন রোজ যাকে খোলো !'

'তিনি না এলেও খুলে বসে থাকব ! এসো হে, এসো হে, প্রাণসখা !'

'ঠিকই এসেছিল, তুমি মটকা মেরে পড়েছিলে, বদমাইশি করে। তোমাকে আমি চিনি না ! হাড়ে হাড়ে চিনি। বাঁশ দেবার সুযোগ পেলে তোমাকে আর পায় কে !'

'বাজে কথা বোলো না। রোজ কে দরজা খোলে ? মটকা মেরে যদি কেউ পড়ে থাকে, সে হলে তুমি। দরজা খুলে দিয়ে যেই বিছানায় ঢুকি, অমনি তুমি কুঁই কুঁই করে হেসে বল, আবার নতুন করে শুচ্ছ কেন, এখুনি তো বাজার যেতে হবে। কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে।'

'যার যা ডিউটি।'

'আমি মারা গেলে ? তখনও কি ভূত হয়ে এসে তোমার তারার মাকে দরজা খুলে দিতে হবে ?'

'সাতসকালে একদম বাজে কথা বলবে না। ভোরে ঘুম থেকে উঠলে তোমারই ভাল। স্বাস্থ্য ভাল থাকবে, মন মেজাজ খুশি খুশি

হবে। তাড়াহুড়ো হবে না, আয়েস করে অফিস যেতে পারবে।'

'থাক। আমার ভাল আর তোমাকে দেখতে হবে না। যে ভাল করেছ কালী, আর ভালতে কাজ নাই। এখন ভালয় ভালয় বিদায় দে মা, আলোয় আলোয় চলে যাই।'

'আহা! মামার বাড়ি! আলোয় আলোয় আমাদের হাতে হারিকেন ধরিয়ে চলে যাই! ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন। নাও উঠে পড়।'

'উঠে কি করতে হবে! বাসন মাজতে হবে! ঘর ধুতে হবে?'

'আজ্ঞে না। জীবনে তো কুটোটি নেড়ে উপকার করনি। রেখাদির মত বরাত করে কি আর জন্মেছি যে সাতসকালে স্বামী এসে চায়ের কাপ সামনে ধরবে। বউকে সাজিয়ে রাখবে শোকেসে। আমার হামানদিস্তের বরাত। সারা জীবন থেতো হবার জন্যেই জন্মেছি। এখন দয়া করে উঠে পায়ে চটিটা গলিয়ে ওই সামনের বাড়িতে গিয়ে একবার খবর নিয়ে এসো, মুখপোড়া ওখানে আগে গিয়ে মরেছে কি না!'

যথা আজ্ঞা। মাঠ পেরোলেই বলাইদের বাড়ি। যতই করি না কেন রেখাদির স্বামী হতে হচ্ছে না। একবার শুকসারী দম্পতিকে যদি চর্মচক্ষে দেখতে পেতুম, স্পষ্ট জিজ্ঞেস করতুম, আপনারা মশাই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়ে আমার বারোটা এভাবে বাজাচ্ছেন কেন?

বলাইদের বাড়ির সদর হাট খোলা। ভেতর উঠোন স্পষ্ট চোখে পড়েছে। পা তুলে সাইকেল দাঁড়িয়ে আছে। বলাইয়ের মা গামছা পরে তারে থান মেলছেন। দৃশ্যটি বড় অপূর্ব। উঁকিঝুঁকি মারাটা ঠিক হচ্ছে কি? হচ্ছে না। প্রাণের দায়ে এই প্রাতঃদর্শন। পাশের জানালা এক চিলতে ফাঁক করে আমার এই অপরাধের ওপর যে কেউ চোখ রাখতে পারেন, ধারণাই ছিল না। 'পিপিং টম' হবারও একটা আর্ট আছে। জানালা ফুঁড়ে কাংস্যকণ্ঠ বেরোল, 'কি চাই?'

বাপস্, বলাইয়ের সেই বিখ্যাত বউ। চেহারা দেখলে মনে হয়

সার্কাসে ট্রাপিজের খেলা দেখাত। ঢোক গিয়ে বললুম, 'আপনাদের বাড়িতে তারার মা কাজে এসেছে ?'

'কেন, ফুসলে নিয়ে যাবেন ?'

আরে রাম কহো ভাই। ওই পাথরপ্রতিমাকে ফুসলে নিয়ে গিয়ে রাখব কোথায় ? মুখে বললুম, 'আজ্ঞে না, আমাদের বাড়িতে আসেনি তো! ভাবলুম এখানে যদি এসে থাকে।'

'আসেনি। আমি তো ওকে আপনাদের বাড়িতেই পাঠালুম উঁকি মেরে চুপি চুপি দেখে আসার জন্যে। আপনাদের আদরেই তো বাঁদর হয়ে বসে আছে। কি মুখ হয়েছে আজকাল।'

আমাদের বাড়ির দিকে তাকাতেই চোখে পড়ল স্যাণ্ডো গেঞ্জি-পরা বোকা বোকা চেহারার এক দৈত্য মিটার ঘরের পাশে ঘাপটি মেরে সম্পষ্ট জমিদার পুত্রের মত উঁকি ঝুঁকি মারছে। আরে ওই তো বলাই! চোখাচোখি হয়ে গেল। বলাই ফিরে এসে বলল—

'আসেনি দাদা ?'

'না রে ভাই। কি বিপদেই যে পড়া গেছে!'

বলাই জানলার দিকে তাকিয়ে বললে, 'শুনলে, আসেনি। আমার কথা তোমার বিশ্বাসই হয় না।'

জানালা বললে, 'এলে আমি ওর বাপের নাম ভুলিয়ে দিতুম।'

'তোমরা লোকের সঙ্গে বড় খারাপ ব্যবহার কর, তাই কেউ টেঁকে না।'

'ওই তো যিনি ভালো ব্যবহারের বড়াই করেন তাঁরও তো একই অবস্থা। মেয়ের বিয়েতে চুড়ি দিয়েছিলেন। মান রেখেছে!'

'আমি তারার মেয়ের বিয়েতে চুড়ি দিয়েছিলুম? কে বললে আপনাকে? আপনি পায় না খেতে শঙ্করাকে ডাকে।'

'তারার মা বলেছে। আমাদের বললে, আপনি চুড়ি দিচ্ছেন, জামাইয়ের আঙটিটা আমাদের দিতে হবে। অমি ধারধোর করে একশো টাকা দিয়েছিলুম।'

মহিলা গলা দিয়ে যে শব্দ বের করলেন, তাকে বলে, আর্তনাদ। 'কি সর্বনেশে মেয়েমানুষ গো! ওই ব'লে এই বোকা লোকটার কাছ থেকে পাঁচ আনা সোনার একটা আঙটি ভোগা দিয়ে নিয়ে গেল! কি পাল্লায় পড়েছি! আমার কি হবে গো!'

বলাই বললে, 'সাতসকালে আর চেঁচিয়ো না তো। খুব হয়েছে?'

'না চেঁচাবে না! তোমার মত বোকা আর পৃথিবীতে দুটো আছে! মেয়েছেলে দেখলেই বাবুর ন্যাজ একেবারে পটাস পটাস নড়ে উঠল। এমনি হাত দিয়ে পয়সা গলে না। আমার ভাইয়ের বিয়েতে একটা শাড়ি ঠেকিয়ে সরে পড়ল।'

'কাজের লোককে একটু তোয়াজে রাখতে হয় গবেট। তোমার ভাই এসে বাসন মাজবে?'

উপরে, দমাস্ করে জানালার পাল্লা বন্ধ হয়ে গেল। বলাই বললে, 'আচ্ছা জ্বালায় পড়া গেছে তো মশাই?'

গোলমাল শুনে পাশের বাড়ির প্রবীণ ভদ্রলোক বেরিয়ে এসেছেন, 'কি হল কি আপনাদের? সাতসকালেই মড়াকান্না! বলাই বউমাকে ধরে পেটালে না কি?'

'পেটাব কেন? ঝি আসেনি।'

'তাইতেই মাথায় বাজ ভেঙে পড়ল! একদিন নিজেরাই না হয় করে নিলে?'

বাড়ি ফিরতেই গরম হাওয়ার স্পর্শ। 'কি করছিলে কি এতক্ষণ?'

'কি আর করব? ওদের বাড়িতেও আসেনি।'

'মরে গেছে। কাল চিংড়ি মাছ খেয়েছিল, তোয়াজ করে খাইয়েছিলুম, কলেরা হয়ে মরেছে! ওই তো আমতলার বস্তি, যাও না একবার খবর নিয়ে এস।'

'ওখানে আমি যেতে পারব না, তোমার সব ছাঁটাই করা দশাসই মেয়েছেলেরা আমাকে চাঁদা করে ঠেঙাবে।'

'তুমি কিছুই পারবে না। আমিই যাই। আমার তো আর বসে থাকার বরাত নয়। সৃষ্টি পড়ে আছে। আসবে কি আসবে না।'

'অত হাঙ্গামা না করে, এসো না, দু'হাতে ঝটাপট সেরে নি।'

'কালকে ঘি-ভাত খাওয়া হয়েছিল, সব বাসনে তেল বেড় বেড় করছে। গেলাসে পার্সেমাছের আঁশটে গন্ধ। ও তোমার আর আমার কম্ম নয়।'

'একটু চা হলে হত না!'

'একদিন নিজের গতর নাড়িয়ে চা-টা কর না। যেখানে থাক, আমি ওর ঘাড়টা ধরে টেনে আনি।'

গেল তো গেলই। ফেরার আর নাম নেই। না পারছি বাজার যেতে, না পারছি দুধ আনতে। সব স্ট্যাণ্ড স্টিল। অবশেষে তিনি ফিরলেন।

'কি রিপোর্ট?'

মোড়ায় ধপাস করে বসে পড়ে বললে, 'আগে এক গেলাস জল।'

জল কোথায় ঢালবে? মাথায় না গলায়! জল খাওয়া হল।

'আঃ।'

'বলো, কি রিপোর্ট!'

'তিনি কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন। জ্বর হয়েছে, সুখের জ্বর। কপালে হাত দিয়ে দেখতে গেলুম। বড় বড় নখ নিয়ে এমন খামচে দিলে। দেখি একটু ওষুধ দাও তো। জলাতঙ্ক না হয়। এ টি এস নিতে হবে।'

'না না, এ টি এস নিতে হবে কেন! তুমিও যেমন।' প্রাণি-জগতে দুজন মহিলার মুখোমুখি দেখা হলেই একটু আঁচড়া-আঁচড়ি কামড়া-কামড়ি হবেই। দুটো বেড়াল। ফেস টু ফেস, ঠুসঠাস, ফোঁসফাঁস।

ওষুধ লাগতে লাগতে বললে, 'দিয়েছি আজ বারোটা বাজিয়ে।'

'কি ভাবে বাজালে ?'

'এত বড়ো পাজি মেয়েমানুষ, ছোট মেয়েটাকে কাজে বের করে দিয়েছে! আমাকে বললে, না তো, পাঠাইনি তো! কালী-বাড়ির পাশে গুঁইদের ওখানে গিয়ে দেখি বক ধুচ্ছে। ফের ফিরে গেলুম। কি গো, তুমি যে বললে মেয়েকে কোথাও পাঠাওনি! এই তো দেখে এলুম কাজ করছে। তখন বলে কি না এটা আমার বেশি টাকার বাড়ি। আমি বলে এসেছি তুমি আর তোমার মেয়ে যদি এমুখো হও, ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বের করে দোব। তুমি এখুনি একটা লোক দেখ।'

'সাধনা করলে ঈশ্বর পাওয়া যায়, কাজের লোক পাওয়া অত সহজ নয়। এ তুমি কি করলে? ওদের ইউনিয়ন আছে। কেউ আর এ বাড়িতে আসতে চাইবে না।'

'ঝাঁটা মারি ইউনিয়নের মুখে। তুমি অন্য জায়গা থেকে লোক আনাও। থাকা, খাওয়া, পরা। কাগজে বিজ্ঞাপন দাও। ভাগলপুর, বিলাসপুর, কানপুর, যেখান থেকে পার। চেষ্টা করলে কি না হয়!'

'তা ঠিক। পিসির গোঁফ গজিয়ে পিসে হয়, মাসি মেসো হয়।'

এদিকে লণ্ডভণ্ড বকাণ্ড অবস্থা। মেজাজ সব ফাইভফর্টি ভোল্ট। বাসন কমাবার জন্য সব পাতে পাতে চলেছে। ভাত, ডাল, ঝাল, ঝোল, সুক্তো, চাটনি সব মিলেমিশে একাকার। যা উদরে মিশতো, তা পাতেই মিশে মিকস্‌চার হয়ে গলকম্বল গলে ইঞ্জিনে পড়তে লাগল।

এভাবে তো চলে না। একটা কিছু করতেই হয়। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি, মুখে পান ঠুসে, গাল গুলি করে, নেচে নেচে সব

কাজে চলেছেন বাড়ি বাড়ি। কয়েকজনকে মনে ধরলেও মার খাবার ভয়ে সাহস করে বলতে পারি না, হ্যাঁগা আমাদের বাড়িতে কাজ করবে? দাদাঠাকুরের মত গান গেয়ে গেয়ে ঘুরতে হবে নাকি— বাসন মেজে দাও, মেজে দিলে শাড়ি দোব, বাটা ভরা পান দেবো, পুজো এলে ধনেখালি দোব, মেয়ে হলে নোলক দোব, জামাই হলে জুতো দোব, মাংস হলে ভাগ দোব, পেটে এলে দুধ দোব।

হাতের কাছে যাকেই পাই দু'চার কথা হবার পর জিজ্ঞেস করি, জানাশোনা কেউ আছে? দিন না ভাই, একটা লোক জোগাড় করে। ছেলে হোক, মেয়ে হোক। বড় আদরে থাকবে। রিকশায় উঠে রিকশাঅলাকে বলি। ট্যাকসিতে উঠে ড্রাইভারকে বলি। ডাক্তারখানায় বসে সহরোগীকে বলি। চোখ দেখাতে গিয়ে অন্ধকার ঘরে ডাক্তারবাবু নাকের কাছে ঝুঁকে পড়ে যখন আলো ফেলছেন তখনও আমি ফিস ফিস করে বলে ফেলি, কাজের লোক আছে? পরিচিতের বাড়ি গিয়ে সব ছেড়ে প্রশংসা করে উঠি, আহা মেয়েটি বেশ। কোত্থেকে পেলেন! গৃহস্বামীর ভুরু কুঁচকে ওঠে। ভাবেন চরিত্রে চিড় ধরেছে।

একটা সময় এল, যখন কারুর সঙ্গে দেখা হলেই আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে হাত তুলে বলেন, কাজের লোক ছাড়া অন্য কিছু বলার থাকে বলুন। অনেকে আবার দেখামাত্রই দৌড়তে শুরু করলেন, ওই রে আসছে রে। এদিকে গৃহের গঞ্জনা দিনে দিনেই বাড়ছে। পরিস্থিতি চরমে উঠল, যেদিন পাশের বাড়ির ব্যোমকেশবাবু সোনারপুর থেকে একটি ডাগর-ডগুর ফুলটাইমার নিয়ে বাড়ি ঢুকলেন। সে কি উল্লাস। উলুধ্বনি সহর্ষ আর্তনাদ। পেছনে পেছনে প্রবেশ করল ফুলশয্যার তত্ত্বের মত নতুন বিছানা, মশারি, বালিশ, জারুল কাঠের খাট। রেকর্ড প্লেয়ার বেজে উঠল, আওনা পেয়ার করে, নাচ করে, ডিসকো দিওয়ানে, আহাঃ আহাঃ। ব্যোমকেশবাবু যেন বুড়ো বয়েসে বিয়ে করে বাড়ি ঢুকলেন।

ছাদে দাঁড়িয়ে এই সব দেখতে দেখতে গৃহকর্ত্রীর বিদ্যুৎপরিবাহী নালিকায় হাই ভোলটেজের সঞ্চার হল। তিনি বজ্রের মত, অগ্নির মত, কামানের গোলার মত ফেটে পড়লেন। 'অপদার্থ, ওই দেখ, করিতকর্মা পুরুষ কাকে বলে। চোখে চালসে, রক্তে শর্করা, তবু তিনি যা করলেন!' কি করলেন? যেন বিলেত থেকে আই, সি, এস হয়ে এলেন।

জগৎ-সংসার সম্পর্কে যাদের অসম্ভব জ্ঞান, যাঁরা এ হাটে কিনে ও হাটে বেচেন, তাঁদেরই একজন বললেন, ওভাবে হবে না বন্ধু। লোক ভাঙাতে হবে, এজেন্ট ফিট কর। ওই পুষ্পিতালতাকে রোজ লোভ দেখাতে হবে। আরও নরম মোটা গদি, নেটের মশারি, ব্রেকফাস্ট, লাঞ্চ, সন্ধেবেলায় টিভি, রবিবার সিনেমা। আরও, আরও দোব।

'সে তো ঢাকের দায়ে মনসা বিক্রি!'

'সেই যুগই তো পড়েছে ভাই। খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি। মলের চেয়ে চুটকি ভারী। বেকারে দেশ ছেয়ে গেলেও কাজের লোক তুমি সহজে পাবে না। সবচেয়ে সহজ হল আর একটি বিবাহ করা। পাত্রী তুমি সহজেই পাবে। বিনাপণে করতে চাইলে, পুলিশ ডেকে তোমাকে ফিলমস্টারের মত সামলাতে হবে। বড়র জন্যে, মেজ আন, মেজর জন্য সেজ। বামুনের গরু ভাই। খাবে কম দুধ দেবে বেশি।'

'মাখনবাবুর বাড়িতে একটা ভাল খেস আছে। গতবছর পাঞ্জাব থেকে কিনেছিলেন।'

'কে চাইতে যাবে?'

'কেন তুমি? তোমার সঙ্গে তো ওঁর স্ত্রীর ছাতে ছাতে প্রায়ই আলাপ হয়। প্রাণের কথায় এতই মশগুল থাক, নিচে থেকে ডেকে ডেকে গলা চিরে যায়, তবু উত্তর পাওয়া যায় না।'

'তোমার যা মিনমিনে মেয়েলি গলা, পাশের ঘর থেকেই শোনা যায় না তা ছাত থেকে।'

'সংস্কৃতিমান লোকের গলা একটু মোলায়েমই হয়। তোমার মত অমন পান দোক্তা খাওয়া লহরজান, গহরজান টাইপ হয় না। মেয়েদের গলা কেমন হবে? যেন ঝাড়লণ্ঠনে বসন্তের বাতাস লেগেছে। তোমার মেয়েকেও একটু সাবধান করে দিও। তোমারই তো কাউণ্টার পার্ট। ছেলের বাবা কিছু জিজ্ঞেস করলেই যণ্ড-কণ্ঠে, কি বললেন বলে, সব যেন ভণ্ডুল করে না দেয়! বলবে বাতাসের সুরে, ঝিরি ঝিরি নিঃশ্বাসে যেন কথা বলে। তালে লয়ে মিলিয়ে।'

'আজ্ঞে না, সে যুগ আর নেই। মেয়েলি ন্যাকাপনা এখন অচল। একটু পুরুষালি গলাই ভাল। ছেলেরা পছন্দ করে বেশি।'

'তুমি সব জান। আমিও একটা ছেলে! আমি যা বলব, সেইটাই জানবে ঠিক।'

'তুমি ছেলে নও।'

'তার মানে?'

'তার মানে তুমি আর এখন ছেলে নও। আধবুড়ো।'

বিনয় বললে, 'আধবুড়ো হলেও ছেলে তো?'

'আধবুড়ো, না ছেলে, না মেয়ে, একটি ভ্যাবাগঙ্গারাম।'

'তাই না কি? তা হলে অত বড় একটা অফিস সামলাচ্ছি কি করে।'

'আজকালকার অফিস আর সামলাতে হয় না। চলছে চলবের যুগ।'

'এরপর তা হলে বলবে, মেয়েদের ঠোঁটে একটু গোঁফের রেখা থাকলে আকর্ষণ বাড়ে।'

'বাড়েই তো। আমি যা যা বলছি সব সত্যি। তার প্রমাণ আমি আর তুমি।'

'তার মানে?'

'মনে আছে বাহান্ন সালের কথা? যখন তুমি আমার প্রেমে লাট খাচ্ছ।'

'প্রেমে মানুষ অন্ধ হয়ে যায়।'

'তাই বুঝি বলতে, যত দেখছি তত চমকে উঠছি। তুমি আমাকে এক হাটে কিনে, এক হাটে বেচে দিতে পার।'

'বলেছিলুম?'

'হ্যাঁ বুড়ো। মনে করে দেখ। তখনও আমার এই রকমই গলা, ঠোঁটের ওপর হালকা গোঁফের রেখা। তখন আবার এও বলেছিলে, কটা-সুন্দরীর চেয়ে শ্যামলা দীর্ঘাঙ্গী আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারে। সাধে আমি ম্যাড হয়ে তোমার পেছন পেছন ঘুরছি?'

'আমি তোমার পেছনে ঘুরেছি, না তুমি আমার পেছনে ঘুরেছ?'

'আহা, তাই না কি? কি বা শুনি আজ মন্থরার মুখে। কার্সিয়াঙ-এ মামার বাড়ি গেছি, তোমার জ্বালায় কলকাতায় টিঁকতে না পেরে। দ্বিতীয় দিন সকালে বাজারে গেছি। মাফলার-জড়ানো এ মূর্তি কে। একগাল হাসি, হে হে এই মাত্র নামলুম শ্যামা। প্রাণ অমনি জল হয়ে গেল আমার। এত বড় নির্লজ্জ, আমাকেই আবার জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, কোথায় উঠব শ্যামা? মনে পড়ছে?'

'হ্যাঁ, তা একটু একটু পড়েছে বই কি।'

'তা হলে, কে ঘুরেছিল? তুমি না আমি?'

'তখন আমার মাথার ঠিক ছিল না।'

'খুব ঠিক ছিল। একেবারে শ্যাম-পাগল, বুঁচকিটিকে ঠিকই চিনতে।'

'যাক গে, সে সব পুরোন কথা ছেড়ে কাজের কথায় এসো। খেসটা পারবে আনতে?'

'চেষ্টা করে দেখি। আমি পারব না এমন কাজ অবশ্য খুব কমই আছে।'

শ্যামার মেয়ে রেখাকে আজ দেখতে আসবেন পাত্রপক্ষ। মাস-খানেক হল কথাবার্তা চলছে। চিঠিচাপাটি। ছবি দেখাদেখি, প্রাথমিক নির্বাচন শেষ। এইবার মুখোমুখি। অনেকটা লিখিত পরীক্ষার পর মৌখিক পরীক্ষার মত। শ্যামার চেয়ে বিনয়ের দুর্ভাবনাই বেশি। ছবিতে কেরামতি চলে, চেহারায় তো চলে না। মেকআপে তো সব হয় না। তবে ভরসা এই, রেখাকে পুরোপুরি তার মায়ের মত দেখতে নয়। শ্যামাকে অনেকটা ডেকাথেলন চ্যাম্পিয়ানের মত দেখতে। আট আনা বারো আনা ছাঁটে চুল কেটে দিলে বোঝে কার সাধ্য পুরুষ কি মহিলা। ভাগ্য ভাল, রেখা অনেকটাই বাপের চেহারা পেয়েছে, গলাটাই যা ভয়ের। ভল্যুম কনট্রোল নেই। আর মেজাজটাও মায়ের দিকেই গেছে। এপাশ ওপাশ সহ্য করতে পারে না, মিলিটারি মেজাজ। অস্ত্রোপচারের ডাক্তারও হতে পারত। ভাবটা এই রকম: ঝামেলা করছে কেটে ফেলে দাও। বোতাম ঘরে বোতাম আটকে গেছে! বুকের কাছে জামাটা ফাঁড়াস করে ছিঁড়ে পা গলিয়ে খুলে ফেল। ড্রয়ারের চাবি আটকে গেছে। মারো টান। হুড়হুড় করে সব পড়ে গেল। শ্যামার মতই চরিত্রে ধৈর্যের ধও নেই। এই তো সেদিন। পায়ের বুড়ো আঙুল চটির স্ট্র্যাপে কি ভাবে যেন আটকে গিয়েছিল। চটির বেয়াদপিতে এমনই অধৈর্য হয়ে পড়ল, মার

ঝটকা, চটি ছিটকে গিয়ে দুধের ডেকচিতে। বুড়বুড়ি কেটে ডুবে গেল। আঙুলে একবার একটা চোঁচ ফুটেছিল। প্রথমে পাখি ছুঁচ দিয়ে একটু চেষ্টা হল. শেষে ধ্যাত তেরিকা, ব্লেড দিয়ে খানিকটা মাংস উপড়ে, মাস খানেক ব্যাণ্ডেজ বেঁধে অচল হয়ে বসে রইল। রেখার জন্যে বিনয়ের ঘুম গেছে। এ মেয়ে একমাত্র ডিকটেটারেরই স্ত্রী হতে পারে! পাত্র খুঁজতে হবে জাম্বিয়ায়, নাম্বিয়ায়, ঘানায় কিংবা লিবিয়ায়।

বিনয়দের ফ্যামিলির একটা ট্র্যাডিশান আছে! সেটা হল, কেউ এলেই তাকে এমন খাওয়ানো, যেন তিন দিন হাঁ করতে না পারে। ফুলকো লুচি, বেগুন ভাজা, পাশে চাকনা দেবার জন্যে একটি কাঁচা লঙ্কা, ঝুরো ঝুরো আলু ভাজা। দু'পিস পাকা রুইমাছ ভাজা, অন্তত চার রকমের মিষ্টি, বিগ সাইজের। এক প্লেট রাবড়ি খাও, এবং খেয়ে সামলাও। আজকে সেই ধরনের ব্যবস্থাই হবে। কিঞ্চিৎ বেশি। কারণ যাঁরা দেখতে আসছেন তাঁরা অত্যন্ত বনেদী পরিবারের মানুষ। গাড়ি আছে, বাড়ি আছে। বাড়ির মেঝে মার্বেল পাথরের: পেট্রলের দাম বাড়ায় গাড়ি অধিকাংশ সময়েই গ্যারেজে থাকে। কর্তার হুকুম, নেহাত প্রয়োজনে না পড়লে পোড়ানো চলবে না। কর্তা রিটায়ার্ড ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। কর্তা আর গিন্নি দু'জনেই বেশ গতরঅলা মানুষ। দু'ছেলে তিন মেয়েরই বিয়ে হয়ে গেছে। তিন জামাই গাড়িধারী। একজন ডাক্তার। তিনি প্রোফেসান নিয়েই ব্যতিব্যস্ত। শ্বশুরবাড়িতে কালেভদ্রে আসেন। আর একজন ইঞ্জিনিয়ার। তিনি প্রায়ই আসেন। শ্বশুর-শাশুড়িকে গাড়ি চাপিয়ে এখানে ওখানে বেড়াতে নিয়ে যান। সংসারের প্রিয় জামাই। তৃতীয়টি প্রবাসী। হাওয়াই কোম্পানিতে চাকরি। এই মাদ্রাজে তো কাল বোম্বাইতে।

বিনয় এসব খবর সংগ্রহ করেছে তার বন্ধুর কাছ থেকে, যিনি এই যোগাযোগের কর্মকর্তা। বিনয় খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জেনেছে।

কারণ শ্বশুর আর শাশুড়ি বস্তু দু'টিতে তার ভীষণ ভয়। মেয়েটিকে যদি নেয়ও, কেমন ব্যবহার করবে কে জানে? আজ-কালকার ছেলে মেয়েদের বিশ্বাস করা যায় না। বিয়ের পর নিজমূর্তি ধরতে মাস তিনেক সময় লাগে, বরাতের কথা ফেলে রাখা যায় না ঠিকই, তবু যতটা পারা যায় দেখে শুনে, খোঁজ খবর নিয়েই এগোনো উচিত।

বাড়ি-ঘর বেশ মনের মতই সেজে গুজে উঠেছে। শ্যামা খেসটা শেষ পর্যন্ত জোগাড় করে এনেছে। কথায় আছে চিল পড়লে কুটোটা অন্তত নিয়ে যাবেই। শ্যামা হল সেই চিল। সোফাসেট, ডিভান সরে গেছে। মেঝেতেই সব আয়োজন পাকা। বসেও আরাম, দেখেও আরাম। জানলার পর্দা টর্দা, দরজার পেলমেট সব নতুন করে লাগানো হয়েছে। পুরো ঘরটাই যেন স্টীম লণ্ড্রি থেকে কেচে বেরিয়ে এসেছে। আয়োজন দেখে বিনয় নিজে নিজেই বাঃ বাঃ করে উঠল।

চারটে প্রায় বাজে। আসার সময় হয়ে এল। কথা আছে চার জন আসবেন। ছেলে, মা, বাবা। একজন পারিবারিক বন্ধু। ছেলের বড় মামা। তিনজন পুরুষ একজন মাত্র মহিলা। মহিলার সংখ্যা কম থাকাই ভাল। মেয়েরা বড় নাকতোলা হয়। শ্যামার সঙ্গে হয়ত শেষে ঝটাপটিই বেধে গেল! কিস্যু বলা যায় না। মেয়ের মাকে যে প্রথমটায় কেঁচো হয়ে মেয়ে পার করতে হয়, তারপর, ফোঁস ফাঁস চলতে পারে, এই কূটনৈতিক চালটা বিনয় এত করেও বউকে শিখিয়ে উঠতে পারল না। বললেই বলবে, মেয়ের মা হয়েছি বলে চোরের মত থাকব কেন। সব ফ্যামিলিতেই মেয়ে আছে। বউরাই পরে গিন্নি হয়, গিন্নিরাই শাশুড়ি হয়। আমার দাপট আমি ছাড়ব না। মেয়ে আমার কিছু কম যায় না। তুমিও এমন কিছু ফেলনা নও। শেষের কথায় বিনয়ের অহঙ্কারে বেশ সুড়সুড়ি লাগে। বিনা প্রতিবাদে শ্যামার যুক্তি মেনে নেয়।

দরজার সামনে রাস্তার ধারে বিনয় সেজেগুজে দাঁড়িয়ে আছে। নতুন ব্লেডে দাড়ি চেঁচেছে। গালে মেখেছে আফ্‌টার শেভ লোশান।

দিশি ধুতিতে যত্নের কোঁচ। আধুনিক বাপেদের জিওগ্রাফি বেশ পাল্টে যাচ্ছে। পাল্টাবে না কেন? বাজেট যেখানে প্রায় পঞ্চাশ হাজার, মেয়ের বাপ জুতো মশমশিয়ে হবু বেয়াইয়ের জন্য মুখে সিগারেট গুঁজে, চোখে রিমলেস ঝুলিয়ে রাস্তায় পায়চারি করতে পারে। মেয়ে শিক্ষিতা সুরূপা। দেঁতো হাতি নয়, ট্যারা পেঁচা নয়। বংশোচিত বিনয়ে আপ্যায়ন আসুন, বসুন, দেখুন। পছন্দ হয় ভাল, না হয় ছেলের অভাব নেই। ম্যানম্যানের, প্যানপ্যানের যুগ চলে গেছে।

রাস্তায় একটা ঘোড়ার গাড়ি ঢুকছে। বিনয় অবাক। শতাব্দীর গোড়ার দিকে এমন গাড়ি দেখা যেত। এখনো মাঝে মধ্যে দেখা যায়। চৌরঙ্গীর দিকে। গঙ্গার ধারে রাতের বাবুরা হাওয়া খেয়ে বেড়ান। মাঝে মধ্যে দুধের ক্যান নিয়ে এক-ঘোড়ার একটা গাড়ি এ দিক থেকে কোন দিকে যেন যায়। এ ঘোড়াটা তত মড়া-খেকো নয়। মাড়োয়ারীদের বিয়ের ঘোড়ার মত। পড়তি জমিদারের মতো। চেকনাই এখনো কিছুটা লেগে আছে। কচোয়ান হাঁকল,

'বিনয়বাবুকা কোঠি?'

'হ্যাঁ, এ হি কোঠি।'

'নমস্তে সাহাব।' রাশ টেনে গাড়ি থামাল। জানলা দিয়ে বুল-ডগের মত লাল মুখ বেরিয়ে এল, 'মনে হয় আপনিই বিনয়বাবু?'

বিনয় হাত জোড় করে বললে, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'রোককে, রোককে।'

গাড়ি রুখেই আছে। বাঙালীর স্বভাব, বাস থেমে থাকলেও যাত্রীরা রোককে বলে হুড়মুড় করে নামেন। কচোয়ান তিড়িং করে কোচবক্স থেকে লাফিয়ে পড়েই, গাড়ির দরজা এক হ্যাঁচকা টানে খুলে ফেলল। চার জোড়া হাঁটু দেখা গেল। লোকে সিটি মারবে। আশে-পাশের বাড়ির জানলায় মুখ বেরোতে শুরু করেছে। পুলিশই বা এমন একটা গাড়ি ছেড়ে দিল কি করে।

বহুত কসরত করে বিশাল এক মোটা মানুষ গাড়ি থেকে প্রথমে নেমে এলেন। ভারমুক্ত হয়ে গাড়ি প্রায় এক হাত ওপর দিকে উঠে পড়ল। ঘোড়াটা ভোঁস করে একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে একটু যেন সুস্থ হল। গাড়ি থেকে অন্যান্য সকলে নেমে পড়লেন। ক্যামেরা থাকলে বিনয় একটা ছবি তুলে রাখত। পর্বতের পাশে যেন তিন টুকরো টিলা। একজনকে ছাড়া বিনয় আর কাউকেই চেনে না। যাকে চেনে তার নাম হিমাংশু আচার্য। হিমাংশুর যোগাযোগেই এই দেখাশোনা। না চিনলেও স্বাস্থ্যবান ভদ্রলোকের হাবভাব দেখে বুঝতে অসুবিধে হয় না, তিনিই পুত্রের পিতা। জেলা শহরে আসামী ঠেঙানো মানুষ। অবসর নিলেও সারা দুনিয়াটাকে এখনো যেন এজলাস থেকেই দেখছেন। যে মহিলাকে এরই মধ্যে বার দুয়েক ধমকধামক লাগানো হয়ে গেল, তিনি নিশ্চয়ই স্ত্রী। স্ত্রী ছাড়া আর কার সঙ্গে অমন ব্যবহার করা যায়।

হিমাংশু হাসতে হাসতে বললে, 'কত্তা ঘোড়ায় চেপে তেল বাঁচাচ্ছেন।'

বিনয় বললে, 'এ জিনিস এখনো আছে?'

'যত্ন করে রাখলে সবই থাকে ভাই। কত্তার বাবা সিভিল সার্জেন ছিলেন। তাঁর আমলের জিনিস। ঘোড়াকে বাতে না ধরলে যৌবন সিল্কের কাপড়ের মত দু তিন পুরুষ থেকে যায়।'

কথা বলতে বলতে সকলে ঘরে এসে পড়েছেন। মেঝেতে বসার আয়োজন হয়েছে দেখে কর্তা ঘাবড়ে গিয়ে বললেন,

'ও হিমাংশু, চিরটা কালই তো সিংহাসনে বসে এলাম, আজ আবার এ কি হল? জানই তো, আমার মধ্য-প্রদেশ সব প্রদেশের বড়।'

বিনয় বললে, 'ভাববেন না আমি সোফা প্লেস করে দিচ্ছি এখুনি।'

যতটা তটস্থ হলে ভাল দেখায় ঠিক ততটা তটস্থ হয়েই বললে। মন কিন্তু গজগজ করছে, সিংহাসনে বসে এসেছেন। কত বড় কাজি

ছিলেন। জেলা সদরের ম্যাজিস্‌ট্রেট। রঙচটা কাঠের চেয়ার। সে চেয়ার আমি যেন দেখিনি। পেছন দিকের ঠেসান দেবার অংশটা সাধারণ চেয়ারের চেয়ে উঁচু হয়। মাথা ছাড়িয়ে ওঠে। সিংহাসনে বসি। ওরে আমার চিফ জাস্টিস রে।

শোবার ঘর থেকে সোফা বেরোবে। সেই সকাল থেকে রাজেনের সঙ্গে সমানে লেগে থেকে থেকে বসার ঘরের দিশি অঙ্গসজ্জা হয়েছিল। নাও এবার বোঝো ঠ্যালা। নাইনটিনথ সোফার গতরটি তো নেহাত কম নয়। এ মাল একমাত্র পবননন্দনই একা বহন করতে পারে। তার মত ফিনফিনে বাবুর কম্ম নয়। আয়নায় নিজের চেহারার প্রতিফলন দেখে ঘেন্না ধরে গেল নিজের ওপর। ছেলের বাপের এক কিকে পেনাল্টি সীমানার বাইরে গিয়ে পড়বে। দেহ ছোট হলে মনও ছোট হয়ে যায়। বড় খোলে বড় জিনিস থাকবে, ছোট খোলে ছোট জিনিস। এই তো নিয়ম।

হিমাংশু, রাজেন আর বিনয়ের চেষ্টায় সেই গায়ে-গতরে সোফা মেঝের ওপর দিয়ে ছ্যাঁচড়াতে ছ্যাঁচড়াতে যথাস্থানে রাজসিংহাসন হল। পাত্রের পিতা হারানিধি বসে ছাড়লেন। অতখানি ওজন দুটো পায়ের ওপর এতক্ষণ ধরে রাখার একটা ক্লান্তি আছে। বসে সুস্থ হয়ে ঘরের চারপাশ ভাল করে এক নজর দেখে নিয়ে বিনয়কে জিজ্ঞেস করলেন—

'দরজা জানলা কি বার্মা টিকের?'

'আজ্ঞে না, সত্তর শালের বাড়ি, এমনি সিপি টিকেই দশহাত জিভ বের করে ছেড়ে দিয়েছে, বার্মা পাব কোথায়?'

'শুনলে শশাঙ্ক?' শ্যালককে উদ্দেশ করে হাসতে হাসতে বললেন, 'বার্মা কোথায় পাব? সন্ধান রাখতে হয় মশাই, সন্ধান রাখতে হয়। সন্ধান করলে ঈশ্বর মেলে, বার্মা টিক মিলবে না? আমরা কি করে পেলুম শশাঙ্ক?'

ত্যারছা চোখে হারানিধি বিনয়ের দিকে তাকালেন। বিনয়ের মনে

হল খুব বুড়ি, মোটা এক বাঈজী তাকে চোখের ভঙ্গি করছে তিরছি নজরিয়াকে বান।

'জলছাত করেছেন ?'

'আজ্ঞে না।'

'সে এ কীই। দশ বছর বাড়ি হয়ে গেল জলছাত হয়নি! কি বলে শশাঙ্ক। ঢালাইয়ের লোহা বেরিয়ে পড়বে। করেছেন কি!'

বিনয়ের ভীষণ অবাক লাগছিল। ভদ্রলোক মেয়ে দেখতে এসেছেন না বাড়ি? মিউমিউ করে বললে,

'এই করব করব করে আর ঠিক সুবিধে করে উঠতে পারিনি।'

'ওই হয়, করব না করব না করে বুড়ো বয়েসে বিয়ের মত হবে আর কি ? সব কিছুরই বয়েস আছে মশাই। টাকে তেল ঢাললে কি আর চুল গজাবে। তেলের পয়সাটাই বরবাদ হবে। কি বল শশাঙ্ক ?'

শশাঙ্ক যেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের প্রিয় বয়স্য গোপাল ভাঁড়। হয় হেসে, না হয় তাল দিয়ে ভগিনীপতিকে ঠেকা দিয়ে চলেছে।

'টোট্যাল কস্ট কত পড়েছিল ?' হারানিধি আরো গভীরে যেতে চান।

বিনয়ের এবার বিশ্রী লাগছে। এত কৌতূহল তো অভদ্রতারই সামিল। বিনয় তবু ভদ্রভাবেই বললে,

'ঠিক মনে নেই, সত্তর হাজারের মত হবে।'

'জমি ধরে ?'

'না জমি আলাদা।'

'ক' কাঠা আছে ?'

'পাঁচ কাঠার মত।'

ভদ্রলোক শ্যালকের দিকে তাকিয়ে হাঁটুতে তাল ঠুকে বললেন, 'চলো, উঠি তা হলে ?'

বিনয় অবাক হয়ে বললেন, 'কেন ? সে কি কথা ? উঠবেন কেন ?'

শ্যালকও ধরতে পারেনি, 'মেয়ে দেখবেন না ?'

'আর দেখে কি হবে ?'

বিনয় হঠাৎ বলে ফেলল, 'কেন জলছাদ নেই বলে ?

'হ্যাঁ হ্যাঁ ধরেছেন ঠিক।'

বিনয় কি ধরেছে নিজেই জানে না। ধরাটা হঠাৎ মিলে গেছে দেখে অবাক হয়ে বললে,

'জলছাদের সঙ্গে মেয়ে পছন্দ-অপছন্দের কি সম্পর্ক ?'

'ও, ধরেও ধরতে পারেননি দেখছি। আচ্ছা, ছাত কত বর্গ ফুট আছে ?'

'মাপিনি, তবে মনে হয়, ছশো কি সাতশো স্কোয়ার ফুট হবে।'

'জলছাতের খরচ কত হবে বলে মনে করেন ?'

'আজ্ঞে ধারণা নেই।'

'পাঁচ সাত হাজার। কি বল শশাঙ্ক ? পাঁচ সাতে হবে না ?'

'বড় জোর আট।' শশাঙ্ক আর একহাজার ওপরে উঠে জ্ঞান জাহির করল।

'তাহলে একবার বুঝে দেখো, হিমাংশু আমাদের এমন জায়গায় এনেছে যিনি গত দশ বছরে আট হাজার টাকার মুখ দেখেননি। দেখলে জলছাত হয়ে যেত। বিনয়বাবু আমার ছেলে সি ২, ছ' ফুট লম্বা, গৌরবর্ণ। আপনার বাজেট কত টাকা ?'

বিনয় আর একটু হলেই বলে ফেলেছিল পঞ্চাশ হাজার। সামলে নিল। ভেতরটা ঘৃণায় কুঁকড়ে যাবার মত হচ্ছে। আর যাই হোক এমন মহামানবের পুত্রের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে স্বপ্নেও সম্ভব নয়। সে বলল,

'আমার মত লোক আর কত খরচ করতে পারে ? আপনি নিজেই অনুমান করে নিন।'

'সেই অনুমান করতে পেরেছি বলেই আর সময় নষ্ট করতে চাইছি না, আমাদের আত্মীয়তা, কুটুম্বিতা সবই বড় বড় ঘরে। ছেলের বিয়ে

দিয়ে মাথা হেঁট করে থাকতে পারব না। আপনারও অস্বস্তি, আমারও অস্বস্তি, আপনার মেয়েও মাথা উঁচু করে চলতে পারবে না। আমাদের বংশে বউরা এসেছে বড় বড় বংশ থেকে। সোনার কাজ করা জামদানী পরে। শরীরের এক ইঞ্চিও খালি থাকত না, সব সোনায় মোড়া। চল হে শশাঙ্ক।'

'একেবারে শুধু মুখে চলে যাবেন। একটু জলযোগ করে গেলে সুখী হতুম।'

'জলযোগ ? যেখানে সেখানে যোগ করার বয়েস কি আর আছে মশাই ? চলো হিমাংশু। আমার তিন কেজি ছোলাই লস হল তোমার জন্যে।'

হিমাংশু আসন ছেড়ে উঠতে উঠতে বললে, 'আজ্ঞে পেট্রল হলে লোকসানের পরিমাণটা আরো বেশি হত।'

'হ্যাঁ, তা অবশ্য হত। আমার গাড়ি আবার একটু বেশি তেল খায়।'

ঘোড়া ন্যাজ নেড়ে নেড়ে খড় খাচ্ছিল। কচোয়ান বাবুকে দেখে কোচবক্সের ঢাকনা খুলে খড় তুলে রাখল। হারানিধি ওঠার সঙ্গে সঙ্গে গাড়ি আবার দেবে গেল এক হাত।

মাথার ওপর বাতাস কেটে ছপটি ঘুরল। ঘোড়া ছুটল কদম কদম তালে। হঠাৎ বিনয়ের ভীষণ হাসি পেয়ে গেল। ঘরের একমাত্র সোফায় পা ছড়িয়ে বসে হো হো করে হেসে উঠল। সোফাটা তখনো দেবে আছে। বিনয় হাসছে আর বলছে, 'উরে বাপরে মানুষ, মানুষ।' শ্যামা ঘরে এসে অবাক। বিনয় কোন রকমে বললে, 'কি জিনিস এসেছিল গো। মেয়ের বিয়ের আগে জলছাদের ব্যবস্থা কর।'

ন্যাড়ার বেলতলা

আমি এক ন্যাড়া, একবারই বেলতলায় গিয়েছিলুম। আমি তাও ইচ্ছে করে যাইনি, অন্তত আমার নিজের সেই ধারণা। আমাকে টানতে টানতে নিয়ে গিয়েছিল। প্রত্যেক ন্যাড়ারই উচিত আর এক ন্যাড়াকে সাবধান করা। উচিত নয়, কর্তব্য। ন্যাড়াদের উদ্দেশে একটি রেকর্ড-সংগীত আছে :

ভ্রমরা আ, আ, ফুলের বনে মধু নিতে
অনেক কাঁটার জ্বালা
ও তুই যাসনে সেখানে
ন্যাড়াআ, ন্যাড়ারে কি হবে তোর
বেলতলাতে
যেমন আছিস বেশ তো আছিস একলা
মহাসুখে।

'শোন বিভূতি, আমাকে দেখে তোর শিক্ষা হওয়া উচিত। পাগলে বিয়ে করে, জন্মায় ছাগল তারপর শেষ অঙ্কের শেষ দৃশ্যে গিরিশচন্দ্রের প্রফুল্ল, ও হো হো আমার সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল। বেশ সুখে আছিস সাধ করে কেন ভূতের কিল খেতে যাবার ইচ্ছে।'

বিভূতিকে আমার সেভ করা উচিত। জীবনে অন্তত একটা ভাল কাজ করে যাওয়া উচিত। বিভূতি ব্যাটা একবারও বিয়ে করেনি। তাই ভাবছে বিয়েতে না জানি কত সুখ! ওগো, শুনছো, হ্যাঁগো! একমাস। টর্চের ব্যাটারি দেখেছিস! ক্রমশ জোর আর জেল্লা কমতে কমতে একসময় ফুস। এ ব্যাটারি এমন ব্যাটারি, ফেলতেও পারবি না। ওই ফতুর মালই সাজিয়ে রাখতে হবে। তোর জীবনের টর্চলাইটে ভরে রাখতে হবে।

বিভূতি গুনগুন করে গান গাইছে। হাঁটুর ওপর খবরের কাগজ। সিনেমার পাতাটা খোলা। সবে কায়দা করে চুল কেটেছে। শ্যাম্পু করেছে। এই গানটাই ও আজকাল অনবরত গুনগুন করেঃ পেয়ারকা বন্ধন, জনমকে বন্ধন, বন্ধন টুটে না আ আ।

'শোন বিভূতি, ওসব বাজে প্রেমমার্কা ফিল্মের গান ছাড়। প্রেম একধনের নেশা। রাতে আসে, সকালের খোয়াড়ি ভাঙতে জীবন বেরিয়ে যায়। যে জানে সে জানে, ভ্রমরা তুই বাসনে সেখানে।'

'আজ সিনেমায় যাব। কোনটায় যাই বল তো, দিলকা সংঘর্ষ, তেরা প্রেম মেরা প্রেম, দিলকা চাককু কোনটারই টিকিট পাব না। ইংরেজি কি হচ্ছে দেখি, লাভ সং, লাভার্স লেন, লাস্ট সামার। ও ঐ তো ঘাপটি মেরে বসে আছে এক কোণে রঙ্গিলী রাত। প্রফুল্ল, তিনটে ছটা নটা। দিস ইজ মাই ফিল্ম। ছটার শো নটার কিছু আগেই ভাঙবে। তারপর লাহোরে ঢুকে মুর্গা মসল্লাম। আহা পেয়ারকা বন্ধন। জনমকা বন্ধন।

'কি তখন থেকে ভ্যাজোর ভ্যাজোর করছিস।'

'আমাকে ছাখ, দেখে শেখ, প্রেম হল ঠুনকো কাচের গেলাস, আজ আছে কাল নেই। কেন সাধ করে মরবি। বেশ আছিস ব্যাচেলার আছিস, খাচ্ছিস দাচ্ছিস ভুঁড়ি বাগাচ্ছিস। হাজব্যাণ্ড শব্দটার মধ্যে একটা ব্যাণ্ড আছে খেয়াল করেছিস। সেই ব্যাণ্ড-টাই কলার ব্যাণ্ড হয়ে গলায় চেপে বসবে তখন আর খুলতে পারবি না।'

'তুই তখন থেকে একনাগাড়ে ভাঙচি দিচ্ছিস কেন বল তো। তোর কি স্বার্থ। বেশ করেছি প্রেম করেছি করবই তো।'

'আরে ছি ছি! এ কি একটা চিন্তাশীল, শিক্ষিত লোকের কথা হল রে! ওটা তো কোন এক গেঁয়ার গোবিন্দ বখাটে মেয়ের গানের কলি। আমার আবার স্বার্থ কি! তোর নিজের স্বার্থেই বলা। আমার বিবাহযোগ্যা মেয়েও নেই যে তোকে জামাই ঠাউরে কথা

বন্দর। আমার কথা হল পাখির মত। বেশ কেমন সহজ স্বাধীন জীবনদাঁড়ে বসে, কেন ইচ্ছে করে পায়ে শিকলি জড়িয়ে মরবি।'

'বাহুবন্ধন কাকে বলে জানিস? পেলব দুটি হাত যখন পেছন দিক থেকে এসে গলাটি জড়িয়ে ধরে, উঃ ফ্যানটাস্টিক। দেখ দেখ শরীরে রোমাঞ্চ হচ্ছে। শুনেছি শ্রীগৌরাঙ্গের হরিনাম করতে করতে এই রকম রোমাঞ্চ হত। পিঠ স্পর্শ করে আছে একটি উষ্ণ শরীর। ফুলের গন্ধ, নিশ্বাসে বুকের ওঠাপড়া। কানের পাশে ঠোঁটের সুড়সুড়ি। ও হো হো হু। গিরিফতারে উলফতে সইয়াদ।'

'শোন, শোন বিভূতি প্রথম প্রথম পেলব বাহু মনে হবে, পরে ওই বাহুই জামার কলার চেপে ধরবে। বোতাম ছিঁড়ে পড়ে যাবে, পরে আর বসিয়েও দেবে না। ওই উষ্ণ স্পর্শ ক্রমে গরম স্টোভের ছ্যাঁকা হয়ে পিঠ পুড়িয়ে দেবে। ফুলের গন্ধ হবে বোদা চুলের গন্ধ। মেয়েদের সাজগোজ শ্যাম্পু ম্যামপু যা কিছু বিয়ের আগে পর্যন্ত। ওসব স্টেজ পেরিয়ে এসেছি বলেই তোকে সাবধান করতে আসা।

'বস্ চুপ রহো, হমারেভি মুহমে জবান হ্যায়। তোর সাইকেলটা একবার দিবি, রঙ্গিলী রাতের দুটো টিকিট কিনে আনি। আগে ভাগে না কাটলে কোণের দিকে জোড়া সিট পাব না। পেয়ারের সংখ্যা এত বেড়ে গেছে!'

'না ভাই আত্মহত্যা করার জন্যে আমি সাইকেল দিতে পারব না। তুই হিন্দু সৎকার সমিতির সাহায্য নে।'

'ও, তোর জেলাসি হচ্ছে? তা হলে তোকেই আমি কাজের ভারটা দি। তুই দুটো টিকিট কেটে মধুছন্দার হাতে দিয়ে আয়। বলবি, ঠিক ছটায় প্রফুল্লর সামনে।'

'আমি?'

'ইয়েস তুমি। মধুছন্দাকে দেখেছ দোস্ত? তা হলে শোন, নেহায়ত পাগয়া নাসহাসাস উমর ভরকি লিয়ে। কি বুঝলে?'

'নাথিং। ও ভাষা তোমার প্রেমের ভাষা।'

'আমার প্রেমের বিরুদ্ধবাদী শ্যালকটি, যে ব্যাটা গায়ে পড়ে ঝগড়া দিতে আসত তার হাত থেকে সারা জীবনের মত ছুটি মিলছে।'

'না, খুন না, গাড়ি চাপা নয়। তাহলে? উসিকো ভেজ দিয়া ইয়ারকো খবর কে লিয়ে। সেই ব্যাটাকেই পাঠিয়েছিলুম আমার প্রেমিকার খবর নিতে। সেই যে সে গেছে আর ফেরেনি।'

'নাঃ ইউ আর এ লস্ট চাইল্ড। ষড়যন্ত্র করে তোর বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। আহা আঁহা এমন একটা জোয়ান ছেলে মেয়েছেলের খপ্পরে গিয়ে পড়লি? শেম শেম।'

'শেম শেম কিরে? বল গেম গেম।'

॥ ২ ॥

সাধু বললে, 'কি হল রে, ফেরাতে পারলি!'

'না রে টোপ গিলে বসে আছে, মধুছন্দার হাতে সুতো। এখন খেলাবে, খেলাতে খেলাতে খলবলে করে হয় তুলবে না হয় ছেড়ে দেবে!'

'মধুছন্দার চারে ভিড়েছে! মরেছে! সে তো তিন চার হাত ফেরতা খেলিয়ে মেয়েছেলে! বিভূতির বারোটা বাজিয়ে ছেড়ে দেবে।'

'ছেড়ে দেয় দেবে। যে দেখে শিখবে না, সে ঠেকে শিখুক!'

'না না, হাল ছাড়লে চলবে না রে। বিভূতিই আমাদের একমাত্র ভরসা। ওর বাড়িটাই আমাদের ওয়েসিস। আমাদের শেষ মাসের মহাজন। ওখানে মধুছন্দা ঢুকে পড়লে আমাদের কি হাল হবে বুঝতে পারছিস না এখন। বিভূতি গেল, প্লাস আমরাও গেলুম।'

'মহা ফাঁপরে পড়া গেল। মধুছন্দা নিজে না ছেড়ে দিলে ওকে ছাড়ানো শক্ত। কচ্ছপের কামড়, বুঝলি সাধু, কচ্ছপের কামড়!'

'মধুছন্দা সহজে ছাড়বে না রে। বারবার তিনবার। মধুছন্দার বয়েস হয়েছে, এই তার শেষ শিকার। মাছটাও তো খারাপ নয়।'

'কাল তাহলে আর একবার চেষ্টা করে দেখব। শেষ চেষ্টা। বাবু আজ সিনেমায় গেলেন। তার মানে প্রেম আরও দু-কদম এগিয়ে গেল। তোর সে বইটা আমাকে একবার দে তো!'

'কোন বইটা?'

'নামটা মনে নেই, তোর বই রাখার জায়গায় চল, দেখলেই চিনতে পারব।'

'আবার বাড়ি ঢোকাবি? এইমাত্র এক পশলা হয়ে গেল। আকাশ এখন গুম মেরে আছে।'

'সামান্য একটা মেয়েছেলেকে অত ভয় পাসনি তো। যত ভয় করবি তত পেয়ে বসবে। পুরুষ হ। পৌরুষ দেখা। তোর অমন গোঁফ, এমন চেহারা! মিনমিন করিস কেন? চল।'

পরের দিন সকালেই বই বগলে বিভূতির বাড়িতে হাজির। মেঝেতে আসন পেতে সামনে ছোট আয়না রেখে ভীষণ মনোযোগ সহকারে দাড়ি কামানো চলছে। আমি ঢুকেই দেখলুম মুখ ওপর দিকে তুলে হাতের তালু উল্টোদিকে ঘষে ঘষে বিভূতি গালের মসৃণতা পরীক্ষা করছে। ঠোঁটের ওপর গতকাল বিকেলেও যে গোঁফটা ছিল সেটা নেই।

'তোর গোঁফ?'

'বিসর্জন দিয়ে দিলুম। মধুছন্দা গোঁফ পছন্দ করে না। কাল যেই বললে আমার গুঁফো মুখটা ঠিক বিশ্বকর্মার মত দেখাচ্ছে, তখনই বুঝলুম প্রশংসা নয়, নিন্দেই করলে। যদি বলত কার্তিক, তাহলে এতদিনের জিনিসটা রেখেই দিতুম। বুঝলি না, বিশ্বকর্মা তেমন ইনটেলেকচ্যুয়াল দেবতা নয়। ইন্দ্রের দেবসভায় তাকে বসতে দেয় না। উর্বশী, রম্ভা তার সামনে ক্যাবারে নাচে না।'

'তা বলে তুই মেয়েছেলের কথায় তোর অমন চাষ করা গোঁফটা

ফেলে দিলি। এইভাবে তুই প্রেমের কাছে বিকিয়ে গেলি। শ্যামসনের কথা মনে আছে তো। মেয়েছেলের কথায় বেচারা চুল ফেলে দিয়ে ভেড়া বনে গেল। এরপর তোকেও তো ন্যাড়া করে ছেড়ে দেবে।'

'দেয় দেবে, তবু প্রেম যুগে যুগে। প্রেমেরও 'সমাধিই তীরে এ এ, হেহে পরের লাইনটা কি রে! সুরটা মনে আছে বাণী মনে আসছে না। এই সময়ে মেমারিটাও বিট্রে করছে রে। যৌবনের সেই সব গানটান আবার ঝেড়ে ঝুড়ে বের করতে হবে। প্রেম সেই এলে, রেল কম্পানি গাড়ির মত কেন এলে লেটে।

না, একে আর বাড়তে দেওয়া উচিত নয়। ঝট করে বইটা খুলে ফেললুম। মার্কা দিয়েই রেখেছিলুম। বিভূতি আর কিছু বলার আগেই হুড়হুড় করে পড়তে শুরু করলুম, যেন দমকল। হোস পাইপ দিয়ে আগুনে জল ঢালছি: শ্রীরাম বলিলেন—শিরা, কঙ্কালগ্রন্থি ও মাংসময় রমণীর প্রত্যঙ্গে যথার্থ শোভার জিনিস কি আছে? হে জীব! রমণীর খঞ্জননিন্দিত লোচন, চর্ম, মাংস, রক্ত এই সব বিশ্লেষণ করিয়া দেখ, যদি ঐ সব বস্তু রমণীয় হয় তো উহাতে আসক্ত হও, নতুবা অযথা উহাতে আসক্ত হও কেন। এখানে কেশ, ওখানে নখ, সেখানে রক্ত, এই সবের সমবায়েই তো রমণীর শরীর। সুতরাং বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই কদর্য নারীদেহ লইয়া কী করিবে? অহো! রমণীর যেসব অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বস্ত্র ও অনুলেপনাদি দ্বারা ভূষিত হইয়া থাকে, শৃগাল প্রভৃতি মাংসাশী জীব সেই সকল অবয়ব ভক্ষণ করে। যে স্তনযুগলে মুক্তহারের কমনীয় শোভা নেত্রগোচর হইয়া থাকে, রমণীর সেই কমনীয় পয়োধর কালে, শ্মশানের প্রান্তদেশে সারমেয়গণ কর্তৃক মাংসপিণ্ডের ন্যায়···

বিভূতি উঠে পড়ল, 'তোর পরীক্ষা-টরিক্ষা আছে বুঝি। ডিপার্ট-মেণ্টাল পরীক্ষা!'

'তার মানে?'

'না গড় গড় করে কি সব পড়ে যাচ্ছিস, আবোল তাবোল।

পরীক্ষা মানেই তো যতসব ঝড়তি-পড়তি মাল পড়া আর সেই সব মাল উগরে দেওয়া।'

'এসব ঝড়তি-পড়তি নয় বৎস, জীবনের আসল জিনিস, উপলব্ধির কথা। শ্রীরামচন্দ্র বশিষ্ঠ মুনির কাছে বলছেন—হোয়াট ইজ এ মেয়েছেলে। মদ্যে ও মদির-নয়না রমণীতে কোনই প্রভেদ দেখা যায় না। কেননা মত্ততা ও মদোন্মত্ততা দ্বারা চিত্তের বিকার উৎপন্ন করা উভয়েরই ধর্ম। মানবরূপী সুষুপ্ত হস্তিগণ রমণীরূপ বন্ধনস্তম্ভে আবদ্ধ থাকিয়া শমরূপ দৃঢ় অঙ্কুশাঘাতেও প্রবুদ্ধ হয় না।'

'দাঁড়া দাঁড়া, দুটো শব্দের মানে বল, শম মানে কি, প্রবুদ্ধ মানে কি। বড় কঠিন বাংলা রে, কোত্থেকে এ মাল আমদানি করলি। এখন বুঝছি সীতার বিবাহিত জীবনের বারোটা কেন বেজেছিল!'

'শম মানে সংযম, প্রবুদ্ধ মনে জাগা। সংযমের জুতো পেটালেও মানুষের ঘুম ভাঙে না। শুয়ে শুয়ে স্বপ্ন দেখে। কজ্জল ও কুণ্ডলে শোভিতা, প্রিয়দর্শনী রমণী, দুষ্কৃতিরূপ অগ্নি শিখারূপিণী হইয়া পুরুষকে তৃণের ন্যায় দগ্ধ করিয়া থাকে। রমণীরূপ প্রমত্ত হস্তী রমরূপ বন্ধনস্তম্ভে রতিশৃঙ্খল দ্বারা বদ্ধ হইয়া মৃকের ন্যায় অবস্থান করে।'

'রতিশৃঙ্খল মানে কি রে!'

'ওই আর কি। বলতে লজ্জা করছে, এই আদরটাদর, ইয়ে টিয়ে। রামচন্দ্র কি বলছেন শোন, রমণীর স্তন, চক্ষু, ভ্রূ, নিতম্ব যাহাই ধরি না কেন, মাংসই তো সে সকলের সার পদার্থ। এইরূপ অপদার্থ বস্তু লইয়া আমি কি করিব?'

'বা বা, তাহলে সীতাকে বিয়েই বা করলে কেন? আর লব-কুশকেই বা আনলে কেন? দাঁড়া আমিও একটা বই বার করছি।'

বিভূতি তাক থেকে খুঁজে খুঁজে একটা বই নিয়ে এল।

'কি বই রে!'

'চার্বাক। শোন, এইবার তুই কান খাড়া করে শোন যাবজ্জীবম সুখং জীবেৎ নাস্তি মৃত্যোরগোচরঃ। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই যখন সমস্ত

কিছুর উচ্ছেদ তখন ইউ ড্রিঙ্ক অ্যাণ্ড বি মেরি। সুখই জীবের লক্ষ্য এবং সব সুখের সেরা সুখ অঙ্গনা-লিঙ্গাদি-জন্যং সুখম এব পুরুষার্থঃ। সুন্দরী রমণী দেখলেই জড়িয়ে ধর। তোর ওই রাবিশ বইটা বগলদাবা করে কেটে পড়। গেট আউট। আমার এখন অনেক কাজ।'

'তুই তাহলে বিয়ে করবিই।'

'হ্যাঁ, করব। অবশ্যই করব। প্রেম একদিনই এসেছিল জীবনে আমার এ দুয়ার প্রান্তে…'

'গান রাখ। বিয়ের পরই অ্যাণ্ডাগ্যাণ্ডা রবারক্লথ, মুতো কাঁথা চ্যাঁ ভ্যাঁ। বাড়ির এই পরিবেশ থাকবে?'

'বুড়ো বয়েসে তুই দেখবি আমাকে?'

'তোর বউ দেখবে। আজকালকার মেয়েরা সেবা জানে?'

'জানুক না জানুক সুখম এব পুরুষার্থ। যা ভাগ। তোর সাধুর কাছে যা।'

॥ ৩ ॥

আজ বিভূতির বিয়ে।

দূর থেকে দেখছি বিভূতি একটা রিকশা চেপে আসছে। কোলের ওপর একটা টোপর। পায়ের কাপে একটা চটের ব্যাগে হরেক রকমের জিনিস। গোটা কতক তীরকাঠি উঁকি মারছে। মুখটা শুকিয়ে গেছে। নিজের টোপর নিজেই কিনেছে, নিজের বিয়ের বাজার নিজেই করেছে। উপায় কি! কেউ তো নেই। পৃথিবীতে বিভূতি একা। কাকার তরফে অনেক ডালপালা, কিন্তু মুখ দেখাদেখি নেই। ছিরি, বরণডালা, জলসওয়া, নান্দিমুখ, গায়ে হলুদ, সাত সতের ঝামেলা কে সামলাবে!'

'কি রে বিভূতি? দাঁড়া দাঁড়া। কি রে, কেউ এসেছে?'

'কে আর আসবে? কে আছে আমার?'

'রেজেস্ট্রি করলেই পারতিস।'

'না রে। মার খুব ইচ্ছে ছিল বউ দেখে যাবেন। তখন তো উপায় ছিল না। মা বলেছিলেন, আর যাই করিস নিকে করে আনিসনি। মাকে কথা দিয়েছি, রাখতেই হবে, চলি রে। '

'তুই জানিস তো।'

'কি?'

মধুছন্দার টিবি হয়েছিল, তোর আগে তিনটে ছেলে ধরেছিল।'

'সব জানি। জানি বলেই তো বিয়ে করেছি। বিধবা, ঠোকরানো মেয়েকে আমি না বিয়ে করলে কে করবে। এই চালা চালা।'

আমার সামনে দিয়ে বিভূতি চলে গেল। ন্যাড়া বেলতলায় গেল। তাই কি?

আজ আছি কাল নেই

'কে দীনবন্ধু নাকি ? এখানে অন্ধকারে ঘাপটি মেরে বসে আছো ?'

'আরে ভবেশ নাকি ? তুমি এ সময়ে ! কোথায় চললে ? বাড়ি ঢুকলে না ? আমার পাশ দিয়েই তো হুরমুশ করতে করতে গেলে, বেরিয়ে এলে কেন ? অফিস থেকে ফিরলে, চা জলখাবার খাবে। কুশল বিনিময় করবে সারাদিনের পর। এমন আধলা ইট খাওয়া লেড়ি কুকুরের মত মুখ কেন গো ?'

'তোমার পাশে একটু স্থান হবে ভাই ?'

'হবে, বারোয়ারি রক্, ধুলো ঝেড়ে বোসো। বেশি ওপাশে যেও না। কেলো এইমাত্র বেপাড়ার এক মস্তান কুকুরের সঙ্গে চুলোচুলি করে এসে সবে ল্যাজ গুটিয়ে শুয়েছে। মেজাজ চড়ে আছে। ঘাঁক করলেই তলপেটে চোদ্দটা।' ফুঁফুঁ করে ধুলো উড়িয়ে ভবেশ বসে পড়ল। বসার সময় হাতের আঙুলে কি একটা ঠেকল! দীনবন্ধুর বাজারের ব্যাগ। কপি, মুলো, ভিজে ভিজে পালংশাক চারপাশে ছেদরে আছে। দীনবন্ধু অফিস থেকে ফেরার পথে রোজই বাজারটা সেরে আসে। অভ্যাসটা মন্দ নয়। শীতের ছোট্ট সকালে খানিক সময় বেরোয়। একটু তারিয়ে তারিয়ে দাড়ি কামানো যায়। নয়ত তাড়াহুড়োয় ধরো আর মারো টান। ছাল-চামড়া গুটিয়ে সাফ।

ভবেশ বলল, 'একি বাজার নিয়ে বসে আছো ? দু'কদম এগোলেই তো বাড়ি। বাজারটা রেখে এলেই পারতে। এই নোঙরায় ফেলে রেখেছো ? পালমে ইনফেকসান ঢুকবে।'

দীনবন্ধু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'হাতে ঘড়ি নেই, কটা বাজল তোমার ঘড়িতে ?'

'আটটা বাজতে দশ।'

'উঃ এখনো ঝাড়া দেড় ঘণ্টা '

'হ্যাঁরে ভাই ঝাড়া দেড় ঘণ্টা।'

'বুঝতে তাহলে পেরেছো কেন বসে আছি?'

'হ্যাঁরে ভাই পেরেছি। একটু চা হলে মন্দ হত না।'

'এখান থেকে হেঁকে বিভূতিকে বলো, ভাঁড়ে দুটো চা। দুটো লেড়ো বিস্কুটও দিতে বলো।'

দীনবন্ধু আর ভবেশ খান ছয় বাড়ির ব্যবধানে থাকে। দুজনেই ভাল চাকরি করে। নির্বিরোধী ভদ্রলোক বলে পাড়ায় যথেষ্ট সুনাম আছে। এ তল্লাটে সস্তায় জমি পেয়ে দুজনেই বাড়ি তৈরি করে স্ত্রী-পুত্র-পরিবার নিয়ে সংসার-ধর্ম পালন করছে। সেই কথায় আছে, খাচ্ছিল তাঁতি তাঁত বুনে, কাল হল তাঁতির এঁড়ে গরু কিনে। দুজনের বাড়ির ছাদের দিকে তাকালে দেখা যাবে পাঁচটি করে অ্যালুমিনিয়ামের আঙুল আকাশের গায়ে ঈশ্বরের আশীর্বাদ খুঁজছে। চ্যাটালো তার বেয়ে সেই আশীর্বাদ ভেন্টিলেটার গলে কাঁচের পর্দায় কখনো নৃত্যে, কখনো কথকথায়, কখনো সঙ্গীতে গলে গলে পড়ে। সবচেয়ে মারাত্মক দিন শনিবার। সেদিন হয় বাংলা, না হয় হিন্দী ছায়াছবি। গেরস্থের আর্তনাদ, প্রাণ যায়।

অদ্য সেই শনিবার। বাংলা ছায়াছবির আসর, অশ্রুসিক্ত ছবি। খটখটে ছবি হলেও দর্শকের অভাব হয় না। পালে পালে পিলপিল করে আসতে থাকেন নেণ্ডিগেণ্ডি, পুঁচিপেঁটকি নিয়ে। দীনবন্ধু টিভি কিনেছিল এরিয়ারের টাকায় স্ত্রীকে খুশি করার জন্যে। আহা। একা একা বাড়িতে থাক, সন্ধেটা তোমার ভালই কাটবে। স্ত্রীও খুব নেচেছিল। টিভি আসবে শুনে আহ্লাদে আটখানা হয়ে কচুরি ভেজে স্বামীকে খাইয়েছিল। জুট কার্পেট পাতা লবিতে টিভি সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হলেন। ছাদে ফোঁস করে ফুঁসে উঠল টিভিঙ্গুলি। সারা

পাড়াকে জানান দিতে লাগল, আমি এসেছি, আমি এসেছি। তোমরা এস হে। একবার বুঝিয়ে দিয়ে যাও কত ধানে কত চাল।

ভবেশ টিভি কিনেছিল গৃহবন্দী, অবসরভোগী বৃদ্ধ পিতার সান্ধ্যসঙ্গী হিসেবে। দোতলায় পিতার সুবৃহৎ শয়নকক্ষে নীল পর্দা আঁটা সেই যন্ত্র এখনও শক্তিশালী যন্ত্রণা। ডজনখানেক বিভিন্ন স্বভাবের বৃদ্ধের পীঠস্থান। তাঁদের হাঁচি, কাশি, নাসিকাঝর্তন, কলহ, মতামত প্রকাশের ঘনঘটায় প্রতিটি সন্ধ্যা ভবেশকে স্মরণ করিয়ে দেয়, য পলায়তে স জীবতি।

দুই কৃতকর্মভোগী কৃতী পুরুষ পাঁচুবাবুর রকে বসে ভাঁড়ের চা খাচ্ছেন। মশা তাড়াচ্ছেন। নর্দমার চাপা গন্ধ শুঁকছেন আর মনে মনে বলছেন, একেই বলে, বাঁশ কেন ঝাড়ে আয় মোর হিন্দিস্থানে। ভাঁড়টাকে সাবধানে পায়ের তলার বদ্ধ নর্দমায় বিসর্জন দিয়ে ভবেশ বললে, ভট করে চা খেয়ে ফেললুম, বড় বাইরে পেলে মরব।

মরবে কেন? বাড়িতে গিয়ে নামিয়ে আসবে।

বাথরুম খালি পেলে তো! বারোটা শর্করারোগী মিনিটে মিনিটে ছুটছেন, আর প্রতিবার হাতে জল নিয়ে সেইখানে আর গোড়ালিতে শাস্ত্রসম্মত ঝাপটা মারছেন। চোখ বুজিয়ে বাথরুমের অবস্থাটা একবার অবলোকন করার চেষ্টা কর ভাই। কর্পোরেশনও লজ্জা পাবে।

তোমার বাথরুম? আমি মানসচক্ষে আমার বসার ঘর দেখছি আর আঁতকে আঁতকে উঠছি।

দীনবন্ধুর বসার ঘর ঠেসে গেছে। অনাহুতরা সারি সারি বসে আছেন বিশিষ্ট অভ্যাগতদের মত। কাউকেই ফেরাবার উপায় নেই। শত্রুতা বেড়ে যাবে। বলে বেড়াবে বেটার অহঙ্কার হয়েছে। ভগবানের গুনছুঁচ যেদিন বেলুন ফুটো করে দেবে সেদিন চামচিকির মত চুপসে গাবগাছের তলায় পড়ে থাকবে। দীনবন্ধুর স্ত্রী শাপশাপান্তকে ভীষণ ভয় পায়। লাল আলোয়ান গায়ে ওই যে বসে আছেন মিন্টুর দিদিমা। দু হাঁটুতেই বাত। অন্য সবাই মেঝেতে কার্পেটের ওপর থেবড়ে

আছেন, তিনি বসেছেন সোফায়। মুখপোড়া বাত আর জায়গা পেলে না, ধরল এসে হাঁটুতে। 'কত্তা যাবার সময় ওইটি দিয়ে গেলেন।' গোবিন্দের মা কোণের দিক থেকে বললেন, 'ও কথা বলছেন কেন, কত্তা একটা বাড়ি রেখে গেছেন, তিনটি ছেলে দিয়ে গেছেন, চার মেয়ে। আর কি চাই?'

'আ মোলো কথার ছিরি দেখ। আমরা আজকালের বিবি ছিলুম না তোমাদের মত। সারা জীবন পেটে একটা কিছু না থাকলে আমাদের কালো শরীরটা খালি খালি মনে হত। কত্তা গর্ব করে বলতেন, সুখদা আমার ইঁদুরকল, একটু ঠুকরেছ কি অমনি ঝপাং। হাত ঠেকালেই সোনা। তোমরা হলে ফাঁকিবাজ। একটা কি দুটো অমনি ছুটলে। কাটিয়ে কুটিয়ে ফাঁকা হয়ে ফিরে এলে।'

দীনবন্ধুর স্ত্রী বিরক্ত হয়ে বললে, 'কি হচ্ছে দিদিমা? বাচ্চারা বসে আছে।'

'তুমি আর সাউকুড়ি করতে এসো না। ওরা সব বাচ্চার বাবা। দেখলে না ঠুলির বিজ্ঞাপনের সময় কি রকম হাসাহাসি করছিল! তুমি মা এযুগের মেয়ে। তুমি ওসব বুঝবে না। তোমরা হলে মেয়ে-মানুষ। আমাদের কালে মুতের কাঁতা শুকোতে পেত না। দাও এক গেলাস জল দাও। আ মর, সিনেমা বন্ধ করে মাগী সেই থেকে বকেই মরছে। আহা কি রূপের ছিরি। চুলে বব করে বসে আছেন। বুকের দিকে না তাকালে ছেলে কি মেয়ে বোঝে কার বাপের সাধ্য।'

বুলডগের মত মুখ করে মিন্নুর দিদিমা পাগলে পাগলে হাওয়া খেতে লাগলেন।

একেবারে লাগোয়া বাড়ির চার বউ রেলের পিস্টনের মত আসা যাওয়া করছেন। স্থির হয়ে বসার উপায় আছে কি? পাশে ছড়ানো সংসার। টিয়াপাখির ঠুকরে ঠুকরে পেয়ারা খাবার কায়দায় চার বউয়ের টিভি দেখা চলেছে। ব্যোমে পায়রা বসার মত। বড় বউ

যেন দিশি গোলাপায়রা। বয়সের মাঝ সমুদ্রে বয়ার মত শরীর। তিনি একটি বেতের মোড়া দখল করেছেন।

তাঁর সন্তানসন্ততিতে চারপাশে গোল করে মাকে ঘিরে রেখেছে। বসতে না বসতেই তাঁর খেয়াল হল, আলমারির গায়ে চাবিটা ঝুলিয়ে রেখে এসেছেন। সৃষ্টি পড়ে আছে আলমারিতে। দিনকাল ভাল নয়। বড় মেয়েকে বললেন, 'চাবিটা নিয়ে আয় তো।' বড় মেয়ে ছবিতে মশগুল। প্রেমিক প্রেমিকাকে নিয়ে গাড়ি চালাতে চালাতে গান ধরেছে, এই পথ যদি না শেষ হয়, তবে কেমন হত ? লাল্লা লালা লালা। বড় বললে, 'থাক না'। মা একটা চাপা হুঙ্কার ছাড়লেন, 'টিভি দেখা ঘুচিয়ে দেব তোর।' মেয়ে অন্যমনস্কে উত্তর দিল, 'যাও যাও সব করবে।' মা হুহুঙ্কারে বললেন, 'দেখবি ?'

মিনুর দিদিমা বললেন, 'ছুটোকেই বের করে দাও।'

বড় বউ মুখ বেঁকিয়ে ভেংচি কেটে বললেন, 'কত বড়ো সাহস। যার ধন তার ধন নয় নেপোয় মারে দই। আপনি বের করে দেবার কে ?'

মিনুর দিদিমা হুঙ্কার ছাড়লেন দীনবন্ধুর স্ত্রীকে, 'বউমা, বউমা।'

বড় বউ ততোধিক জোরে বললেন, 'বউমা কি করবে ? বউমা এসে আমার মাথা কেটে নেবে ?'

টিভির পর্দায় নায়ক নায়িকারা তখন কোরাসে চেল্লাচ্ছেন, লা লালা, লাল্লা, লাল্লা।

মেজ বউটি যেন সিরাজু পায়রা। লাট খেতে খেতে এলেন এসেই বললেন, 'যাও, দেখগে যাও, তোমার নতুন সুজনিতে ছোটর ছেলে পেচ্ছাব করেছে।'

'তোশক ভিজেছে, তোশক ভিজেছে ?' বড় বউ মোড়া ছেড়ে লাফিয়ে উঠলেন। ধাক্কায় মোড়া কাত হয়ে মহাদেবের ডম্বরুর মত গড়াতে গড়াতে গদাইয়ের মার কোলের ছেলেটার মাথায় গিয়ে খোঁচা মারল। আঁচলচাপা ছেলে চুকুর চুকুর দুধ খাচ্ছিল। অষ্টপ্রহর তিনি

চুষতে না পেলে চিল্লে বাড়ি মাথায় করেন, মোড়ার খোঁচায় বোঁটা ছেড়ে তিনি 'হাইফাই' স্পিকারের মত ওঁয়া ওঁয়া, হোঁয়া⋯ওঁয়াও করে মিউজিক ছাড়লেন। প্রেমিক প্রেমিকার 'তুমি, তুমি' হুইসপার চাপা পড়ে গেল। মেজ পুতুল নাচের ধসে পড়া পুতুলের মত জমির হাতখানেক ওপর দিয়ে লাট খেয়ে একপায়ে ঝপাত করে বসে পড়ে বললেন, 'কার মিউজিক? কার মিউজিক রে?'

পম্পা, শম্পা, চম্পা তিনি বোন। বাপ মা দু'জনেই চাকুরে। মাথায় মাথায় তিন বোন। পম্পা শরীরের চেয়েও ঘেরে বড় ম্যাকসি পরে, একবার করে আসছে, বসছে, আবার বেরিয়ে যাচ্ছে। আসা আর যাওয়ার পথে পোশাকের ধাক্কায় সাইক্লোন বয়ে যাচ্ছে। প্রথমে উল্টে গেল দাঁড়া টেবিলল্যাম্প। শেডফেড ছিটকে চলে গেল। মিনুর দিদিমা বললেন, 'দিনুর কাণ্ড দেখ। মাথার ওপর এত আলো, তাতে হচ্ছে না। ব্যাঙের ছাতার মতো আলো গজিয়েছে মেঝে থেকে।'

দ্বিতীয়বার ছিটকে পড়ল কাটগ্লাসের অ্যাশট্রে। সিগারেটের টুকরো, ছাই, দেশলাই কাঠি কার্পেটের ওপর ছত্রাকার। তার ওপর থেবড়ে বসলেন পাশের বাড়ির সেজবউ। বসতে বসতে বললেন, 'বেশিক্ষণ বসবো না। ডাল চাপিয়ে এসেছি।' যেন সমবেত মহিলামণ্ডলী তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিল তিনি কতক্ষণ বসবেন? কেন বসবেন না?

হঠাৎ সামনের সারির এক বাচ্চা আর একটা বাচ্চায় ঝুঁটি ধরে বেশ বারকতক ঝাঁকিয়ে দিল। লেগে গেল দুজনে ঝটাপটি। তার-ফার ছিঁড়ে লণ্ডভণ্ড হবার আগেই দিনুর বউ দৌড়ে গিয়ে দু'জনকে দু'পাশে সরিয়ে দিল। এ বলে তুই বাপ তুললি কেন, ও বলে তুই বাপ তুললি কেন? দিনুর বাড়ি যে মহিলা কাজ করেন, এরা তার বংশপরম্পরা। কান ধরে বার করে দিলে কাল থেকে তিনি আর কাজে আসবেন না। দুজনকে দুকোণে বসাতে হল। সেখান থেকেই তারা মুখে ভ্যাঙাভেঙি করতে লাগল। একজনের বই ভাল লাগেনি, সে হাত পা ছড়িয়ে

ফ্ল্যাট হয়ে পড়ে আছে। ঠ্যাং ধরে টেনে সরিয়ে দেবার উপায় নেই। এখুনি বাড়ি ঘেরাও হয়ে যাবে। দীনের বন্ধুরা এসে দিনুর মাথা কামিয়ে, ঘোল ঢেলে ছেড়ে দেবে।

বড় বউ লাফাতে লাফাতে ফিরে এসে মেয়েদের হুকুম করলেন, 'যা ছোটর বিছানায় করে আয়। ভাসিয়ে দিয়ে আয়।' মেজ হাতের তালুতে চিবুক রেখে দাঁত চাপা সুরে বললেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ করে আয়, যেমন, বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুল।'

যে মেয়ে চাবি আনতে রাজি হচ্ছিল না, ঝগড়ার গন্ধ পেয়ে সে তীর বেগে ছুটল। ছোট মেয়ে বোকা বোকা, সে ক্রমান্বয়ে জিজ্ঞেস করতে লাগল, 'দিদি কি করতে গেল মা?' ওপাশ থেকে কে একজন বলে উঠল 'হিসি।'

দিনুর স্ত্রী থাকতে না পেরে রাগ রাগ গলায় বললে, 'টিভি বন্ধ করে দি।'

মিনুর দিদিমা বললেন, বাড়িতে বায়োস্কোপ বসালে অমন একটু হবেই মা। অধৈর্য হলে চলে?

নায়ক নয়িকাকে একটু আদর-টাদর করছিলেন। কোণের দিকে বখা বাচ্চাটা সিক করে সিটি মেরে উঠল। ওরই মধ্যে প্রবীণা একজন আপত্তি করলেন, 'এতটা বাড়াবাড়ি ভাল নয়। ভদ্দরলোক ছোটলোক এক হয়ে গেলে যা হয়।'

ব্যাস লেগে গেল ধুন্ধুমার। 'ছোটলোক, কথার ছিরি ছাখো। নিজে ভারী ভদ্দরলোক। ছেলে তো ছমাস বাইরে ছমাস ভেতরে।'

মিনুর দিদিমা হঠাৎ বলে উঠলেন, 'হ্যাঁগা, এই বুঝি তোমাদের উত্তমকুমার?'

পম্পা পাল তুলে ফড় ফড় করে চলে গেল। বাতাসে দেয়াল থেকে ক্যালেণ্ডার খসে পড়ল। পম্পা হ্যাটট্রিক না করে ছাড়বে না জানা কথা। দৃকপাত নেই। বসেই একগাল হেসে বললে, 'কি সুন্দর!'

বড়র মেয়ে ফিরে এসে বললে, 'ওদের চাদরে হলুদের হাত মুছে দিয়ে এসেছি। গোদা পায়ের ছাপ মেরে এসেছি।'

সেজবউ বললে, 'কাজটা ভাল করনি।'

মেজ বললে, 'কেন করেনি? বেশ করেছে। ওদের সঙ্গে ওই-রকমই করা উচিত। যেমন কুকুর তেমন মুগুর। শাস্ত্রে আছে।'

সেজ বললে, 'বাচ্চা ছেলে শীতের সময় একটু করে ফেলেছে। তোমরা দুজনে আদাজল খেয়ে মেয়েটার পেছনে লেগেছ।'

'তোমাকে যে উল দিয়ে হাত করেছে। তুমি তো বলবেই।'

দীনবন্ধু ভবেশকে বললে, 'আর তো পারা যায় না। সময় যে চলতে চায় না। বাজল কটা?'

'প্রায় মেরে এনেছি।'

কুকুরটা উঠে দাঁড়িয়ে গা ঝাড়া দিল। দীনু বললে, 'এ ব্যাটাও পেছনে লেগেছে। সেই থেকে খ্যাচর খ্যাচর গা চুলকাচ্ছে আর ভটাস ভটাস গা ঝাড়া দিচ্ছে।'

ভবেশ ঘড়ি দেখে বললে, 'এবার ওঠা যেতে পারে। শেষ হয়েছে সিনেমা।'

বাড়ি ঢুকে দীনবন্ধু প্রথমে গেট বন্ধ করল। দুটো পাল্লাই হাট খোলা ছিল। সদরে ঢোকার মুখে খেড়ে পাপোস পায়ের ধাক্কায় মাতালের মত কাত হয়ে পড়েছিল। দিনু ধুলোসমেত টেনেটুনে সেটাকে যথাস্থানে নিয়ে এল। টেবিল ল্যাম্পটাকে সোজা করে দাঁড় করাতে করাতে বললে, 'এটা কি হয়েছে! হকি খেলেছিল নাকি?'

দিনুর স্ত্রী বললে, 'ওই রকমই হবে।'

'এ কি দামী অ্যাশট্রে, এখানে উল্টে পড়ে আছে! তোমরা সত্যি! মিনুর দিদিমা সিগারেট খাচ্ছিল?'

দিনুর স্ত্রী বললে, 'একটা কথা নয়। ওইরকমই হবে।'

'একি এখানে কে চীনাবাদামের খোসা জড়ো করেছে? তুমি সত্যি একেবারে কাছাকোঁচা খোলা।'

'ওইরকমই হবে।'

'তার মানে? সামনের শনিবার স্টেট বলে দেবে, হবে না, ঢুকতে দেওয়া হবে না।'

'আমি পারবো না, পারলে তুমি বোলো।'

দিনু চাপা গলায় বললে, 'আপদ।'

'তোমারই আমদানি।'

'দীনু কার্পেটের ওপর ঝাড়ু চালাতে চালাতে বললে, 'ধূপ জ্বালো, ধূপ। সারা ঘর ভেপসে উঠেছে।'

টিভির সামনে এসে মনে মনে সেই প্রার্থনা আবার জানাল: 'হে পিকচার টিউব, দয়া করে বিকল হও।'

ওদিকে ভবেশ বৃদ্ধ সিধু জ্যাঠাকে বাড়ি পৌঁছে দিতে দিতে একই প্রার্থনা বিধাতার দরবারে পেশ করল। বৃদ্ধ কাশতে কাশতে বললেন, 'চোখে ছানি, দেখতে পাই না, তবু সময়টা বেশ কাটে। একটা হিসেবও পাওয়া যায়, কে রইল কে গেল। আজ আছি কাল নেই।'

ট্রিটমেণ্ট

জিভ বের করুন—হুঁ।

হ্যা করুন—হুম। চশমা খুলুন, দেখি, চোখ দেখি। হুম।

চোখটা বেশ লাল হয়েছে। চুলকোয়, কড়কড় করে। ক্লোরোমাই-সিটিন অ্যামিক্যাপ…'

আমার কাছে বলে লাভ নেই। চোখের ডাক্তার দেখান। দেখি জামাটা তুলুন। না না গেঞ্জি তোলার দরকার নেই।

নিশ্বাস। জোরে জোরে। পেছন।

হুম, ভেতরে চলুন।

সুইং দরজা ঠেলে ভেতরের ঘরে। ঢুকেই বাঁ দিকে জানালা ঘেঁসে উঁচু বেনচ। পলিথিনের চাদরে ঢাকা বিছানা। মাথার দিকে নিরেট বালিশ। উঠে শোবার জন্যে পাইন কাঠের দুটো স্টেপ। সামনের দেয়ালে রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের বড় ছবি। তলায় লেখা, জীবে দয়া করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। তার তলায় ব্যায়রাম = ব্যয় করলেই আরাম।

নিন শুয়ে পড়ুন। দেখে, দেখে, জানলার পাললা। বাবা, কত কি পরে বসে আছেন মশাই! করেছেন কি?—পেট খালি করুন, খালি করুন। লাগে? লাগে?

এই লিভারের কাছটায় যেন…

লিভার কি স্টম্যাক জানি না। যেখানটা টিপছি সেখানটায় লাগে কি না?

একটু যেন লাগছে।

হুম। উঠে পড়ুন। সাবধান, জানলা।

আমাকে সাবধান করে, ডক্টর চৌধুরী পুবদিকের দেয়ালে ফিট করা ওয়াশ বেসিনে হাত ধুতে গেলেন। ডক্টর নিরঞ্জন চৌধুরী, এম আর সি পি লণ্ডন, এম ডি ক্যাল, ডি টি এম, এফ আর এস, সি আই এফ, এফ ও বি ডক্টর জনার্দন চৌধুরীর ছেলে।

নামবো ?

নামবেন না তো কি বসে থাকবেন।

ভয়ে ভয়ে নেমে পড়লুম। নামবার সময় পা লেগে কাঠের ধাপ ছুটো সরে গিয়ে একটু টাল খেয়ে গেলুম। তোয়ালেতে হাত মুছতে মুছতে ডাক্তার জিজ্ঞেস করলেন, প্রেসার আছে ? মুখটা কাঁচুমাচু করে বললুম, অ্যাবনর্ম্যালি লো, নাইনটি, ফিফটি।

হুঁ। কি করে বুঝলেন, অ্যাবনর্ম্যাল ? প্রেসারের কি বোঝেন ? সাবনর্ম্যাল বা নর্ম্যালও হতে পারে। কথা বলতে বলতে আমরা বাইরে এসে বসেছি। নেপোলিয়ানের কত প্রেসার ছিল ? রোমেলের, আইজেনহাওয়ারের, চার্চিলের ? আমি বোকার মত উত্তর না জানা ছাত্রের মত তাকিয়ে রইলুম। ডাক্তার নিচু হয়ে প্রেসার মাপা যন্ত্র বের করতে করতে বললেন, সকলেরই প্রেসার লো ছিল। ওটাই ছিল ওঁদের নর্ম্যাল। আপনি নর্ম্যাল অ্যাবনর্ম্যালের কি বোঝেন ! মাথা ঘোরে ?

মাঝে মাঝে বোঁ করে ঘুরে যায়।

বোঁ করে কেন ? বোঁ মানে কি ? কথায় কথায় প্রত্যয় লাগানো অভ্যাস। ব্যাড হ্যাবিট। আপনার মাথা ঘোরে উইণ্ডে মশাই, উইণ্ডে। হাওয়ায় পৃথিবী ঘোরে। মোগলাই চলে ? কাটলেট, ফিশ ফ্রাই ? রক্তের চাপ মাপা যন্ত্রের ওঠানামা থেকে কি বুঝলেন তিনিই জানেন। ফ্যাস করে হাওয়া বের করে দিয়ে পটিটা খুলতে খুলতে বললেন, কে বলেছে নাইনটি, ফিফটি ?

ডক্টর সাহা বলেছেন, আমার অফিসের ডাক্তার।

যন্ত্রটা ফেলে দিতে বলুন। ক'জন ডাক্তার প্রেসার দেখতে জানে ?

ক'জন ডাক্তার ফুসফুস পড়তে পারে? হার্টের মার্মার ধরতে পারে? আপনার প্রেসার হাণ্ড্রেড অ্যাণ্ড সিকসটি। লটবহর লম্বা বাক্সে পাট করে গুছিয়ে রাখলেন। প্রেসার যন্ত্র আমিও লক্ষ করে দেখছি। হাওয়ার চাপে পারার মাথাটা ঠেলে ওঠে। তারপর আবার হুস হুস করে নামতে থাকে। এই ওঠা নামার প্রেমের তুফানে কোথায় যে আমার প্রেসার বসে আছে কে জানে! ডাক্তারবাবু একটা শ্লিপ-কাগজ টেনে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, বয়স কত? দুটো বছর গায়েব করে বললুম, আটত্রিশ। পেনসিল দিয়ে হিসাব করতে করতে বললেন, নাইনটি প্লাস থার্টি এইট ইজ ইকোয়ালটু হাণ্ড্রেড টোয়েন্টি এইট। একশো আঠাশের জায়গায় একশো। কি এমন কম? একটু কম। মাসখানেক মুরগি, দুশ্চিন্তাহীন গভীর নিদ্রা, প্রচুর বিশ্রাম আর দু চামচে করে দু বেলা টনিক, দেখি আঠাশ কোথায় যায়। এখন বলুন ট্রাবল কি কি? ফরগেট ইয়োর প্রেসার। ইগনোর ইয়োর প্রেসার। মনে করুন, আপনি নেপোলিয়ান, রোমেল কাইজার, উইলহেলম, সক্রেটিস, সফোক্লিশ, বায়রন, নিট্‌শে।

ডাক্তারবাবু লিখতে শুরু করলেন। নাম্বার ওয়ান, শীত করে জ্বর। জ্বর আসার আগে পায়ের পাতা বরফের মত ঠাণ্ডা। মর্নিং সিকনেস। টকাস করে পেনসিলটা ফেলে দিয়ে বললেন, তখন বলেননি কেন? তখন যখন শুইয়ে ফেলে পেট টিপছিলুম। একটা কাজ একেবারে হবার উপায় নেই। রিপিটেড এফার্টস। একে কি বলে জানেন, নন কো-অপারেশন। এ শর্ট অফ ভায়োলেনস অন মাই কন্সটলি টাইম। শুনুন, অসুখ যদি চেপে রাখতে চান রাখুন। আমি ওই ইনকমপ্লিট ডায়াগনসিসের উপরই চিকিৎসা করব আর যদি কিওর চান, বি ফ্রি অ্যাণ্ড ফ্র্যাঙ্ক। পড়েননি ডাক্তার রোগীর বন্ধু, রোগ নিবারণে, ধর্মই সবার বন্ধু জীবনে মরণে।

ফ্র্যাংকলি বলছি—ডাক্তারবাবু, গোপন করা বা নন কো-অপারেশন বা ভায়োলেনস্ আমিও পছন্দ করি না।

আমি তখন পিনপয়েণ্ট করে কুহুনাড়ির সংকোচনের কথা বিশদ করলুম।

ডাক্তারবাবু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, রোগের সঙ্গে যোগের কি সম্পর্ক?

বাঃ সম্পর্ক নেই! হটযোগ দীপিকা, পাতঞ্জল, এঁরা কি বলেছেন? এইবার আমার কোর্টে বল। বত্রিশ টাকার ডাক্তারকে এবার আমার গোল দেবার পালা। এঁরা বলেছেন শরীরম আদ্যম। সুশ্রুত বলেছেন বিসর্গদান বিক্ষেপৈঃ সোমসূর্যা নিলো যথা। ধারয়ীন্ত জগদ্দেহ্য কফপিত্তানিলস্তথাঃ অর্থাৎ সোমসূর্য অনিল অর্থাৎ বরুণ, অগ্নি, ও বায়ু, এই ত্রিদেবতা যেমন বিশ্বসৃষ্টি এবং বিশ্বের রক্ষণ ও পোষণ করিতেছেন তেমনি আবার এই ত্রিদেবতাই দেহবিশ্বকে পালন ও পোষণ করিতেছেন। দেহস্থ এই ত্রিদেবতার নামই আয়ুর্বেদমতে—বায়ু, পিত্ত ও কফ। ডাক্তারবাবু পেনসিল নামিয়ে রেখে বেজার মুখে বললেন, তা হলে আপনার ট্রিটমেণ্টটা সুশ্রুতকে দিয়েই করান। আমার ভ্যালুয়েবল টাইম আর নষ্ট করবেন না।

প্রথম শুরু তো হ্যানিম্যান সাহেবকে দিয়ে করেছিলুম। প্রথমে সালফার খেয়ে সিসটেমটাকে নিউট্রাল করে নিয়েই নাকস্‌ভোমিকা ঝেড়েছিলুম। মেথডটা বড় শ্লো। ধৈর্য রইল না। তখন সুইচওভার করলুম কবিরাজিতে। অনুপানেই মেরে দিলে। নিমগাছের ডাল থেকে ঝোলা গোলঞ্চ কুথে থাঁড়া, ক্ষেত পাঁপড়া, জটামাংসী, দারুহরিদ্রা, মহাজ্বালা তারপর মধু। সবতেই মধু, ওঁ মধু। এর ওপর খলে মারা। সকলটা যদিও চলে, দুপুর আর সন্ধে! তখন তো অফিসে! তাছাড়া ওই অরিষ্ট ডিফেকটিভ প্রেপারেশন। শিশিতেই ফাংগাস হয়ে যায়। অরিষ্ট খেয়েই সঙ্গে সঙ্গে শুক্রিম আর জুতো ঝাড়া বুরুশ দিয়ে শরীরের ত্বক পালিশ করতে হয়। তা না হলেই বর্ষায় ভেজা সাদা সাদা ছাতধরা শালখুঁটির মত চেহারা হয়। তখন সুইচওভার করলুম যোগে।

এইবার সুইচ অফ করে কাজের কথায় আসুন, বুঝতেই পেরেছি

অনেক ঘাটের জল খেয়েছেন। ডাক্তারবাবু পেনসিল তুলে নিলেন, বিবাহিত? প্রশ্ন শুনেই বুঝেছি চরিত্রের ওপর ডাক্তারের কটাক্ষ। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠলুম, না না সে সব নয়। তবে আমার দাদু বলেছিলেন ডায়াবিটিস কিনা একবার আপনাকে দিয়ে চেক-আপ করাতে।

বুঝেছি, যার যা অসুখ আছে সব আপনাকে ঘাড়ে চাপাতে চাইছে। শুনে রাখুন, অসুখের কথা একমাত্র ডাক্তারকে বলবেন, যেমন ইষ্টদর্শনের কথা একমাত্র গুরুকেই বলতে হয়।

ডাক্তারবাবু রোগের ফর্দ ফেলে চুরুট ধরালেন। মোটা ডাক্তার, মোটা চুরুট, লম্বা পাইপ, বড় কর্তার রিভলভিং চেয়ার, থানার দারোগা, কোর্টের পেয়াদা, বাড়ির গৃহিণী, ধারদাতা মুদি, ইলেকট্রিক বিল, অফিস টাইমের বাস, বিয়ের চিঠি, শেষ মাসের আত্মীয়, বঙ্গোপসাগরের নিম্নচাপ, ট্রানজিস্টার রেডিও, বাজারের দরদাম, কোনো কিছুকেই আমি আর ভয় পাই না। সব কিছুর ক্যামোফ্লেজ আমি ধরে ফেলেছি। সব মানুষের মধ্যেই জ্ঞান আছে, অজ্ঞানতা আছে, নীচতা আছে, উদারতা আছে, দয়া আছে, নিষ্ঠুরতা আছে, ছাঁকনি ছাঁকা মানুষ হয় কি? হয় না। অতএব ভরা মুখে মোটা চুরুটে আমার রোগের দিকে ভুরু কুঁচকে তাকালেই কি আমি সুস্থ হয়ে যাব। গাড়ি নিয়ে গ্যারেজ সার্ভিস এলে সব ডিফেক্টের কথা যেমন বলতে হয়, তেমনি আমিও হার্ট, লাংস, কিডনি ব্রেন, লিভার, স্টম্যাক সব জায়গার বাঁদরামি হাটে হাঁড়ি ভাঙার মত করে ভাঙবো। ডাক্তারের চুরুট আমাকে দাবাতে পারবে না।

এক মুখ পোড়া-গন্ধ ধোঁয়া ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি চালু করে দিলুম আমার কিডনি-কাহিনী। কিডনিটা একটু নন কো-অপারেশন করছিল। প্রথম দিলুম ব্যাটাকে যোগের কবলে। স্বামী যোগানন্দ অর্ধচন্দ্রাসনে রেখে দিলেন মাসখানেক। তারপর ধনুরাসন করতে গিয়ে এমন পারমানেণ্টলি পেছন দিকে অর্জুনের গাণ্ডীবের মত বেঁকে গেলুম যেন কুমড়োর ফালি বা নৌকা। সেই ধনুক থেকে আস্তে আস্তে

সোজা হাতে তিন মাস লাগল। তখন ধরলেন ডাঃ ঘোষাল।

কোন ঘোষাল? খালধারের ঘোষাল? কে ডি ঘোষাল! ডক্টর শার্ক? ধরলে ছাড়ে না সেই ঘোষাল?

আজ্ঞে হ্যাঁ, ডকটর শার্ক নয় কচ্ছপ। মেঘ না ডাকলে কামড় ছাড়ে না। ঘোষালের ওপর রাগ দেখে চৌধুরীকে উসকে দিলুম। আমার ওপর সিমপ্যাথি বাড়বে। সেই ঘোষাল চোখ কান বুজিয়ে একগাদা ডকসি সাইক্লিন খাইয়ে দিলেন। এক ধাক্কায় ফিফটি সিকস রুপিজ। না জোক। রেজাল্ট ড্রাগ'রিঅ্যাকসন। হবেই তো, হবেই তো ডক্টরকে বেশ উৎফুল্ল দেখাল। আমার সর্বনাশে ওঁর যেন পৌষ মাস! পা নাচাতে নাচাতে বললেন, কম রুগী মেরেছে! নিজেকে মনে করে যেন ডাক্তার গুডিভ!

আমি ছাড়ি কেন? একটু টিপ্পুনি যোগ করে দিলুম, যদিও আপনাদের শাস্ত্র বলে, শতমারী ভবেৎ বৈদ্যঃ সহস্রমারী চিকিৎসকঃ। ডক্টর ঘোষাল যদি হাজার কমপ্লিট করে থাকেন তাহলে এতদিনে চিকিৎসক হতে পেরেছেন।

ডক্টর ঘোষালের ডায়গনসিস্‌টা একবার শুনি। ডক্টর চৌধুরী ঘোষালের কেরামতিটা জানতে চাইলেন।

ডক্টর ঘোষাল বললেন, তিনটে কারণ থাকতে পারে। এক স্টোন, দুই ক্যানসার, তিন টি বি।

বাঃবা বাঃবা। ডক্টর চৌধুরী আনন্দে আটখানা। জীবনে এত আনন্দ মনে হয় তিনি কখনো পাননি। সোজা হয়ে বসে বললেন, এই না হলে ডাক্তার! মার্ডারার। আমাদের প্রোফেসানের কলঙ্ক। দেখি আর একবার এদিকে আসুন তো। উঠে গিয়ে সামনে দাঁড়ালুম। দুটো আঙুল দিয়ে গলা আর কানের পাশটা বেশ রগড়ে রগড়ে দেখলেন নাঃ কিছু নেই। টি বি অত সোজা নাকি। হলেই হল। আবার চেয়ারে ফিরে এলুম। ফের শুরু হল রোগের ফর্দ।

ভীষণ দুর্বলতা। বসতে পেলে শুতে চাই। ওজন ঝরঝর করে

কমছে। বেলা তিনটের পর থেকে চোখ জ্বালা, জ্বর জ্বর, মাথা ধরা, শীত শীত, হাই ওঠা অ্যালার্জি। মাঝরাতে ব্রিদিং ট্রাবল। জিয়ার্ডিয়া ছিল। অ্যামিবায়সিস যোগ হয়েছে। অম্বল। লিভারের ব্যথা। স্নায়বিক দুর্বলতা। হাত-পা অবশ হয়ে আসে, কাঁপে। অকালে চুলে পাক ধরেছে। মেলাঙ্কোলিয়া। পা ঝুলিয়ে বসলে চেটো দুটো বিকেলের দিকে গোদা গোদা হয়ে ওঠে। এক সাইজ বড় জুতো কিনেছি, সকালে বাড়তি শুকতলা দিয়ে পরি। বিকেলে শুকতলা দুটোকে পকেটে পুরি। ডক্টর চৌধুরী কিছুক্ষণ অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। এইটুকু শরীরে এত অসুখের ঐশ্বর্য খুব কম দেখেছি মাইরি, এ-যেন সিঁড়ি ভাঙা অঙ্ক। ফর্দাফাঁই রুগী। পোস্টমর্টেমের টেবিল থেকে খালাস পাওয়া মাল। মুচি ডেকে সেলাই করাতে হবে। পেনসিলের পেছন দিয়ে ভুরুর কাছে টোকা মারতে মারতে বললেন, কি দিয়ে শুরু করব? বড় হোটেলের ফিফটি সিকস কোর্স লাঞ্চ শুরু করার আগের প্রশ্ন। দুর্বলতা দিয়ে স্টার্ট করুন। রোজ রিকশ আর মিনি বাসে দেউলে করে দেবার জোগাড় করেছে। এক পা হাঁটলেই হার্ট। ও হ্যাঁ, হার্টটা একটু নোট করে নিন, মিনিটে একটা করে বিট মিস করছে।

নিভে যাওয়া চুরুটটা হাতে তুলে নিয়ে ডাক্তার বললেন, আমি বলি কি আপনি হসপিটালাইজড হয়ে যান। আমি লিখে দিচ্ছি। ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। হসপিটাল! পাগল হয়েছেন, হাসপাতালে কোন দুঃখে মরতে যাবো? মরি যদি সেও ভাল, আমার নিজের খাটই ভাল। কাকাবাবুর দুর্দশা দেখিনি! তিন তারিখে বেডপ্যান চেয়ে সাত তারিখে পেয়েছিলেন। তাও স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে সাত পাতার করুণ আবেদন জানিয়ে। আর পারছি না স্যার। একবার ছ নম্বর বেডের ইনজেকসান তাকে দিয়ে দিয়েছিল। সেই ওষুধ আবার মুরগি দিয়ে 'সাক' করিয়ে বের করে আনতে হয়েছিল। ইছাপুর থেকে রোজা আনিয়ে ঝাড়ফুঁক করে সেই সাপের বিষ নামাতে হল। রোজ রাতে পেল্লায়

পেল্লায় ইঁদুরের পেছনে সারা ওয়ার্ডে দৌড়ে বেড়াতেন। এই বিস্কুটের প্যাকেট কাঁধে নিয়ে পালাচ্ছে, কখনো কড়াপাক সন্দেশের বাক্স, কখনো পাউণ্ড রুটি। একবার বালিশের তলা থেকে একশো টাকার দুটো নোট নিয়ে গুরুভোজন করেছিল। ছজোড়া চটি চুরি হবার পর সপ্তম জোড়াটা রাতে বালিশের তলায় নিয়ে ঘুমোতেন। আর বেশ বড়দরের রুগী এলে রোজই তাঁকে ধরাধরি করে বাথরুমের দরজার সামনে ফেলে দিয়ে আসত যতক্ষণ না সেই ভি আই পেসেণ্ট বেড থেকে কেবিনে উঠছেন। তিনবার ডেথলিস্টে নাম উঠেছিল। একবার আমরা মর্গ থেকে উদ্ধার করে এনে গরম চাটুতে সেঁকে প্রাণে বাঁচিয়েছিলুম। সেই হাসপাতালে আপনি আমাকে পাঠাতে চাইছেন! ও আমার নিঠুর দরদী!

ডক্টর চৌধুরী বেশ বিপাকে পড়েছেন মনে হল। সাপের ছুঁচো গেলার অবস্থা। আমি কি করিতে পারি! ডাক্তারের সঙ্গে লুকোচুরি চলে না। সব খোলাখুলি। মহিলারা পর্যন্ত নিষ্কৃতি পান না। চাকরিতে ঢোকার আগে মেডিকেল টেস্টের কথা আজও ভুলতে পেরেছি কি! পাঁচটা টাকা পকেটে ছিল না বলে বৃদ্ধ ডাক্তার লাইনে দাঁড় করিয়ে সকলের সামনে সেই তরুণ বয়সে পোস্ট বক্স খুলে—

তাহলে একটা টনিক লিখে দি। সপ্তাহ খানেক খেয়ে দেখুন। সঙ্গে একটা করে ভিটামিন ক্যাপসুল থাক। প্রেসক্রিপশানের প্যাড টেনে নিলেন ডাক্তারবাবু। টনিক আর ভিটামিন তো নিজেই নিজেকে করতে পারতুম। এর জন্যে বত্রিশ টাকা খরচের কি দরকার ছিল। এর সঙ্গে চার যোগ করলে এক সপ্তাহের রেশন। টনিক প্লাস ভিটামিন প্রেসক্রাইব এক মাসের পথ খরচ। আমার আপত্তিটা প্রকাশ করেই ফেললুম, রোগের কারণটা জিইয়ে রেখে ফুটো পাত্রে টনিক আর ভিটামিন ঢেলে লাভ কি?

তাহলে ডু ওয়ান থিং, কাল সকালে খালি পেটে চলে আসুন, ব্লাডটা নি, আর ফার্স্ট ইউরিন একশিশি, এক ফোঁটা স্টুলও নিয়ে আসবেন, টেস্ট করে প্রেসক্রিপশান করব। তার আগে নয়। আদালতে যেন

দিন পড়ল। উকিল আর ডাক্তার টাকার এপিঠ আর ওপিঠ। ব্লাড বের করে নিলেই বেরোবে আর ডাক্তাররা তো সাধারণত আমাদের মত পুওর পেশেন্টদের চোখে ড্রাকুলার মত। সমস্যা দ্বিতীয় আর তৃতীয় বস্তু নিয়ে। ও দুটি বস্তু তো আমার আজ্ঞাবহ নয়। একমাত্র উপায় পুলিশের রুলের তলপেটে গুঁতো। ডাক্তার বললেন টেস্ট ছাড়া নো ট্রিটমেন্ট। আমি ডক্টর চৌধুরী, নট ঘোষাল। ঘোষাল যা পারে আমি তা পারি না।

ডক্টর চৌধুরী ফি না নিয়ে প্রমাণ করলেন তিনি প্রকৃত ডাক্তার নন। ডক্টর শার্ক নন। আপনি তো আবার আসছেন তখন দেবেন। বাসে দশ টাকা দিয়ে কুড়ি পয়সা টিকিট কাটতে চাইবার অভিজ্ঞতা নিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। ডক্টর চৌধুরীও উঠে দাঁড়িয়েছেন বোধহয় গলাধাক্কা দেবেন। পেছু হটতে হটতে বেরিয়ে যাব কিনা ভাবছি। চৌধুরী খুব বিনীতভাবে বললেন, আপনার তো যোগের সঙ্গে বেশ যোগাযোগ আছে। যোগে ড্রাগ অ্যাডিকসানের কোন কিওর আছে ?

হঠাং আমি রোগী থেকে ডাক্তার হয়ে গেলাম। যোগ, জ্যোতিষ, অর্থশাস্ত্র, চিকৎসা-বিজ্ঞান, বাস্তুবিজ্ঞান, যন্ত্রবিজ্ঞান প্রভৃতি জ্ঞান আমি ততটুকুই অধিকার করি, যতটুকু আমার নিজের জন্য প্রয়োজন। নিজে ড্রাগসের ডও জিভে ছুঁইয়ে দেখিনি। আমার অ্যাডভাইস চায়। ডাক্তারকে ভরসা দিয়ে বললুম নিশ্চয় আছে। জেনে জানিয়ে যাবো। ডাক্তার চৌধুরী বললেন, মিউচুয়াল, কেমন ? আমি ফ্রিতে আপনার চিংকার করব। একটু দাঁড়ান। ড্রয়ার খুলে এক গাদা ফ্রি স্যাম্পল বের করলেন, ভিটামিন, অ্যান্টাসিড, ল্যাকজেটিভ এনজাইম টনিক। সব আমার হাতে তুলে দিয়ে বললেন ওষুধ আপনাকে খুব কমই কিনতে হবে। তবে ওই টেস্টের জন্য যা লাগবে দিতে হবে। দেখি আপনার জন্যে কি করতে পারি। রেশনের চাল থেকে কাঁকর বাছার ধৈর্যে আপনার ট্রিটমেন্ট করতে হবে।

পকেট-ভর্তি ওষুধ, অভঙ্গ একটি নোট, ইনট্যাক্ট সমস্ত অসুখ নিয়ে আমিও কি করতে পারি বলে সুইংদরজা দুলিয়ে রাস্তায় ঝাঁপিয়েপড়লুম। ব্যয়ও হল না আরামও জুটলো না। শরীরের সমস্ত অসুখ পোড়ো বাড়ির মত হো হো করে উঠল—ওই দেখ বেটা যাচ্ছে। যাকে ডাক্তারেও ছোঁয় না।

জলটল খেয়ে বেশ গুছিয়ে বসেছি। আজকের কাগজটায় একবার চোখ বুলবো, তারপর দাঁত বের করা কাপে তিনের চার কাপ চা খেয়ে মুখটাকে টক করে দোকান খুলব। অফিসকে আমরা এক এক সময় এক এক আদুরে নামে ডাকি। কখনও দোকান বলি, কখনও মামার বাড়ি বলি, কখনও ক্লাব বলি। সরকারী অফিসে মার্চেন্ট অফিসের মত বাঁধাবাঁধি অত থাকে না। একটু ঢিলেঢালা ভাব। কেউ কারুর দাস নই। আমরা সবাই দেশসেবক। দেশ জননীর সেবা করতে এসেছি। মাসের শেষে সামান্য দক্ষিণায় কায়ক্লেশে সংসার চলে। কাজের জবাবদিহি বড় কর্তার কাছে নয়, দেশের মানুষের কাছে। যাঁরা আমাদের নিন্দে করেন, অপদার্থ, ঘুসখোর বলেন, তাঁদের আমরা তেমন পাত্তাটাত্তা দিই না। জনসেবায় অমন দু'চার কথা সহ্য করতেই হয়। চামড়া একটু পুরু না করলে দেশসেবা করা যায় না। মনের আস্তরণে একটু গণ্ডার ভাব আনতে হয়। রাইনোসেরাস না হলে পাবলিক সারভেন্ট হওয়া যায় না। যে যাই বলুক, গুন গুন করে গেয়ে যাও কিশোরকুমারের সেই বিখ্যাত গান—

কুছ তো লোগ কহেঙ্গে
লোগোঁ কা কাম হ্যায় কহনা
ছোড়ো বেকার কি বাতোঁমে।

যে দাদাকে ধরে চাকরিটা পেয়েছিলুম, তিনি প্রায়ই বলতেন, দেশ-সেবা বড় 'থ্যাঙ্কলেস জব' হে। আমরা সবাই যীশুখ্রীস্ট। কাঁটার মুকুট মাথায় চাপিয়ে গ্রামে-গঞ্জে ঘুরে বেড়াচ্ছি। ত্যাগ, ত্যাগ। আমাকে অবশ্য মই ঘাড়ে করে পোস্টার-ফোস্টার মারতে হয়নি। আমার কাজ ছিল লেখা। উনুনের যেমন কয়লা চাই, নেতাদের তেমনি অক্ষর চাই। রাশি রাশি অক্ষর। একের পেছনে আরেক, মাইলের পর মাইল। নেচে নেচে বেরোবে। গরম গরম, নরম নরম, আবেগে তুলতুলে, রাগে গমগমে, বিদ্রূপে কষকষে। পলিটিক্যাল বক্তৃতা আর

বিয়ে বাড়ির ছ্যাঁচড়া এক জিনিস। নৃতত্ত্ব ভূতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, অ্যানাটমি, ভ্যাসেকটমি, সব এক কড়ায় ফেলে, লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে রগরগে করে পাতে ফেলে দাও। গভীর জ্ঞানের কোনও প্রয়োজন নেই। এ লাইনে জ্ঞান হল ডিসকোয়ালিফিকেসান। পিঠে সুড়সুড়ি দেবার জন্য সার্জেনকে ডাকার প্রয়োজন হয় না। বাঁদরেও দিতে পারে। পারে না, ভালই দেয়। ভাসা ভাসা জ্ঞানের ফুলঝাড়ু দিয়ে ঝেঁটিয়ে দাও। নরুণ দিয়ে ছানি অপারেশান।

ওই কর্মটি আমি ভালই পারি। 'বন্ধুগণ' বলে একবার শুরু করলে আণবিক বোমা পর্যন্ত আমার পথ পরিষ্কার। কীর্তনীয়ার সখীগো-র মত। এক টানেই ভক্তদের হৃদয় ফর্দাফাই। তা দাদা খুশি হয়ে, প্রচার দপ্তরে এই চেয়ারটি আমার পাকা করে দিলেন। ঢুকেছিলুম তলায়, মুখের জোরে ধীরে ধীরে ঠেলে উঠছি ওপর দিকে। আমার দাদা কবে ডিগবাজি খেয়ে সরে পড়েছেন। এই খেলায় যা হয় আর কি। সাপলুডোর মত। এক চালে জনপ্রিয়তার সাপের মুখ গলে একেবারে ন্যাজে। আবার কোন চালে মই পাবেন কে জানে। যীশু এখন শিশুর মত হামা টানছেন। সাবালক হতে সময় লাগবে। দলফল ভেঙে চুরমার। বাজারে অনেক আঠা বেরিয়েছে, মানুষের মাথা ভাঙা দল কিম্বা টুকরো দিল জোড়ার আঠা এখনও বেরোয়নি।

এই অফিসে ঢুকে একটা গূঢ় তথ্য আমি জেনে ফেলেছি, যা বাইরে জনসাধারণের সঙ্গে মিশে থাকলে জানা যেত না। এদেশ থেকে সায়েব এখনও যায়নি। সাদা চামড়া চলে গেছে, সায়েব কিন্তু পড়ে আছে। লাহিড়ী সায়েব, দাস সায়েব, বোস সাহেব, মিত্তির সায়েব। সায়েবদের কি সব চেহারা! গেজেটেড হলেই সায়েব। আগে পাড়ার গিন্নিবান্নি মহিলাকে গেজেট বলা হত! তাঁর কাজ ছিল বাড়ি বাড়ি হাঁড়ির খবর জোগাড় করে দুপুরে মহিলামহলে পেশ করা। এ গেজেট অবশ্য সে গেজেট নয়। বিশাল একটা মোটা বই। সেই কেতাবে যাঁর নাম, তিনিই সায়েব। সেখানেও স্তর আছে। ক্লাস ওয়ান, ক্লাস টু। অনেকটা

সেই ট্যাঁস ট্যাঁস ফিরিঙ্গির মত। মাইনে কারুরই খুব বেশি নয়। তবে দাপট আছে। দেশের সব কিছুই তো এঁদের হাতে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভূমিসংস্কার, কৃষিশিল্প। ফাইল নাড়ানো প্রভুর দল। মাথা নড়া বুড়োর মত অথবা বুড়ো শিবের মত। নামকাটা সেপাই নয়। গেজেটেড সেপাই। নিজেদের নাক কেটে অপরের যাত্রাভঙ্গ করার ক্ষমতা রাখেন। ঢলঢলে প্যান্ট। মাঝে মাঝেই টেনে তুলতে হয় কোমরের দিকে। হাওয়াই শার্ট। বাড়িতে কাচা। কলারে ইস্ত্রি নেই। কুঁচকে মুচকে ব্যক্তিত্বশূন্য, লতপতে একটা ব্যাপার। অনেকে আবার নস্যি নেন। স্নাফ ইওর নোজ অ্যাণ্ড স্নিফ এ ডিসিসান। গেজেটেড হলে টেবিলে একটা মাঝারি মাপের কাচ পাবার অধিকার জন্মায়, চায়ের চরণ-চিহ্নিত টেবিলে কাচ, কাচের তলায় শ্রীরামকৃষ্ণ, মা কালী, স্বামী বিবেকানন্দ কদাচিৎ। স্টোর থেকে একটি তোয়ালে পাওনা হয় সায়েবদের। কোট ঝোলাবার হুক-দম্পতি সমেত একটি আয়না, একটি বৈদ্যুতিক ঘণ্টা, টেলিফোনের একটি একসটেনসান লাইন, বিমর্ষ চেহারার একটি দেয়াল ক্যালেণ্ডার, সামনে একটি ডেস্ক ক্যালেণ্ডার, কলঙ্কিত অ্যাসট্রে, গোটাকতক মুশকো চেহারার পেপারওয়েট, কলম-দান, প্রভৃতি নিয়ে সায়েব বসেন ক্ষমতার টাটে। দু'পাশে জমতে থাকে পাহাড়ের মত ফাইলের স্তূপ। হরেক রকমের বায়না। জন-সাধারণের জীবন যন্ত্রণা অষ্টপ্রহর কেঁদে চলেছে, সায়েব আমাকে দ্যাখো। জল নেই কল নেই, জমি নেই, লোহা নেই, সিমেণ্ট নেই, পথ নেই, আলো নেই। ফাইল নিচে থেকে ওপরে ওঠে। সায়েবের কাজ 'অ্যাজ প্রোপোজড' বলে সই মারা। নিচে যিনি আছেন, তিনি লেখেন 'পুট আপ ফর পেরুজ্যাল অ্যাণ্ড নেসাসারি অ্যাকসান।' তারপর 'অ্যাজ প্রোপোজড' হতে হতে 'ওঁ গঙ্গায় নমঃ,' গ্যাঞ্জেস ডিসপোজাল মানকুণ্ডুর মানসবাবু, বর্ধমানের বরোদাবাবু, ক্যানিংয়ের কালোবাবু জেলা অফিসে যাচ্ছেন আর আসছেন, রোজই শুনছেন ফাইল ওপরে গেছে। 'অ্যাজ প্রোপোজড'। কেউ উল্টে দেখেনি প্রোপাজালটা

কি। পেঁয়াজের খোসার মত, প্রোপোজালের খোসা ছাড়ালে কিছুই আর মেলে না। ব্রহ্মের স্বরূপের মত। ওদিকে যাঁর আর্জি তিনি ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হন। উত্তর পুরুষ শ্রাদ্ধের মন্ত্র পড়তে থাকেন। আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্যন্তং, অর্থাৎ স্তম্ভে স্তম্ভে মাথা ঠুকে তিনি এখন ব্রহ্মে। বিবেকবান দেশসেবক দেশবাসীদের যেমন উপদেশ দেন, দেখবেন মানুষ যেন কাজ পায়, 'ফ্রম পিলার টু পোস্ট, পো স্টটু পিলার', এই বদনাম ঘোচাতে হবে, সব রেডটেপ খুলে নিজেদের প্যান্টের তলায় ঘুনসি করে নিন। গুনগুনিয়ে আবার সেই গান: কুছ্ তো লোগ কহেঙ্গে। লোগোঁ কা কাম হ্যায় কহনা। সায়েব নস্যি নিতে নিতে জেলার নেতাকে বললেন, সব কিছুর একটা প্রোসিডিওর আছে। কালভার্ট-কালভার্ট করছেন, স্যাংসন কোথায়? কোন স্কীমে হবে? এখন যেমন সাঁতরে খাল পেরোচ্ছেন পেরিয়ে যান। ফিনান্সে প্রোপোজাল গেছে। ফিনান্স থেকে সি, এম; সি, এম থেকে ক্যাবিনেট; ক্যাবিনেট থেকে সি, এম; সি এম থেকে ফিনান্স; ফিনান্স থেকে পি ডব্লু ডি; পি ডব্লু ডি থেকে লোকাল সেল্ফ গভার্নমেণ্ট; সেখান থেকে অঞ্চল পঞ্চায়েত; অঞ্চল থেকে পঞ্চায়েত। ইট ইজ সো সিম্পল। নিন এক টিপ নস্যি নিন। তবে হ্যাঁ মিনিস্ট্রি যদি উলটে যায়, কাণ্ট হেলপ, তখন প্রেসিডেণ্টস রুল, মানে গাভার্নার, গাভার্নার হয়তো বলবেন. একটু অপেক্ষা করুন, নির্বাচন তো হবেই, নতুন ক্যাবিনেট ডিসিসান নেবে। ক্যাবিনেট, কফিন, কেবিন সব যেন সমার্থক শব্দ। কখন কি ভূত বের করে কে জানে।

অফিসে আমার নিজের পয়সায় কেনা একটা কেটলি আছে। সেটার চেহারা তেমন ভাল না হলেও কাজ চলে যায়। গোটাকতক ভাঙা কাপ আছে। আর আছে আমার পিওন, ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো অমূল্য। অমূল্যর প্রথম বউ তিনটি সন্তান উপহার দিয়ে ক্ষয়কাশে ভুগে ভুগে সরে পড়েছে। অমূল্য দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছে। সাহস আছে। যা মাইনে পায় তাতে নিজেরই চলে না। দ্বিতীয়

পক্ষ চটজলদি দুটি প্রাণ নামিয়ে দিয়েছে। অমূল্য এখন পাঁচে পঞ্চবাণ। এ অফিসের নিয়ম হল কেউ কারুর কথা শুনবে না। যার যা কাজ, তিনি যদি সেই কাজ ভুলেও করে ফেলেন,তার চেয়েঅপরাধ আর কিছু নেই। কর্মচারীদের দু'টো ইউনিয়ন। দু'রকম রাজনৈতিক রঙ। মঞ্চে ফোকাস মারছে। অভিনেতারা হাত পা ছুঁড়ছে। গদিতে যখন যে দল তখন সেই সেই ইউনিয়নের প্রবল পরাক্রম। অমূল্যর বয়েস হয়েছে, পাঁচ পাঁচটা ছেলে মেয়ে, তাই একটু মান্য করে চলে। কথাবার্তা শোনে। বারে বারে চা আনে, ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলে এনে দেয়, পোস্টাপিসে লাইন দিয়ে খাম পোস্টকার্ড এনে দেয়। টিফিন এনে দেয়, ভাগ পায়।

অমূল্য আজ গেঞ্জি পরে এসেছে। নীল জামাটা কাল বড় ছেলে বেচে দিয়ে চায়নাটাউনে শামমীকাপুরের নাচ দেখেছে। বার বার দেখো, হাজার বার দেখো। কাল রবিবার ছিলো। এর আগে ছেঁড়া ছেঁড়া একটা গরম কোট ছিল অমূল্যর, সেটা ঝেড়ে জুয়া খেলেছিল। ছাতা জুতো, বাসনকোসন সবই এইভাবে গেছে। অমূল্যর ভয় কোনও দিন ঘুমের সময় পরনের কাপড়টা খুলে নিয়ে বেচে না দেয়।

অমূল্য ফুটপাথের দোকান থেকে চা এনেছে। সহকর্মী বিমলও এসেছে। সাধারণত বারোটায় আসে, আজ বউয়ের সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে বলে সকাল সকাল চলে এসেছে। বিমল আবার শিল্পী। গান লেখে, গান গায়। নতুন একটা গান লিখেছে। টেবিলে তাল দিতে দিতে গানে সুর চড়াচ্ছিল, এক তারা,দু তারা,তারা তিন চার। তা ধিন্ ধিন্ তা, তারা তিন চার, তোমার কথাই কেন, ভাবি বার বার।

গান শুনতে শুনতে সবেসিকি কাপ চা খাওয়া হয়েছে,এমন সময় ব্যানার্জিসায়েব ধড়ফড় করে ঘরে ঢুকলেন। ইনি হলেন এক নম্বর সায়েব। লম্বা, চওড়া, হৃষ্টপুষ্ট। কর্মক্ষেত্রে যথেষ্ট সুনাম আছে। জীবনে কারুর ভাল করেননি। সুযোগ পেলেই সহকর্মীদের বাঁশ দেন। প্রমোশান আটকে দেন। এমন সব ব্যবস্থা নেন যাতে ঘন ঘন

মোশান আসে। এঁর তূণে মারাত্মক দুটি অস্ত্র আছে, সাসপেনসান অ্যাণ্ড ট্রানস্ফার। তৈল মর্দনে ভারী ওস্তাদ। আমরা নাম রেখেছি তেলসায়েব।

সায়েব এলেই তড়াক করে উঠে দাঁড়াতে হয়। সার্ভিস কন্ডাক্ট রুলে কি আছে জানি না, তবে এইটাই নিয়ম। বড় এলেই ছোট উঠে দাঁড়াবে। পুলিসদের সার্ভিস কন্ডাক্ট রুল পড়ে আমার চোখ কপালে উঠে গিয়েছিল।

গম্ভীর গলায় বললেন, বসুন, বসুন।

বিমলের উঠে দাঁড়াতে একটু দেরি হচ্ছিল। টেবিলে হাঁটু তুলে গাড়ু হয়ে বসেছিল। পেছন দিকে শরীর ঠেলে, হাঁটু নামিয়ে উঠে দাঁড়াতে হবে। কে জানত দুম্ করে ব্যানার্জিসায়ের এসে পড়বেন! চেয়ার আর টেবিলের মাঝখানে পা আটকে বিপর্যয় কাণ্ড। ব্যাগ থেকে আনারস বের করার মত অবস্থা। যাক ওঠার আগেই বসার হুকুম পেয়ে বেচারা বেঁচে গেল। ব্যানার্জিসায়েব তির্যকে বিমলকে একবার দেখে নিলেন। হয়ে গেল তোমার। ট্রানসফার টু কুচবিহার।

ব্যানার্জিসায়ের কোনও রকমে সামনের চেয়ারে পেছন ঠেকালেন। চাকরির খাতিরে মানুষকে কত যে নিচে নামতে হয়। কুলীনকুলসর্বস্ব ব্রাহ্মণ, ব্রাহ্মণ মানে বড় পদ, তাঁকে বসতে হল আমার মত এক হরিজনের সামনে। ছোট পদ মানেই হরিজন।

ব্যানার্জিসায়েবের মুখ বেজায় গম্ভীর। হাসেন, তবে আমাদের সামনে নয়। হাসলে পার্সোন্যালিটি লিক করবে। ভোরে টিনের চালে বসে কাক যে সুরে ডাকে সেই সুরে ব্যানার্জিসায়েব বললেন, দুর্গাপুজো সম্পর্কে কোনও আইডিয়া আছে।

দুর্গাপুজো? কিরকম আইডিয়া স্যার? মানে সার্বজনীন পুজো! প্রত্যেক বছর চাঁদা দি স্যার! দিতে দিতে ফতুর হয়ে যাই।

ওইতেই হবে, ওইতেই হবে। একটা বক্তৃতা লিখতে হবে। দুর্গা-পুজোর সঙ্গে একটু স্মল স্কেল ইন্ডাস্ট্রি পাঞ্চ করে দেবেন। বেশি বড়

করার দরকার নেই। পাঁচ দশ মিনিটের মত হলেই হবে, বেশ জমিয়ে লিখবেন। মনে রাখবেন মন্ত্রীর বক্তৃতা। যদি একচান্সে মনে ধরাতে পারেন, সঙ্গে সঙ্গে ওপর দিকে উঠে যাবেন। চড়চড় প্রমোশান। আর যদি জিনিসটা না জমে, ট্র্যানসফার্ড টু কুচবিহার।

বলছেন ?

ইয়েস। দেবতা প্রসন্ন হলে মানুষের কি না হয়।

মিত্তির সায়েব আর বাগড়া দিতে পারবেন না।

কারুর বাপের ক্ষমতা নেই বাঁগড়া দেয়। মন্ত্রী সো ডিজায়ার্স। কখন দিচ্ছেন লেখাটা ?

কালকে।

আরে না না, কাল উইল বি টু লেট। বেলা তিনটে নাগাদ আসব। অ্যাসেমব্লিতে টুক করে মন্ত্রীকে ধরিয়ে দিয়ে যাব। ব্যানার্জি-সায়েব চলে গেলেন। বিমল বললে, দুর্গাপুজোয় ইনডাস্ট্রি ঢোকাবি কি করে ?

ছাখ না ঠিক ঢুকিয়ে দোব। মহাভারতে অত মাল ঢুকতে পারে, পুজোয় স্মল স্কেল ঢুকতে পারে না !

বন্ধুগণ।

ওই দেখুন দুর্গা দশভুজা। সিংহবাহিনী, অসুরদলনী।

আমরা, এই আমরা, যারা আজ ক্ষমতার আসনে বসে আছি, তারাও দশভুজা অসুর দলনকারী।

দেশে আইন শৃঙ্খলাহীন যে জঙ্গলের রাজত্ব চলছিল, আমরা সেই আসুরিক শক্তিকে শক্ত হাতে দাবিয়ে রেখে ধীরে ধীরে জনজীবনে শান্তির শিবলিঙ্গকে প্রতিষ্ঠিত করেছি। মধুবাতা ঋতায়তে।

মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ, ওঁ মধু, ওঁ মধু, ওঁ মধু।

বিমলকে গৌরচন্দ্রিকাটা পড়ে শোনালুম। চারটে লাইন একেবারে ফর্মুলায় ফেলা। সমস্ত পুজোর আগে যেমন গণেশ পুজো, একদন্তং মহাকায়াং লম্বোদর-গজাননং, সেই রকম যারা ছিল তারা বদ, আমরা

যারা এসেছি, তারা গণেশের মতোই, বিঘ্ননাশকরং দেবং হেরম্বং, নিজেরাই নিজেদের প্রণাম করি। জনগণেশের সেবক আমরা। একেবারে কড়া নির্দেশ, মন্ত্রীর ভাষণের শুরুতেই পূর্বতন সরকারকে দু ছত্র চপেটাঘাত অবশ্যই করতে হবে। মা দুর্গার দশহাতের সঙ্গে মালটা কায়দা করে লাগিয়ে দিয়েছি। এইবার বাকিটা দুর্গা বলে নামিয়ে দিতে পারলেই ল্যাঠা শেষ।

বন্ধুগণ, আমাদের এই তেত্রিশ কোটি দেবদেবী সমাদরে পুজো পান না। খুবই দুঃখের কথা! আমরা যদি গদিতে পাকাপোক্তভাবে বসতে পারি, তাহলে ধীরে ধীরে সুপরিকল্পিতভাবে জনজীবনকে উৎসবে উৎসবে ভরিয়ে তুলব। এক যায় তো আর এক আসে। প্যাণ্ডেল আর খুলতেই হবে না। আলোর ঝালর বারোমাস ঝুলতেই থাকবে। মাইক গানে গানে আকাশ বাতাস অষ্টপ্রহর উদ্বেল করে রাখবে। যেও না নবমী নিশি লয়ে তারাদলে, কবির এই আক্ষেপ আর থাকবে না। আমাদের আগে যাঁরা ছিলেন, তাঁরা সব নিশিকেই অমাবস্যা নিশি করে তুলেছিলেন, আমরা আজ কৃতসঙ্কল্প, বন্ধুগণ, সুযোগ দিন, আপনাদের জীবনে নবমীর রাতকে আমরা চিরস্থায়ী করে ছেড়ে দোব। আপনারা আমাদের পাকা করুন, আমরাও আপনাদের পাখার বাতাস করব।

পুজো যত বাড়বে দেশের মানুষের অবস্থাও তত ভাল হবে। ঈশ্বরের আশীর্বাদ নেমে আসবে অকৃপণ ধারায়। বসুন্ধরা সুজলা সুফলা হবে। খরা থাকবে না, বন্যা আসবে না। শরতের শস্যক্ষেত্রে বাতাস নেচে যাবে বাতুলের আনন্দে। পুজো মানেই শিল্প। পুজো অর্থনীতিকে ঠেলা মারে, চাঙ্গা করে তোলে। কুমোর পাড়ার গরুর গাড়ি তাল তাল এঁটেল মাটি ডাঁই করে। চ্যাঁচারি, দরমা, খড়, পাট, দড়ি, শোলা, জরি, সলমা, চুমকি, সাটিন কাঁচামাল আসতেই থাকে, আসতেই থাকে। সপরিবারে শিল্পী আটচালায় বসে পড়েন প্রতিমা গড়ার কাজে। বাবুরা আসতে থাকেন বায়নার টাকা নিয়ে। দুর্গাপুজোই সবচেয়ে বড় পুজো। একঢিলে ছ'পাখি। মা দুর্গা, সরস্বতী, লক্ষ্মী, গণেশ, কার্তিক, অসুর

জীবজন্তুর মধ্যে সিংহ, প্যাঁচা, হাঁস, ময়ূর, ইঁদুর। মা দুর্গাকে সপরিবারে সাপ্লাই দিতে হয়। সবই ম্যাগনাম সাইজের। প্রচুর বাঁখারি, কঞ্চি, পাট, মাটি, তুঁষ, কাপড়, রঙ লাগে। আমি তাঁদের ধন্যবাদ জানাই যাঁরা মায়ের একান্নবর্তী পরিবারকে ভেঙে টুকরো টুকরো করেছেন। পরোক্ষে তাঁরা বাংলার দরিদ্র শিল্পী পরিবারকে প্রভূত সাহায্য করেছেন। একেই বলে কারুর সর্বনাশ, কারুর পৌষ মাস।

বন্ধুগণ, আপনাদের গলায় গামছা দিয়ে যাঁরা চাঁদা নিয়ে যান, তাঁদের ওপর অসন্তুষ্ট হবেন না। ভক্তের ভক্তির পুজো নাই বা হল। সবাই কি আর রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ। পাড়ায় পাড়ায় হুল্লোড়ের পুজোই হোক। এক কমিটি ভেঙে শত কমিটি হোক। শিল্প বাঁচুক, শিল্পী বাঁচুক। আমরা যদি সুপরিকল্পিতভাবে আরও কিছু দেবীকে জাতে তুলতে পারি, তা হলে কুমোরপাড়া সারা বছরই রমরমে হয়ে থাকবে, কাপড় জামার দোকানে সারা বছরই পুজো লেগে থাকবে। প্যাণ্ডেলওয়ালাদের প্যাণ্ডেল আর খুলতে হবে না। এক যাবেন, আর এক আসবেন। তাসাপার্টি ন্যাশন্যাল অর্কেস্ট্রার চেহারা নেবে।

বন্ধুগণ, এই সব মূঢ়, ম্লান, মূক মুখে হাসি ফুটবে। মা হাসবেন, ছেলে হাসবে। বছরে একবার চাঁদা দিতে গায়ে লাগে। দিতে দিতে অভ্যাস হয়ে গেলে, ইনকামট্যাকস, সেলট্যাকসের মত সহজ হয়ে যাবে। মনে তখন আর কোন বাধা থাকবে না। তৈয়ার বলে, গেরস্থ হাসি হাসি মুখে, আপ্যায়নের ভঙ্গিতে চাঁদা তুলে দেবে।

বন্ধুগণ, এ চাঁদা চাঁদা নয়, পরভৃতিকা। চাঁদা নয়, বলুন পারকোলেশান অফ ওয়েলথ। চাঁদা নয়, বলুন সাম্য। আমাদের সংবিধান যে সাম্য, মৈত্রী আর একতার কথা বলেছেন, তা রাজনীতি দিতে পারবে না। রাজনীতি কোনও নীতিই নয়, এক ধরনের ছ্যাঁচড়ামি। বারোয়ারীই হল সমস্যা সমাধানের পথ। চাঁদায় প্রতিপালিত হবে শিল্পী, চাঁদায় প্রতিপালিত হবে বেকার। আমরা আর কতজনকে চাকরি দিতে পারব! বেকারদের ফেলে দিন মায়ের চরণে, বাবার

চরণে। বাছারা বেঁচেবত্তে থাক। তাদের বাঁচা দরকার। তা না হলে নির্বাচনে লড়বে কারা, দেয়ালে দামড়া অক্ষরে জাতিকে জাগরণের বাণী শোনাবে কারা। জয় হিন্দ।

না, জয় হিন্দ এখানে চলবে না। রেডিও কি টিভির ভাষণে চলে। পাড়ার পুজো প্যাণ্ডেলে বেমানান। কেটে উড়িয়ে দিলুম।

বিমল শুনে বললে, একটু যেনফাজলামোহয়েগেল রে। মিনিস্টার না রেগে যান। রেগে গেলে তোর চাকরি যাবে মাইরি।

একটু প্যাঁচ কষে দিলুম। কেন বল তো?

নিজের ওপর নিজে প্যাঁচ কষলি। কালিদাসের টেকনিক? যে ডালে বসে আছিস সেই ডালটা কেটে ফেলার প্যাঁচ?

আজ্ঞে না স্যার। ব্যানার্জিসায়েবের বাঁশ তৈরি হল। হাতে করে নিয়ে যাবেন, পেছনে করে ফিরে আসবেন। ওই মাল আমাকে গত বছর বাঁশ দিয়েছিল, মনে আছে?

তোর সেই প্রমোশান?

আজ্ঞে হ্যাঁ। ইন্টারভিউতে যত জামাইঠকানো প্রশ্ন করেআমাকে আউট করে দিয়ে নিজের শালাকে ঠেলে ওপরে তুলে দিলে। সে মালকে তো চিনিস। একেবারে নীলকণ্ঠ। পাপ করে করে পাকতেড়ে মেরে গেছে।

বিমল ফিস্ করে মুখে শব্দ করল। ব্যানার্জিসায়েব আসছেন।

কি হয়ে গেছে?

এমনভাবে বললেন, যেন আমি মালের বাপের চাকর। মাল শব্দটা আমি বিমলের কাছে শিখেছি।

হ্যাঁ স্যার।

দিন দিন। বড় হয়ে গেল না কি? ক মিনিট?

চার-পাঁচ মিনিট হবে।

দেন ইট ইজ অলরাইট। প্রাইভেট সেক্রেটারি এর মধ্যে বার-তিনেক ফোন করেছেন। এত জিনিস আবিষ্কারহয়েছে, বক্তৃতা লেখার

একটা যন্ত্র বেরলে বেশ হত। কল টিপে জল বের করার মত। দরকার মত এক-মিটার, দু-মিটার বক্তৃতা বের করে নেওয়া যেত।

বিমল বললে, কাজটা কি ভাল হল? কে লিখেছে বলে, সেই দুর্বাসা যখন চিৎকার করবে, তখন তো মাল তোমাকে নিয়ে টানাটানি হবে।

তুইও যেমন, মালকে চেন না, হেসে হেসে বলবে, এই যে স্যার লিখে নিয়ে এসেছি। ভেরি ডিফিকাল্ট সাবজেক্ট। পুজোর সঙ্গে ইন্‌ডাস্ট্রি। আপনার মাথাতেও আসে স্যার।

বিমল মন্ত্রীর গলা নকল করে বললে, এইরকম মাথা বলেই আপনাদের মত গাধাদের সামলাতে পারছি।

আমি ব্যানার্জিসায়েবের গলায় বললুম, হেঁ হেঁ তা যা বলেছেন স্যার। আমাদের গাধা বললে, গাধারাও স্যার প্রতিবাদ করবে।

বিমল বললে, থাক, নিজেদের চিনতে পেরেছেন দেশের মানুষের সৌভাগ্য। এক তারা দু'তারা, তারা তিন চার।

বিমল আবার গান ধরল, টেবিলকে তবলা করে। তিন তালে বেশ কিছুক্ষণ কালোয়াতি চলল। অফিস না পাড়ার ক্লাব, এ প্রশ্নের কোনও অর্থ হয় না।

দেখতে দেখতে বেলা বাড়তে লাগল। দু'চারজন পাবলিক খবরা-খবর সংগ্রহে এলেন। শিল্পের খবর। কি করলে, কি হয়! দেশে চাকরি নেই। ব্যবসা বাণিজ্যের দিকেই ঝোঁ ঝুঁকতে হবে।

একজনকে বলা হল, ইট তৈরি করুন। গঙ্গায় ভীষণ পলি পড়ছে। কাটুন আর ছাঁচে ফেলে ইট বানান। সভ্যতার ফাউণ্ডেশানই হল ইট। নাক সেঁটকাবেন না। ইট শুনতে খারাপ লাগলে বলুন বিলডিং ব্লকস। মানুষের যেমন আদি মানব আছে, শিল্পেরও তেমনি আদি শিল্প আছে। ইট সেইরকম একটি জিনিস। ইটের মার নেই। পচবে না, গলবে না। থাউজেণ্ড অ্যাণ্ড ওয়ান ব্যবহার। বাড়ি তৈরিতে লাগবে প্লাস মানুষ যত রাজনীতি সচেতন হবে ইটের ব্যবহারও তত বাড়বে। ইটের

নাম তখন ব্রিকব্যাটস। ভেঙে টুকরো করে সাপ্লাই দিন। অপোনেন্টকে ঘায়েল করার এর চেয়ে ভাল দিশি গোলা আর কি আছে।

আর একজনকে বলা হয় পাঁপর তৈরি করুন। বাংলার ঘরে ঘরে পাঁপরশিল্প চালু হোক। এটা আমাদের সাম্প্রতিক মস্তিষ্কতরঙ্গ। কর্তৃপক্ষ ভেবেচিন্তে বের করেছেন। ঘরে ঘরে মেয়েরা বেকার। চুল বাঁধছেন আর চুলোচুলি করছেন। মেয়েদের একবার পাঁপরশিল্পে জুড়ে দিতে পারলে, পাড়া জুড়োবে, বর্গী আসবে। বর্গী নয় নির্জন দুপুরে ঘুঘুর ডাক কানে আসতে থাকবে। পাঁপরের ওপর প্রায় চল্লিশ পাতার একটা রিপোর্ট, সাইক্লোস্টাইল করে, হলদে মলাট দিয়ে বেঁধে মন্ত্রীর টেবিলে দেওয়া হয়েছে। বড় বড় অক্ষরে লেখা।

TOTAL EMPLOYMENT AND PAPAD

সাতটা অধ্যায় অতীত বাংলা, বর্তমান বাংলা, ইতিহাসে পাঁপর, ডালের উৎপাদন, গুদাম ও পোকা খাওয়া ডাল, জল ও লোহাজল, বাঙালীর আহার-বৈচিত্র্য, পাঁপর ও পার্ক, পেট ও পাঁপর, অ্যালকহল ও পাঁপর, অবাঙালী সম্প্রদায় ও পাঁপর, তেলেভাজা পাঁপর ও সেঁকা পাঁপর, বিবাহ ও লোকাচারে পাঁপর, হজম-বদহজম ও পাঁপর, বর্ষা ও পাঁপর। সাতটি অধ্যায় জুড়ে পাঁপরের শ্রাদ্ধ, শান্তি তিলকাঞ্চন।

ভদ্রলোক বললেন, কি যে রসিকতা করেন মাইরি। পাঁপর আবার একটা শিল্প!

আজ্ঞে হ্যাঁ মশাই, কুটির শিল্প।

বিলল বললে, পেঁয়াজিটাও একটা শিল্প।

ভদ্রলোক চেয়ার ঠেলে উঠতে উঠতে বললেন, তা তো দেখতেই পাচ্ছি। যা আপনারা দিন রাত বছরের পর বছর করছেন।

দুই

সেদিন, বেলা তিনটে টিনটে হবে, পুজোর দীর্ঘ ছুটির পর অফিস সব খুলেছে, বসে বসে একটু স্টিম নিচ্ছি, কাজে মন বসাতে আরো দিন পনের সময় লাগবে, ততদিনে কালীপুজো এসে যাবে। কালী-পুজো, ভাই ফোঁটা মিলিয়ে আবার দু'দিন ছুটি। পুজোর ছুটিতে মধুপুর মেরে এসেছি। কালীপুজোয় দীঘা যাব ক্যালেণ্ডার দেখছি। এক দিন ক্যাজুয়েল নিলে পর পর তিন দিন হয়ে যাবে।

সবে মধুপুর থেকে এসেছি। ছুটির ঘোর এখনও কাটেনি। বেলা পড়ে এলেই মনে হয় মধুপুরে পাথরোল নদীর ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আকাশ লাল করে পশ্চিমে সূর্য ডুবছে। বেশ ভাবে ছিলুম। হঠাৎ মুখার্জিসায়েব এসে ভাব চটকে দিলেন।

দু'আঙুলে নস্যির টিপ। সামনের চেয়ারে বসতে বসতে বললেন, কেমন আছ ?

ভাল আছি স্যার। আপনি !

চলছে। চলে যাচ্ছে ঈশ্বরের অসীম কৃপায়।

বেশ নাদুস নুদুস বিশ্বাসী মানুষ। এক সময় অধ্যাপনা করতেন। এই চাকরিতে মাঝামাঝি জায়গায় ঢুকেছিলেন। চড় চড় করে ঠেলে ওপর দিকে উঠে গেছেন। এঁর জীবনে দুটি হবি। এক নম্বর, উঁচু পোস্ট খালি দেখলেই ইন্টারভিউ দেওয়া। সে যেখানেই হোক। দু' নম্বর, একটু লেখা।

প্রথমটা আমাদের কাছে তেমন ভীতিপ্রদ নয়। লেখাপড়া করে উনি ইন্টারভিউ দেবেন, সে তো নিজের পাঁঠা। তার জন্যে দু'-একটা বইপত্তর যোগাড় করে দেবার অনুরোধ, এমন কিছু বড় বায়না নয়। রাখলে রাখা যায়, না পারলে বলে দেওয়া যায়।

দু'নম্বর হবিটাই আমাদের পক্ষে বেশ ভীতিপ্রদ, অন্তত আমার পক্ষে। এই সায়েবটি খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠেন। তখন আকাশ

অন্ধকার। দরজার পেরেকে আয়না ঝুলিয়ে ঝাঁ করে দাড়িটা কামিয়ে নেন। তারপর পায়চারি করতে করতে মাথায় ভাব এসে যায়। পাখির মতো একটা দুটো করে লাইন আসতে থাকে ডানা মেলে। বেগ যখন বেশ টনটনে হয়ে ওঠে, থাঁ করে চলে আসেন লেখার টেবিলে। প্যাডের কাগজ টেনে নিয়ে প্রথমেই লেখেন—ওঁ সরস্বতী। তারপর গড়গড়িয়ে কলম চলল। ভূতাবিষ্টের মত লিখেই চললেন। সকালে বাজারের ভাবনা নেই। ফেরার পথে সন্ধেবেলাতেই সেরে ফেলেন। ভাবের মাত্রা এমন মাপাপাত্রে আসে যেন টাইমবোমা। সাড়ে সাতটা বাজল, শেষ লাইন নেমে গেল। লেখার তলায় খ্যাঁস করে একটা দাঁড়ি, দুটো ফুটকি। ফিনিস।

নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের মত নিষ্ঠাবান কর্মী। অফিস দশটায়। আসেন ঠিক ন'টায়। অফিসে বসেই সাইরেন শোনেন। আর আমরা, যারা অবশ্যই দেরিতে আসি আর তাড়াতাড়ি চলে যাই, তাদের মাঝে-মধ্যেই ডেকে ডেকে বলেন ঠিক সময়ে অফিসে আসা একটা সৎ অভ্যাস। দেশের মানুষ আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। আমরা নীতিভ্রষ্ট হলে জাতি নীতিভ্রষ্ট হবে। ফলো মি। রাত দশটা বাজলেই আমি শুয়ে পড়ি, উঠি ভোর চারটেয়। যত ভোরে ওঠা যায় ততই দিন বড় হয়। কাজের সময় বেড়ে যায়। আমি নিজে হাতে সব কাজ করি।

বড় কর্তা যখন তখন তো মাইল্ড কিম্বা কড়া ডোজে উপদেশ দেবেনই। পিতা অন্ন দেবেন, শিক্ষক কান মলে দেবেন, কবিরাজ পাঁচন দেবেন, স্ত্রী মুখ ঝামটা দেবেন, প্রতিবেশী বাঁশ দেবেন, পুত্র দুঃখ দেবে, গুরু দীক্ষা দেবেন, গাভিন হলে গরু দুধ দেবে, যার যা ধর্ম। আমরা এ কান দিয়ে শুনি ও কান দিয়ে বের করে দি। ঈশ্বর দুটো কান দিয়েছেন কেন ?

মুখার্জিসায়েব সাজ পোশাকে খুব সাদাসিধে। ঝলঝলে প্যান্ট জামা। বাড়িতে কাচা। কলারে ইস্ত্রি নেই। শীতে একটা আকার আকৃতিহীন কোট বেরোয়, গলায় একটা টাই ওঠে। নস্যি নাকে পুরে,

চারপাশে বেশ ভাল করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন। দপ্তরে আমি একা কুম্ভ। বিমল ছুটির ওপর ছুটি চাপিয়ে চলেছে। রবিবারের পর সোমবারেই ওর আর বেরতে ইচ্ছে করে না। দীর্ঘ ছুটির পর নাকি চাকরি ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করে। বৃদ্ধ পিতা ঠ্যাঙা নিয়ে তাড়া করলে তবেই আবার কোঁত পাড়তে পাড়তে অফিসে আসে। সেই ঠ্যাঙাটি মনে হয় এখনও বেরোয়নি।

মুখার্জি সায়েবকে দেখলে ভীষণ আতঙ্ক হয়। মন বলে ওঠে, এই রে মরেছে। নিজের চেম্বারে টেনে নিয়ে যাবেন, পাঁচনের মত এক কাপ চা খাওয়াবেন, মুখটা বোদা মেরে যাবে। তারপর মড়াখেকো একটা ফোলিও ব্যাগ থেকে মোটা খাতা বের করে একের পর এক কবিতা পড়তে থাকবেন। ওঁর ধারণা, ওগুলো খুবই উচ্চ স্তরের মাল, জীবনদর্শনের মশলায় ঠাসা, তেমনি তার কারিকুরি। ধৈর্য ধরে শুনলুম, বাঃ বেশ হয়েছে, বলে সরে পড়লুম সেটি হচ্ছে না। সে গুড়ে বালি প্রতিটি কবিতার ব্যাখ্যা চাই। কি বুঝলে মানিক, বলো দেখি! ফলে কান খাড়া করে শুনতে হবে। কি লিখেছেন, কারুর বাবার ক্ষমতা নেই ধরে। নিজেও হয়ত জানেন না। ব্যাখ্যা শুনে বলবেন, হ্যাঁ, ধরেছ ঠিক, তুমি অবশ্য অন্য রাস্তায় গেলে। তা হোক, ভাল কবিতার ধর্মই হল, যে যেমন বোঝে। ছটা বাজবে, সাতটা বাজবে, অফিস খাঁ খাঁ করবে, অফিস পাড়া নির্জন হয়ে যাবে, তখনও কবিতা চলবে। অর্ডারলি পিওন টুলে বসে ঢুলতে থাকবে। ঝাঁটা হাতে ঝাড়ুদার বারেবারে উঁকি মারতে থাকবে। চোখাচোখি হলেই বলবে, সেলাম সায়েব। সায়েব অন্যমনস্কে বলবেন, হ্যাঁ হ্যাঁ সেলাম।

জীবনেরও জানালা আছে
নীলডানা গণেশের গাত্র চর্মে
হৃদয়ের হাসি শুনি
বিধবার নিমীলিত চোখে॥

সেলাম সায়েব। হ্যাঁ হ্যাঁ সেলাম,

মাঝরাতে ফিটনের চাকা ঘোরে
দুর্দান্ত ঝড় ওঠে
কদম্বের চুলচেরা বুকে,
সাজানো অজানা
পণ্ডিতের তর্ক জোড়ে
টোল ভেঙে পড়ে

সেলাম সায়েব,

হবে হবে সব হবে
মৃত্যু মেতে ওঠে
প্রেয়সীর
অস্পষ্ট জটার বাঁধনে॥

সুইপার মরীয়া হয়ে চিৎকার করে উঠবে, সেলাম সায়েব। আমিও সাহস করে বলব, স্যার প্রায় আটটা বাজল।

তাই নাকি? তা হলে চলো ওঠা যাক।

উঠতেও অনেকখানি সময় লাগবে। সমস্ত টেবিল-সজ্জা একে একে ড্রয়ারে ঢুকবে। তিনটে ক্যাবিনেটে চাবি পড়বে, সেই চাবি আবার আর একটা লকারে গচ্ছিত হবে। সেই লকারের চাবিটি ব্যাগে ঢুকবে। নিজের হাতে দুটো জানলা বন্ধ করবেন। একটা মাত্র আলো রেখে বাকি আলো আর পাখার সুইচ অফ করবেন। তারপর যাবেন বাথরুমে। ফিরে এসে বলবেন, চলো তোমাকে মানিকতলা পর্যন্ত লিফট দিয়ে দি। সে আবার আর এক বাঁশ। আমাকে উজিয়ে ফিরে আসতে হবে ধর্মতলা। সেখান থেকে শুরু হবে গৃহযাত্রা। বাড়ি যখন ফিরব তখন চোরেদের সিঁদ-কাঠি নিয়ে জীবিকায় বেরোবার সময় হয়েছে।

মুখার্জি সায়েব মুচকি হেসে বললেন, কি, আজ আমাদের সিটিং হবে না কি? নাঃ, আজ থাক।

হাতে যেন স্বর্গ পেলুম, হ্যাঁ স্যার, আজ থাক।

কেন থাক বল তো?

অধ্যাপক ছিলেন, তাই সব সময়েই সব কিছুর ব্যাখ্যা খোঁজেন। বললুম, তা তো জানি না স্যার।

আচ্ছা, এর মধ্যে তুমি কি দুর্গাপুজোর ওপর কোনও কিছু লিখেছিলে?

মরেছে, 'হ্যাঁ' বলব, 'না' বলব! এগোলেও নির্বংশের ব্যাটা, পেছলেও নির্বংশের ব্যাটা।

বিমলের কথাই বোধহয় ফলতে চলেছে। কালিদাস ডাল কেটে কবি হয়েছিলেন, আমি বেকার হব। ভয়ে ভয়ে বললুম, হ্যাঁ স্যার।

ধরেছি ঠিক। আর এক টিপ নস্যি নিলেন।

কেন স্যার কি হয়েছে?

মার দিয়া কেল্লা।

কার কেল্লা স্যার। আমার কেল্লা?

একরকম তোমারই কেল্লা বলতে পার।

চাকরিটা গেল স্যার?

কোথাকার জল কোথায় গড়ায় একবার ত্যাখো। মন্ত্রীর খুব পছন্দ হয়েছে, একেবারে উচ্ছ্বসিত। আমাকে আজ বললেন, মুখার্জি একবার খোঁজ করুন তো, ও-জিনিস মাথামোটা ব্যানার্জির কলম থেকে বেরবে না। ফাইণ্ড আউট দি ম্যান। আমার তখনই সন্দেহ হয়েছিল, এ তোমার কাজ। ওই কাঁচা-খেকো দেবতাকে সন্তুষ্ট করা, কম কথা? এইবার দেখা যাক তোমার জন্যে একটি নতুন পোস্ট তৈরি করা যায় কিনা। প্রত্যেকবার ফাইনান্স বাগড়া দেয়।

মনে মনে বললুম, ওই জন্যেই তো স্যার, বসে বসে আপনার ভট্টি কাব্য শুনি, একটাও হাই তুলি না। মাথা খাটিয়ে উদ্ভট লাইনের ব্যাখ্যা খুঁজি।

তা হলে চলো।

কোথায় স্যার ?

মন্ত্রী সকাশে।

আমাকে আবার টানাটানি কেন ?

তার মানে ? মন্ত্রী তোমাকে ধরে নিয়ে যেতে বলেছেন।

ছুটি হতে এখনও কিন্তু ঘণ্টখানেক বাকি, এই দপ্তর কিন্তু বন্ধ করে যেতে হবে ?

হ্যাঁ, বন্ধ করেই যাবে। তুমি তো রাজদর্শনে যাবে। সাত খুন মাপ।

আপনিই বলেছিলেন, জনসংযোগ দপ্তর ঠিক সময়ে খুলবে, ঠিক সময়ে বন্ধ করবে।

আজ আর কোন নিয়ম নেই। সাধারণ মানুষ অপেক্ষা করতে পারেন, মন্ত্রী পারেন না। নাও উঠে পড়।

অগত্যা উঠতেই হল। পাশ কাটানো গেল না। বাইরেই গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। মুখার্জি সায়েব ড্রাইভারকে হুকুম দিলেন, অ্যাসেমব্লি চল। ভয়ে বুক ধুকপুক করছে। যতই বলছেন ভয়ের কি আছে, খেয়ে তো আর ফেলবেন না, ততই ভয় বেড়ে যাচ্ছে। একটা বড় বাইরে বাইরে ভাব।

॥ তিন ॥

অ্যাসেমব্লিতে আমাদের মাননীয় মন্ত্রীর একটি ঘর।

মন্ত্রীরা সব সময়েই মাননীয়। সায়েবরা বলেন অনারেবল। আমি এক মন্ত্রীর স্ত্রীকে জানি যিনি জেলা পরিদর্শনে গিয়ে ভোরবেলা ডাক-বাংলোর হাতায় দাঁড়িয়ে জনৈক তটস্থ উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে বলেছিলেন, অনারেবল মিনিস্টার রোজ দেড় সের পরিমাণ খাঁটি দুধ খান। আপনি অবিলম্বে সেই দুধের ব্যবস্থা করুন।

ইয়েস ম্যাডাম বলে তিনি যেই দৌড়তে যাবেন অধস্তন বললেন,

দিক ঠিক করে দৌড়ন স্যার। পুরুলিয়া শহরে গবাদি পশুর বড় অভাব, দু' একটা চা-গরু মিলতে পারে, দেড় সের খাঁটি দুধ পাবেন কোথায় ?

দ্যাটস নট ইওর লুক আউট, বলে তিনি ডাকবাংলোর কম্পাউণ্ডে ভূতেধরা মানুষের মত গোল হয়ে ঘুরপাক খেতে লাগলেন।

জিজ্ঞেস করেছিলুম, চা-গরুটা কি জিনিস মশাই।

আরে ম্যান চা-গরু অনেকটা ছাগলের মত দেখতে হয়। যখনই বাঁটে হাত দেবেন, ছিড়িক করে এক চামচে দুধ ছাড়বে, এক কাপ চা করার মত। আমরা নাম রেখেছি চা-গরু।

এ দেশে মন্ত্রীরাই শুধু বুদ্ধিমান নন, বুদ্ধিমান প্রজারও অভাব নেই। গুঁড়ো দুধ ডিস্টিলড ওয়াটারে গুলে বটের আঠা মিশিয়ে দেড় সের খাঁটি গোদুগ্ধ তৈরি হল। বটের আঠা কম গোলমেলে নয়! ছটা বাচ্চা পেড়ে ছাগল যখন নেতিয়ে পড়ে তখন বটপাতা খাইয়ে তার স্তনে দুধ আনা হয়। বৃক্ষ বট, মন্ত্রী বট, আহার বটদুগ্ধ।

অ্যাসমব্লির মন্ত্রী মহোদয় বসে আছেন। চোখ জবাফুলের মত লাল। দেখলেই বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়। সবসময় দাঁত মুখ খিঁচিয়ে খিঁচিয়ে মুখটাই ডিসফিগার্ড হয়ে গেছে। অনবরত চিৎকার করে বক্তৃতা দিয়ে গলা হয়েছে ফাটা কাঁসরের মত।

চোখ দুটো মোটরগাড়ির ব্যাকলাইটের মত। জ্বলছে, জ্বলবে। দাঁত খিঁচিয়ে বললেন কি চাই ? মুখার্জি সায়েব থতমত খেয়ে বললেন, আজ্ঞে এনেছি।

ঠেঙিয়ে ব্যাটার নাম ভুলিয়ে দাও।

মুখার্জি সায়েব মুখ কাঁচুমাচু করে বললেন, আজ্ঞে স্যার।

আপনাকে নয়, চুপ করে বসুন। আমি সনাতনকে বলছি। অপদার্থ শয়তান। পুলিস কি করছে ? তোমাদের পুলিস ?

ধরছে আর ছাড়ছে। এ মুখ দিয়ে ঢুকছে ও মুখ দিয়ে বুক ফুলিয়ে বেরিয়ে আসছে।

মন্ত্রী টেবিলে এক ঘুসি মেরে বললেন, এই আমলারা, রাসকেল

আমলারাই আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে গদি টলিয়ে দিলে। গেট আউট।

সনাতন বললেন আমি আবার কি করলুম।

তোমাকে বলিনি পাঁঠা। আমি এই মুখার্জিকে বলছি।

মুখার্জি সায়েব কাঁদো কাঁদো মুখে বললেন, আমাকে স্যার আমলা বলবেন না। আরও দুধাপ ওপরে উঠলে তবেই আমলা হতে পারব।

তাহলে বসুন। সনাতন তুমি যাও। তোমাদের দ্বারা কিস্যু হবে না। আমার নাম জপে যদ্দিন গদিতে আছি, যা পার কামাই করে নাও। গাড়ির পারমিট বেরিয়েছে?

কবে!

নেমে গেছে?

কাল নামছে।

তবে আর কি? যাও বোতল খুলে বসে পড়

লোহার পারমিটটা যে এখনও আটকে আছে

কেন?

তা তো জানি না। ফাইলটা আটকে রেখেছে।

হোয়াট। মন্ত্রীর অর্ডার চেপে রেখেছে। আমি ওই সান্যালের প্যাণ্ট খুলে নোবো। অফিসার হয়েছে, অফিসার।

হাত বাড়িয়ে ফোন তুলে নিলেন।

মুখার্জি সায়েব মিউ করে বললেন, মিস্টার সান্যাল স্যার পোল্যাণ্ড গেছেন।

পোল্যাণ্ড। পোল্যাণ্ডে কেন?

আজ্ঞে লোহা চিনতে।

অপদার্থ। কে অ্যালাউ করেছে?

আপনিই স্যার করেছেন।

আই ওয়াজ মিসলেড।

মিঃ সান্যাল স্যার সি এমের লোক

এই সি এমরাই দেশের বারোটা বাজিয়ে দিলে। কবে যে আবার ওয়ান পার্টি রুল হবে। সামনের বার আমাকে সি এম হতেই হবে। সনাতন।

বল দাদা।

আরও এম এল এ চাই। মেজোরিটি আমার। তোমাকে আমি লোহা দিয়ে ইস্পাত দিয়ে সিমেণ্ট দিয়ে মুড়ে দোব।

দেশের লোক দাদা বড় সেয়ানা হয়ে গেছে।

বোকা বানাবার কল চালু করে দাও! এখনও সময় আছে। নাউ অর নেভার। এখন তুমি যাও তাহলে, অ্যাং।

সনাতন নামক জীবটি মাখমের মত মাখোমাখো হাসিতে মুখ ভরিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠলেন। হাসি যেন মুখ ছেড়ে আধ হাত লম্বা হয়ে বেরিয়ে আসছে। ঘর খালি হল। মন্ত্রী মহোদয়ের মুখ সাহিত্যসভার প্রধান অতিথির মত ভীষণ গোমড়া হয়ে আছে। যে জানে না, সে দেখলে ভাববে, বউ বুঝি খুব বকেছে। এ যে পলিটিক্যাল মার বাবা। কোথায় কে এক অপোনেণ্ট অ্যায়সা কলকাঠি নেড়েছে, আসনে ভূমিকম্প।

টেবিলে তিনবার টোকা মারলেন। দীর্ঘ একটি নিঃশ্বাস ছাড়লেন। তারপর মুখার্জি সায়েবের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনারা আর মানুষ হলেন না।

কেন স্যার?

সব অসতী, অসতী। ঘর করছেন একজনের সঙ্গে, শুতে যাচ্ছেন আর একজনের সঙ্গে। আপনারা হলেন বাজারের বেশ্যা।

এ স্যার কি বলছেন? ছি ছি।

চপ্, প্রতিবাদ করার সাহস আসছে কোথা থেকে। বাইরের খোলসটা হল সতীসাধ্বীর আর ভেতরের ভাবটা হল বারবনিতার। এক বাবুতে মন ওঠে না। নতুন নতুন চাই, নতুন নতুন।

হৃষ্টপুষ্ট মন্ত্রী মহোদয় চেয়ারে বসে বসেই স্প্রিঙের মত নাচতে

লাগলেন, ওপর নীচ, নীচ ওপর।

নতুন নতুন বলার সময় মুখের চেহারা হল কোলা ব্যাঙের মত। ডোবায় বসে ডাকছেন যেন, গ্যাঙোর গ্যাং। আচ্ছা জায়গায় এনে ফেললেন আমার শুভানুধ্যায়ী মুখার্জি সায়েব। একেবারে বাঘের ঘরে চারপাশে ঘোগের বাসা।

নাচ করে মন্ত্রী মহোদয় দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, মুখার্জি, আমি প্রতিবাদ পছন্দ করি না। যা বলব, তা মানতে হবে। মন্ত্রীর অবজার্ভেশানে কখনও ভুল হয় না। ভুল হলে দেশ শাসন করা যেত না, বুঝেছেন?

ইয়েস স্যার।

হ্যাঁ, ইয়েস স্যার। আমরা ইয়েসম্যানই পছন্দ করি। ওই সান্যালটার আমি বারোটা বাজাবই। পোল্যাণ্ডে গেছে আর একটু ঠেলে কুমেরুতে পাঠিয়ে দোব রাসকেল।

মুখার্জি সায়ের বললেন, আমি প্রতিবাদ করিনি স্যার। শুধু বলতে চেয়েছিলুম, আমি ওই গণিকাদের দলে পড়ি না। আই অ্যাম সো ডিভোটেড টু ইউ।

শুধু কথায় চিঁড়ে ভিজবে না মুখার্জি। প্রমাণ চাই, প্রমাণ। ডিভোসনের প্রমাণ।

কি ভাবে স্যার।

ওই সান্যালের চেয়ারে আপনাকে আমি বসাব। ওই চেয়ারে আমি আমার লোক চাই।

কি করে বসব স্যার?

ফুল, ছ্যাটস নট ইওর লুক আউট, আই উইল অ্যারেঞ্জ ইওর প্রমোশান।

কিন্তু সি এম?

ইডিয়েট। আমি দুর্নীতির অভিযোগ এনে হারামজাদাকে সাসপেণ্ড করব। আপনাকে দোব প্রমোশন। বাট ইউ মাস্ট বি ভেরি

অনেস্ট। আমার লোককে আপনি র মেটিরিয়েল দেবেন উইদাউট এনি হ্যারাসমেণ্ট।

অফকোর্স স্যার।

আ, এই ছেলেটি তাহলে আমার সেই বক্তৃতা লিখেছিল?

হ্যাঁ স্যার।

চেয়ার থেকে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে নমস্কার করলুম। ধাই করে টেবিলে হাঁটু ঠুকে গিয়েছিল। মনে মনে বাপ বললুম। মুখে যেন যন্ত্রণার রেখা না পড়ে। তাহলে কেস কেঁচে যাবে। যাঁর সামনে এসে বসেছি তাঁর একটা আঙুল নাড়ায় আমার বরাত ফিরে যেতে পারে। কতদিন ধরে জীবনবৃক্ষে মুকুল আসছে, ফল ধরছে, ঝরে পড়ে যাচ্ছে, পাকছে না। এইবার এমন সাব পড়তে পারে হয় গাছ জ্বলে যাবে নয়তো পদোন্নতির ফল পাকবে।

বোসো বোসো, হি লুকস্ ভেরি ইনোসেণ্ট। তোমার লেখায় বেশ ডেঁপোমি আছে হে। আমাদের গ্রাম্য ভাষায় তোমাকে পেছন-পাকা বলা যেতে পারে।

আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।

রাজনীতি করো?

আজ্ঞে না স্যার।

এই রকম একটা দুটো র মাল আমার চাই মুখার্জি। বাইরে ইনোসেণ্ট, ভেতরে শয়তানি। তোমাকে আমার কাজে লাগবে। যাও। এখন যাও। আমার কাজ আছে।

আমরা দু'জনে সমস্বরে ইয়েস স্যার বলে উঠলুম।

মুখার্জি সায়েব গাড়িতে উঠতে উঠতে বললেন যাক তোমার কপালটা এত দিনে ফিরল। একই পোস্টে ঘ্যাসড়াচ্ছো বছরের পর বছর।

হঠাৎ মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, একবার তো আপনার জন্যই আমার প্রমোশন হল না। আপনার ভাগনেকে লড়িয়ে দিলেন।

এ তুমি কি বলছ ? নিজের ভাগনে আগে না তুমি আগে ? এর পরের চান্সে তোমারই হত।

আপনার কি মনে হল ?

তার মানে ?

এই যে মন্ত্রী বললেন, পেছন-পাকা, ভেতরে শয়তানি, চাকরিটা যাবে না তো ?

আরে না না, ওসব সোহাগের কথা। মেজাজ এখন খুব চড়েই থাকবে। টার্ম শেষ হয়ে আসছে, ইলেকশান প্রায় এসেই গেল। চলো তোমাকে মানিকতলা পর্যন্ত লিফট দিয়ে দি।

সেরেছে রে, আবার মানিকতলা।

মানিকতলা বাজারের কাছে গাড়ি দাঁড়াল। সায়েব বাজার করবেন। আমাকে বললেন, এত ভাল আর রকম রকম মাছ, তুমি কলকাতার অন্য কোনও বাজারে পাবে না। মাছ কিনবে নাকি ?

অপরাধীর মত মুখ করে বললুম আমার মাছ কে রাঁধবে স্যার।

মনে মনে বললুম, আপনি তিন হাজারি মনসবদার, ছরকম মাছ দিয়ে ভাত খেতে পারেন। আমাদের একবেলা এক চিলতে জোটাতেই জিভ বেরিয়ে যায়।

তিন রকমের ব্যাগ হাতে গাড়ি থেকে নামতে নামতে মুখার্জি সায়েব বললেন বুঝলে, আমি একটু ভোজনবিলাসী। তিন রকমের মাছ না হলে আমার মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। সবাই ঠাট্টা করে বলে মৎস্যাবতার। মাছের কপালটাও আমার ভাল। এই বাজারে ঢুকলেই দেখতে পাবে।

আমিও যাব স্যার ?

বাঃ মাছ দেখবে না ! সব রকম মাছ তুমি চেন ?

একটা মাছই আমি চিনি, তা হল কাটা পোনা।

কাটাপোনা, হাঃ হাঃ কাটা পোনা আবার মাছ নাকি হে। চলো চলো, ফলুই দেখবে চল। রুপোর মত চেহারা। জলের গামলা ছেড়ে

দশ বারো হাত করে লাফিয়ে উঠছে।

কলকাতায় বেশ কাঁঠালপাকা গরম পড়েছে। প্রাণ একেবারে আইঢাই। সবে সকাল সাড়ে দশটা। শহরে যেন আগুন ছুটছে। জামার বুকের সবকটা বোতাম খুলে দিয়ে বিমল চেয়ারে বসে ঝিমোচ্ছে। কাল সারারাত কোথায় গান গেয়ে এসেছে।

হঠাৎ ফোন বেজে উঠল।

হ্যাঁ বলছি।

একবার আসতে হচ্ছে

এখুনি?

হ্যাঁ, এক্ষুনি। অনারেবল মিনিস্টারের তলব

আপনি কে বলছেন স্যার?

অনারেবল মিনিস্টারের পি এ।

অনারেবল মিনিস্টারের ঘর খুঁজে পেতেই জীবন বেরিয়ে গেল। মন্ত্রী মহলে এত ঘুরপাক! দেউড়ির পুলিশকে বলা ছিল, তাই কাছা ধরে টানেননি।

চারটে টাইপরাইটার একই ছন্দে বেজে চলেছে। চারটে টেলিফোনের একটা থামে তো আর একটা বাজে। টেলিফোনের সামনে যিনি বসে আছেন, তিনি অষ্টভুজ মহাদেবের মত, টেলিফোনের ভোজবাজি দেখাচ্ছেন। তুলছেন, ফেলছেন, ফেলছেন, তুলছেন। যেন জিলিপি ভাজা হচ্ছে।

মন্ত্রী মহোদয়ের ঘরের বাইরে লাল আলো জ্বলছে। এনগেজড।

অনেকক্ষণ বসে আছি। একটু উসখুস করলেই প্রজাপতি গোঁফ-ওয়ালা এক ভদ্রলোক ধমকের সুরে বলছেন, চুপ করে বসুন। সময় হলেই ডাক আসবে। আচ্ছা ল্যাঠা রে বাবা! আমি তো আসিনি, তিনিই তো ডেকেছিলেন।

অরশেষে ডাক এল। প্রজাপতি গোঁফ ধমকের সুরে বললেন, যান, ডাকছেন।

সব মেজাজ ছ্যাখো ! যেন ঘেও কুকুর ! মন্ত্রী মহোদয়ের হাওয়া লেগেছে আর কি ! নীল রঙের দরজা ঠেলে ঘরে পা রাখতেই, পা যেন ডুবে গেল। জলে নয়, নরম কার্পেটে। টেবিলের সামনে পাঁচটা সারিতে অন্তত কুড়িটা চেয়ার। ঘোড়ার ক্ষুরের আকারে বিশাল একটি টেবিল। টেবিলের আবার একতলা, দোতলা হয় এই প্রথম দেখলুম। অনেকটা ঘুঘু দেখেছ, ফাঁদ দেখো গোছের অভিজ্ঞতা। একতলায় কাঁচ লাগানো, তার ওপর মন্ত্রী মহোদয়ের হাত। দোতলায় ব্যালকনিতে যাবতীয় দ্রব্যসম্ভার. যেন খেলার সামগ্রী। কলমদানি, ভেলভেটের পিনকুশান, হ্যানাত্যানা। সারা ঘরে হিলহিল করছে একটা যান্ত্রিক ঠাণ্ডা।

মন্ত্রী মহোদয়ের কাশি হয়েছে। বিশ্রী কাশি। সাইবেরিয়ায় যেন হায়না কাশছে। ঘরটা এত পেল্লায়, ক্ষমতার ঘূর্ণায়মান আসনটি এত বিরাট, আর আমি এত ক্ষুদ্র, মনে হল, আমি একটা টিকটিকি। টিকটিক না করলে, নজরেই পড়ব না।

সেই গানটা মনে খেলে গেল, আমি এসেছি, আমি এসেছি-ই, বঁধু হে।

লয়ে এই হাসি রূপ গান।

দরজা থেকে দুপা এগিয়ে, দেয়াল ঘেঁসে দাঁড়িয়ে ক্ষীণকণ্ঠে ঘোষণা করলুম, আমি এসেছি স্যার।

দেখেছি। অমন ন্যাকা সুরে কথা বলছ কেন? লিঙ্গ ঠিক আছে তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

দ্বিতীয় সারির তিন নম্বর চেয়ারে বোসো।

ভয়ে ভয়ে বসলুম: সম্বর্ধনাটা তেমন সুবিধের হল না। লিঙ্গ সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। মেডিকেল বোর্ডে না পাঠিয়ে দেন! আজ আবার চোখে চশমা উঠেছে।

মৌমাছি কাকে বলে জান?

আজ্ঞে হ্যাঁ, যে মাছি মধু দেয়।

তোমার মাথা। এ কি গরু যে পালান ধরে চ্যাঁক চোক করলেই দুধ দেবে! মৌমাছি মধু সংগ্রহ করে। সংগ্রহ করে চাকে রাখে। বুদ্ধিমান মানুষ চাক ভেঙে সেই মধু খায়। ভাল্লুকেও খায়। আমাদের এই রাজনীতির মত। আমরা চাক বেঁধে মধু সঞ্চয় করে যাচ্ছি, বিরোধী ভাল্লুকেরা এসে সব সাবাড় করে দেবে। মধু খেয়েছ?

ছেলেবেলায় স্যার, সেই জন্মাবার পরেই, ঠোঁটে একবার দেওয়া হয়েছিল!

গাধা কোথাকার! আমি রোজ চার চামচে মধু দিয়ে পাতিলেবুর রস খাই।

ভীষণ দাম।

লিখতে পারবে?

কি লিখতে হবে বলুন?

পশ্চিমবাংলায় মৌমাছির চাষ। জমি কুপিয়ে, মৌমাছির বীজ ছড়িয়ে চাষ নয়, মৌচাক বসিয়ে মাছির চাষ। গাধাদের বিশ্বাস সেই তিন পাতা ধান চাষ লিখে, দাঁত বের করে সামনে এসে দাঁড়াল, এনেছি স্যার।

পারব স্যার। বারুইপুরে মৌমাছির চাষ আমি দেখে এসেছি।

হুঁ। শোনো মৌমাছির সঙ্গে একটু রাজনীতি ঢুকিও বেশ কায়দা করে ঝাড়বে। এখন বাজে বেলা বারোটা। তিনটের মধ্যে চাই। তুমি দুটোর মধ্যে দেবে। তারপর টাইপ হবে। চারটের সময় আমাদের পৌঁছতে হবে। টিভি সেণ্টারে। সংস্কৃত কোটেশান একদম ব্যবহার করবে না। আমার ফল্‌স টিথ, উচ্চারণে ভীষণ অসুবিধে হয়।

মুখে এসে গিয়েছিল, প্লেব্যাক করলে কেমন হয় স্যার! ভাগ্যিস বলে ফেলিনি।

মাত্র দু'ঘণ্টা সময়, তিন পাতা লিখতেই হবে, নয়তো চাকরি চলে

যাবে। কি এখন লিখি? প্রথমেই লিখি, মৌমাছি, মৌমাছি, কোথা যাও নাচি, নাচি, দাঁড়াবার সময় তো নাই। পরোপকারী মৌমাছি, হুল ফোটালেও গাছে গাছে মানুষের জন্য অমৃতকোষ ঝুলিয়ে রাখে। মৌমাছি আর আদর্শ রাজনৈতিক দল-নেতার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নেই। দু'পক্ষই যা করেন, সবই মানব হিতার্থে। হিতার্থে শব্দটা চলবে না। দাঁতে দাঁত ঠুকে যাচ্ছে। ফলস টিথে অসুবিধে হতে পারে। মানব কল্যাণে। না চলবে না। য ফলা আছে। মানুষের উপকারে লিখি। সহজ সরল, যুক্তাক্ষর বর্জিত।

মৌমাছি একশো মাইল রেডিয়ামে, ও বাবা রেডিয়াম আবার ইংরেজি শব্দ, একশো মাইলের পরিধিতে ওড়াওড়ি করে, ফুলে ফুলে, ফুলিফুলি মধু সংগ্রহ করে এনে, মোমচাকের কন্দরে কন্দরে মধুভাণ্ডে মধু সঞ্চয় করে। ফ্লো এসে গেছে।

এই মধুই হল, সেই অমৃত, যে অমৃত উঠেছিল সমুদ্রমন্থনে, সেই অমৃত, যে অমৃত অসুররা ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিল, দেবতারা কৌশলে কেড়ে নিয়েছিলেন। বন্ধুগণ, পশ্চিমবাংলার অমৃতভাণ্ডে, আমাদের শ্রমে, নিষ্ঠায়, দেশহিতব্রতে উন্নয়নের যে মধু সঞ্চিত হয়েছে একদল উন্মত্ত, লোমশ ভাল্লুক, মাতোয়ালা হয়ে রাতের অন্ধকারে তা খেয়ে চলে যাবে, এ কি আপনারা সহ্য করবেন? অসুরকুলের এই ঘৃণ্য প্রয়াস আমাদের রুখতেই হবে। রুকবোই, রুকব!

মধুর মত মধুর বস্তু আর কি আছে! উপনিষদ বলছেন, ওঁ মধুবাতা ঋতায়তে, মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ মাধ্বীনঃ সন্তোষধীঃ মধুনক্তমুতোষসো ইত্যাদি। মধুর একেবারে ছড়াছড়ি। দ্রব্যগুণে মধুর কোনও তুলনা হয় না, গ্লুকোজ, সুক্রোজ, ল্যাকটোজ, ফ্রাকটোজ, ক্যালোরিতে, ঠাসা, এক এক ফোঁটা, এক একটি অ্যাটম বোমা। অ্যালকোহল রক্তে মিশতে ছ ঘণ্টা সময় নেয়, মধু জিভে পড়ামাত্রই রক্তে মিশে যায়। মধু দিয়ে মকরধ্বজ মেড়ে খেলে মানুষ শতায়ু হয়।

বন্ধুগণ, আপনারা ঘরে ঘরে বাক্স চাক বসিয়ে মৌমাছি পালন

করুন। মধুর উৎপাদন বাড়ান। মধু মানে স্বাস্থ্য, মধু মানে যৌবন, যৌবন মানে জীবন, জীবন মানে জাতি। কর্মে, ধর্মে মর্মে বাঙালী জেগে ওঠ। আমরা বড় পেছিয়ে পড়েছি। ইন কিলাব জিন্দাবাদ।

আঃ, টেরিফিক লিখে ফেলেছি। বাচ্চে লোক এক দফে তালি বাজাও।

দুটো বেজে দশ মিনিটে বক্তৃতা মন্ত্রীর হাতস্থ হয়ে গেল। নিজেই নিজেকে বললুম, কামাল কর দিয়া গুরু।

মন্ত্রী মহোদয়ের খুব পছন্দ হয়েছে মনে হল। সংস্কৃত শ্লোকটির ব্যাপারে সামান্য একটু আপত্তি তুললেন। ওটাকে বাদ দিলে কেমন হয়।

শ্লোকটার লাইনে লাইনে স্যার মধু। এ সুযোগ আর পাওয়া যাবে না। কবে আবার মধু হবে।

থাক তা হলে। গাড়িতে যেতে যেতে তুমি আমাকে বার কয়েক তালিম দিয়ে দিও। তিনটে পাঁচে আমাদের মহাযাত্রা শুরু হল। সামনে দুজন বডি গার্ড। পেছনে আমরা তিনজন। একজন হলেন মন্ত্রী মহোদয়ের পি এ।

যেতে যেতে শ্লোকের তালিম চলেছে। বলুন স্যার, ওম্। উঁহু ওঁ নয় অউম্।

খুব ক্ষেপে গেলেন, লিখেছ ওঁ, বলতে বলছ অউম্।

আজ্ঞে খাস সংস্কৃত ওঁ এর উচ্চারণ অউম্, যেমন বাডজেটের উচ্চারণ হল বাজেট। বলুন স্যার, মধুবাতা ঋতায়তে। মধুক্ষরন্তি সিন্ধবঃ, হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক হচ্ছে। ক্ষরন্তি নয়, উচ্চারণ হবে, হখসরন্তি।

বেশ জুতসই একটা গালাগাল দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। হঠাৎ বাধা পড়ে গেল। আমাদের ওভারটেক করে পাশ দিয়ে সাঁ করে আর একটা গাড়ি বেরিয়ে গেল। মন্ত্রী মহোদয় চমকে উঠে বললেন কে গেল, মনে হচ্ছে আর এক জন মন্ত্রী গেলেন।

পি এ কিছুই দেখেননি। ভিক্টোরিয়ার মাঠে জোড়া শালিক

দেখছিলেন। বোকার মত বললেন, না, স্যার।

তুমি থামো, গবেট কোথাকার, আমি গাড়িতে ফ্ল্যাগ উড়তে দেখেছি।

সামনের বডিগার্ডের মধ্যে একজন বললেন, হ্যাঁ স্যার মন্ত্রী গেলেন

আমি দেখেছি। জঙ্গল আমাকে ওভারটেক করে চলে গেল।

জঙ্গল মানে ফরেস্ট ডিপার্টমেণ্ট। অরণ্য দপ্তরের মন্ত্রী। রাগে রাগে আমাদের মন্ত্রী মহোদয়ের মুখ জবাফুলের মত লাল. হোয়্যার ইজ মাই ফ্ল্যাগ রাসকেল। মাই ফ্ল্যাগ।

আমি তোমার চাকরি চিবিয়ে খাবো গাধা। হোয়ার ইজ মাই ফ্ল্যাগ।

কাকে এইসব মধুর সম্ভাষণ হচ্ছে? গাড়িব সামনে ফ্ল্যাগ পতপতিয়ে দেবার দায়িত্ব কার! মন্ত্রী মহোদয় পেছন থেকে ড্রাইভারের ব্রহ্মতালুতে ঠাঁই করে একটা চাঁটা মেরে বললেন, কি, কথা কানে যাচ্ছে না।

গাড়ি হুড় হুড় করে রাস্তার বাঁ দিকে গিয়ে থেমে পড়ল। ড্রাইভার দরজা খুলে রাস্তায় নেমে পড়ল। বুড়ো হাবড়া, রাত কানা নয়, ফাইন ইয়ংম্যান। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল। বেশ ডাঁটে দরজা বন্ধ করে. হন হন করে হেঁটে চলল ময়দানের দিকে।

আমরা সকলেই হাঁ হয়ে গেছি। ব্রহ্মতালুতে চাঁটা খেলে, রাতে বিছানায় ছোট বাইরে করে ফেলার কথা আমরা ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি। এ তো দেখছি সঙ্গে সঙ্গে কুইক অ্যাকসান।

মন্ত্রী বললেন, যাচ্ছে কোথায়, রাসকেল যাচ্ছে কোথায়?

একজন বডিগার্ড সামনের দিক থেকে নেমে পেছন পেছন দৌড়ল আমরা কথা শুনতে পাচ্ছি না, দূর থেকে মূকাভিনয় দেখছি। দু'জনেরই হাত পা খুব নড়ছে। বডিগার্ড ভদ্রলোক ঘাড় ধরে ড্রাইভার ছেলেটিকে আমাদের দিকে টেনে আনছেন।

মন্ত্রী মহোদয় রাগে পাঞ্জাবি খামচাচ্ছেন। বুকের কাছটা গিলে হয়ে গেল। লোকে মন্ত্র জপ করে। মন্ত্রী মহোদয় ক্রমান্বয়ে বলে

চলেছেন, শুয়োরের বাচ্চা, শুয়োরের বাচ্চা। গাড়ির কাছাকাছি আসতেই, মন্ত্রী বললেন, ওর কানটা একবার খালি আমার হাতে ধরিয়ে দাও। তারপর যা করার আমিই করছি।

ছেলেটার কি প্রাণের মায়া নেই? বেপরোয়ার মত বললে, যান, যান সব করবেন॥

আমার হাঁটুতে বিশাল এক চড় মেরে, মন্ত্রী স্প্রিংয়ের মত নাচতে লাগলেন, জুতো, জুতো পেটা করব, জুতো পেটা করব।

ড্রাইভার বললে, বাংলা বন্ধ করে দোব।

মন্ত্রী বললেন, ষড়যন্ত্র, ষড়যন্ত্র, কনসপিরেসি, কনসপিরেসি। এ ব্যাটাকে বিরোধীরা ফুসলে নিয়েছে। হ্যাণ্ড হিম, কিল হিম, শুট হিম।

মটোর সাইকেলে একজন সার্জেণ্ট যাচ্ছিলেন। এ রাস্তায় গাড়ি দাঁড় করাবার নিয়ম নেই। বাইক ঘুরিয়ে তিনি এগিয়ে এলেন। খুব তড়পাবার তালে ছিলেন। মন্ত্রী মহোদয়কে দেখে সটাস করে একটা স্যালুট ঠুকলেন।

কি হয়েছে স্যার!

রাগে মন্ত্রী মহোদয়ের মুখ দিয়ে কথা সরছে না। জোরে জোরে নিঃশ্বাস নেবার ফাঁকে কোনও রকমে বললেন, ওকে মেরে ফেল।

পি এ মাথায় ফাইলের বাতাস শুরু করে দিয়েছেন। প্রেসার কোথায় উঠেছে কে জানে! চারশো, টারশো হবে হয় তো।

সার্জেণ্ট ভদ্রলোক খুব বিপদে পড়ে গেছেন। এমত পথনাটক তিনি জীবনে দেখেছেন কি না সন্দেহ! বেশ ঠাণ্ডা মাথায় ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলেন, কি হয়েছে?

উনি পেছন থেকে আমার মাথায় চাঁটা মেরেছেন, বাপ তুলেছেন, জুতো মারার আগে আমি গাড়ি পার্ক করে নেমে পড়েছি। মন্ত্রী বলে হাতে মাথা কাটবেন নাকি!

মন্ত্রী মহোদয় হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, হি ইজ এ লায়ার।

ড্রাইভার বললে, আপনি এঁদের জিজ্ঞেস করুন, মিথ্যে বলছি কিনা

আমি মনে মনে বললুম, আমি অন্তত সাক্ষ্য দোব না, যে দেয়। দিক। চাকরিটা যাক আর কি। জলে বাস ক'রে, কুমিরের সঙ্গে শত্রুতা। আমি বলে প্রমোশানের ধান্দায় তেলিয়ে চলেছি। মাসখানেকের মধ্যে ফাইল না নড়লে হয়ে গেল। পরের নির্বাচনে কোন্ মহাপ্রভুরা দু'হাত তুলে নেচে নেচে আসবেন কে জানে!

সার্জেন্ট জিজ্ঞেস করলেন, কি করেছিলে তুমি?

কিছুই করিনি!

মন্ত্রী মহোদয় হাওয়া বেরতে থাকা বেলুনের মত ছটফট করতে করতে বললেন, রাসকেল পি এ, তুমি কিছু বলছ না কেন? বোবা হয়ে গেছ! বোবা।

পি এ বললেন, ও গাড়িতে ফ্ল্যাগ লাগাতে ভুলে গেছে।

ড্রাইভার বললে, আমি ফ্ল্যাগ পাব কোথা থেকে? তিনদিন আগে দুর্গাপুর থেকে আসার পথে, বর্ধমানে, জনতা গাড়ি থামিয়ে ওঁকে জুতোর মালা পরাতে গিয়েছিল। সেই সময় একশো মাইল স্পিডে গাড়ি চালিয়ে আমি ওঁকে বাঁচাই। সেই গণ্ডগোলের সময় পাবলিক ফ্ল্যাগটা খুলে নিয়েছিল। আমাকে না দিলে ফ্ল্যাগ আমি পাব কোথা থেকে স্যার! আপনিই বলুন।

মন্ত্রী মহোদয় জ্বলন্ত অঙ্গারের দৃষ্টিতে পি এ-র দিকে তাকালেন। ওই দৃষ্টিতেই কাজ হল। পি এ আমতা আমতা করে বললেন, স্যার আমি বলেছি, ডিপার্টমেন্ট দিতে দেরি করছে।

তুমি আমাকে বলনি কেন?

বললে কিছু হত না স্যার। ওটা অন্য দলের হাতে।

কন্‌সপিরেসি, কন্‌সপিরেসি, বলে মন্ত্রী দেহের হাল গাড়ির আসনে ছেড়ে দিলেন।

সার্জেন্ট ড্রাইভারকে নরম গলায় বললেন, যাও গোলমাল কোর না, যেখানে যাচ্ছিলে সেখানে চলে যাও। তোমার চাকরির মায়া নেই!

না স্যার, আমি তো কেরানী নই, ড্রাইভার, আমাদের লাইনে

চাকরির অভাব নেই।

এভাবে গাড়ি ফেলে পালালে তোমার জেল হয়ে যাবে যে।

ড্রাইভার গাড়ির আসনে এসে বসতেই মন্ত্রী মহোদয় বললেন, অকৃতজ্ঞ বেইমান।

ড্রাইভারের সাহসও কম নয়, সে বললে, আপনিও।

হোয়াট!

হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনিও।

জানো, তোমাকে আমি নিজে হাতে তুলে এনে স্টিয়ারিং-এ বসিয়েছি!

সে, আমার হাত ভাল বলে। একশো কুড়ি, তিরিশ, চল্লিশ মাইল স্পিডে কে আপনার গাড়ি চালাবে! ক'জন ড্রাইভার কলকাতায় আছে! আমি মিনি চালালে, এর চেয়ে বেশি রোজগার করব। দিন নেই রাত নেই আপনার হোল ফ্যামিলির খিদমত খাটছি, মাইনে পাঁচশো, উপরি জুতো-ঝ্যাটা-লাঠি।

খুব লম্বা-চওড়া বাত হয়েছে তোমার দাঁড়াও, ফিরে আসি।

ফিরে আর আসতে হচ্ছে না, এবারে পাবলিকেই খতম করে দেবে। মেয়েমানুষের যৌবন, আর নেতাদের গদি এক জিনিস।

আমি সে ফেরার কথা বলছি না গাধা। আজ ফিবে আসি, তারপর তোমাকে দেখাব কত ধানে কত চাল।

ভয় দেখালে ভিড়িয়ে দোব স্যার। স্টিয়ারিং আমার হাতে।

মন্ত্রী গুম মেরে গেলেন। আমি বললুম বলুন স্যার, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ, মার্ধ্বিনঃ, সন্তোষধীঃ। মন্ত্রী মহোদয় দাঁত খিঁচিয়ে বললেন, ধ্যাততেরিকা মধু। রাখ তোমার মধু।

ওভারটেক করা মন্ত্রী আগেই এসে পড়েছেন। সাদা অ্যাম্বাসাডার এক পাশে বিশ্রাম করছে। যে পতাকা নিয়ে এত গোলমাল, সেই পতাকা গাড়ির ঠোঁটে নেতিয়ে পড়ে আছে। আমাদের মন্ত্রী মহোদয়ের পরাজয় মানে, আমাদের পরাজয়।

মাথা নিচু করে হাঁটছি।

কানের কাছে মন্ত্রী ফাটলেন। বোমা ফাটার মতই ব্যাপার।

দাঁত খিঁচিয়ে বললেন এ কোথায় নিয়ে এলে, এটা তো টয়লেট।

মাথা নিচু করে হাঁটার পরিণাম। নেতাকেই সবাই অনুসরণ করে, নেতা যে এতক্ষণ আমাকেই অনুসরণ করছিলেন, জানব কি করে! ইতিমধ্যে কর্মকর্তাদের একজনের টনক নড়েছে। তিনি ছুটতে ছুটতে এলেন, এদিকে স্যার, এদিকে।

গোটা তিনেক দরজা ঠেলে, আমরা শীতপ্রধান এলাকায় রাগপ্রধান মানুষটিকে নিয়ে প্রবেশ করলুম। রাস্তায় দেখেছি, ঠ্যালা চেপে প্যাকিং বাকস চলেছে, গায়ে লেবেল সাঁটা। তীর চিহ্ন, দিস সাইড আপ, সতর্ক বাণী, গ্লাস হ্যাণ্ডল উইথ কেয়ার। আমরা অনুরূপ একটি গোলমাল মানুষকে যে ঘরে এনে ফেলেছি, সেটি হল মেকআপ রুম।

বিজেতা মন্ত্রী মহোদয় আয়নার সামনে বসে পড়েছেন। জনৈক মেকআপ ম্যান তাঁর মুখমণ্ডল নিয়ে বড় ব্যস্ত। ঘষা-মাজা চলছে। পোড়া হাঁড়ি মাজার কায়দায়। নানা রকম মলম মালিশ করা হচ্ছে। মাঝে মাঝে পাউডারের প্রলেপ পড়ছে। গায়ে একটা ছাপকা ছাপকা গাঢ় রঙের পাঞ্জাবি। আমাদের পাড়ায় একজন দাদের মলম ট্রেনে ট্রেনে বিক্রি করতে বেরোবার সময় এই রকম আলখাল্লা ধরনের জামা পরেন। মানুষের দৃষ্টি সহজে আকর্ষণ করার জন্যে দাদের মলম, আর রাজনীতি প্রায় একই বস্তু। দুটোই চুলকুনির ওষুধ! সারুক না সারুক, লাগিয়ে যাও।

বিজিত মন্ত্রী মহোদয় মুখটাকে তোলো হাঁড়ির মত করে আর একটা চেয়ারে বসলেন। বেশ বোঝাই গেল দু'জনে বিশেষ সদ্ভাব নেই। উনি বোধহয় রাজনীতির সুতো টানাটানিতে ইদানীং শক্তিশালী হয়ে উঠেছেন। ডানপাশে এলিয়ে পড়ে একটু তাচ্ছিল্যের সুরে বললেন, দেরি করে ফেলছেন দাদা, গাড়ি ব্রেকডাউন হয়েছিল বুঝি।

আমাদের মন্ত্রীও কোনও জবাব দিলেন না। আয়নায় নিজের মুখের

দিকে রাগ রাগ চোখে তাকিয়ে রইলেন। পারলে চড় কষাতেন।

মেকআপ ম্যান বললেন, এই সাদা পাঞ্জাবি চলবে না।

মন্ত্রী দাঁত কিড়মিড় করে বললেন, বাপ চলবে।

মেকআপ ম্যান বললেন, বাপস।

বাঁপাশের মন্ত্রী বললেন, ঠোঁটে একটু লিপস্টিক মাখলে মন্দ হয়না। চিত্রতারকারা মাখেন।

কালার টিভি হলে মাখিয়ে দিতুম স্যার।

আপনাদের এখানে হেয়ার ড্রেসার নেই ?

আজ্ঞে না স্যার। আমাদের এখানে সব কিছু ফেসিয়াল। মুখের ওপরেই যত অত্যাচার।

আমার ঝুলপি দুটো ঠিক সেপে নেই। দাড়ি কামাতে গিয়ে ছোট বড় হয়ে গেছে।

আমাদের মন্ত্রী এদিকে বিদ্রোহ করে বসে আছেন, মুখে কিছু মেরেছ কি তোমাকে আমি মেরে তক্তা করে দোব।

মুখটা বড় তেলতেল করছে স্যার।

পুরুষ মানুষের মুখ তেলতেলেই হয়। ওটা স্বাস্থ্যের লক্ষণ। মেক-আপ নেবে মেয়েমানুষ। বুঝেছ ছোকরা। মেয়েছেলের মুখে যা যা খুশি মাখাও।

অনুষ্ঠান পরিচালক পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন, হাত জোড় করে বললেন, স্যার ক্যামেরার খাতিরে মুখটাকে একটু পরিষ্কার করার প্রয়োজন হয়। তা না হলে আলো জাম্প করবে।

আমি আমার ভোটারদের খাতিরেই কিছু করিনি, তুমি আমাকে ক্যামেরা দেখাচ্ছ।

সবাই করে স্যার। রাজ্যপাল, এমনকি প্রধানমন্ত্রীও হালকা মেক-আপ অ্যালাউ করেন। টিভিতে মুখটাই সব। টিভি-র মুখ রক্ষা করুন স্যার।

সরষের তেল ছাড়া আমি মুখে কিছু মাখি না।

এক দিন স্যার।

পাশের মন্ত্রী বললেন, আমি কি রকম লক্ষ্মী ছেলে দেখুন, সব মেখেছি। মুখের চেহারাই পালটে গেছে। উঃ মুখে যে কত ময়লাই জমে। আমাদের মুখ নয় তো মুখোশ। আজ রিয়েল চেহারাটা জনসাধারণ দেখবে।

পরিচালক আমাদের মন্ত্রীকে বললেন, দেরি হয়ে যাচ্ছে স্যার।

মন্ত্রী মহোদয় এবার একটু টসকালেন, ঠিক আছে, সামান্য একটু লাগাও। আমার সিসটেমটা একটু অন্যরকম, নেচারস ন্যাচারাল বিইং। বিয়ের সময় মুখে একটু স্নো মেখেছিলুম, সারা রাত ঘেমে মরি।

এখানে ঘাম হবে না স্যার। স্টুডিওতে শীতে কেঁপে মরতে হয়।

নাও নাও, লাগাও, লাগাও।

মেকআপ ম্যান মন্ত্রীর মুখমণ্ডলে যথেচ্ছাচার শুরু করে দিলেন। সেই গল্পে পড়েছিলুম, রাজা একজনের কাছে মাথা নিচু করেন, তিনি হলেন ক্ষৌরকার। টিস্যু পেপার দিয়ে মুখ ঘষা হচ্ছে। তেল কালিতে কাগজ কালো হয়ে যাচ্ছে। ক্রিম আর পাউডার মাখিয়ে যখন তাঁকে ক্যামেরার উপযুক্ত করে ছেড়ে দেওয়া হল, তখন তিনি নিজের মুখ দেখে আনন্দে আটখানা। এত রূপ ছিল কোথায়। কলকাতার পলিউশনে চাপা ছিল।

আয়নায় মুখ দেখছেন আর বলছেন, রোজ একটু করে মাখলে বেশ হয়। আহা, এ-মুখ বউকে যদি একবার দেখাতে পারতুম।

মেকআপের ভদ্রলোক বললেন, এই তো তৈরি করে দিলুম। সাবধানে নিয়ে যান। কাল সকাল পর্যন্ত ঠিক থাকবে।

অনুষ্ঠান পরিচালক বললেন, পাঞ্জাবিটা স্যার পালটালে বেশ হত। একটা গেরুয়া পাঞ্জাবি দিচ্ছি, দয়া করে পরুন।

আপনার ওই অনুরোধ আমি রাখতে পারছি না, ভেরি ভেরি সরি। আমি বাউল নই, মন্ত্রী।

সাদায় স্যার ভূতের মত দেখাবে।

শাট আপ।

আচ্ছা, আচ্ছা, অ্যাজ ইউ লাইক।

সদলে দুই মন্ত্রী স্টুডিওতে চলে গেলেন। আমরা ফেউয়ের দল। বাইরের অফিসঘরে বসে রইলুম। সামনে একটা মনিটার। পর্দায় ভেতরের খেলা দেখা যাচ্ছে। মন্ত্রী রাপ রাগ মুখে গাট হয়ে বসে আছেন। আমার সেই জ্ঞানগর্ভ লেখাটি তাঁর হাত থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে। কাগজ দেখে কেরামতি চলবে না। জীবন্ত আলোচনা। পশ্চিম বাংলার উন্নয়নে সোচ্চার চিন্তা। কোথা থেকে এক মডারেটার ধরে আনা হয়েছে। তিনি খুব কেতামেরে একপাশে কেতার বসে আছেন। কালো কার বাঁধা একটি করে স্পিকার বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধার মত করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। জামার তলায়, বক্ষসংলগ্ন হয়ে আছে।

ফ্লোর ম্যানেজার অনুষ্ঠান পরিচালনার বিভিন্ন সঙ্কেত বুঝিয়ে দিচ্ছেন। কলা দেখালেন, স্টার্ট। চেটো বুদ্ধদেবের ভঙ্গিতে তুললে স্টপ। আঙুল দিয়ে লাট্টু ঘোরালে, আলোচনা গুটিয়ে আনুন। সময় শেষ হয়ে আসছে।

মডারেটার তেড়েফুঁড়ে ভূমিকা করলেন। পশ্চিমবাংলার অর্থনীতি আর লজ্জাবতী বধূর মত মুখ ঢেকে নেই। আধুনিকার অসঙ্কোচ পদক্ষেপে, গ্রাম থেকে, জেলা শহরে, শহর থেকে রাজধানীতে, রাজধানী থেকে বিদেশে এগিয়ে চলেছে। উৎপাদন বেড়েছে, রপ্তানি বেড়েছে, চারিদিকে হই হই পড়ে গেছে।

ভদ্রলোক দ্বিতীয় মন্ত্রীর দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বললেন, কেমন করে আপনারা এই অসাধ্য সাধন করেন, অনুগ্রহ করে বলবেন কি ?

আমাদের মন্ত্রী সরোষে বললেন, ইনসালটিং। আগে আমাকে প্রশ্ন না করলে, আমি ওয়াক আউট করব।

অপর মন্ত্রী ব্যঙ্গের গলায় বললেন, ওয়াক আউট করাটা অপোজিশানদের একচেটে কাজ। নিজের ভূমিকা ভুলে যাবেন না। মনে রাখবেন, বসে আছেন ট্রেজারি বেঞ্চে। আপনার অবশ্য দোষ নেই,

কোয়ালিশানে না এলে, চিরকালই আপনাকে অপোজিশান বেঞ্চে বসতে হত।

ফ্লোর ম্যানেজার প্রোডিউসার দু'জনেই ধেই ধেই করে নাচছেন, স্টপ স্টপ।

আমাদের মন্ত্রী আসন ছেড়ে উঠে পড়েছেন। সদর্পে ওয়াক আউটের জন্যে প্রস্তুত। দ্বিতীয় মন্ত্রী ট্রেজারি বেঞ্চে বসে চিৎকার করছেন—শেম শেম।

অনুষ্ঠান পরিচালক বিব্রত মুখে বললেন, স্যার, এ অ্যাসেমব্লি নয়, টিভি-স্টুডিও।

আমাদের মন্ত্রী বললেন, আমার একটা প্রেসটিজ আছে।

দ্বিতীয় মন্ত্রী বললেন, আমার আছে।

আপনার দপ্তর ছোট, বনবিভাগ, আমার দপ্তর শিল্প।

বন বিভাগ ছোট? হাসালেন দাদা। পশ্চিমবঙ্গের অরণ্যভূমির মাপ জানা আছে মন্ত্রী মহোদয়?

পশ্চিমবাংলার ছোট বড় শিল্পের সংখ্যা কি আপনার জানা আছে।

আরে মশাই, শিল্প বড় না, অরণ্য বড়। কাঁচা মাল না দিলে আপনার শিল্প তো লাটে উঠবে।

পরিচালক বললেন, ছেলেমানুষি হয়ে যাচ্ছে স্যার।

আমাদের মন্ত্রী এক দাবড়ানি দিলেন, চুপ করুন আপনি। আমাদের ব্যাপার, আমাদের ফয়সালা করতে দিন।

তা হলে, আপনাদের এই তরজাটাই রেকর্ড করে নি। জমবে ভাল।

স্টেশান ডিরেকটার ছুটে এলেন। এ সমস্যার কি সমাধান। এ তো নির্বাচনের আগে, আসন ভাগাভাগির চেয়েও জটিল ব্যাপার।

ফ্লোর ম্যানেজার বললেন, কোরাসে উত্তর দিলে কেমন হয়। সমবেত সংগীত যখন হয় সমবেত প্রশ্নোত্তর কেন হবে না?

যেমন ধরুন, প্রশ্ন যদি হয়, পশ্চিমবাংলার এই অভূতপূর্ব

কিভাবে সম্ভব হল ? ওঁরা ছুজনেই একসঙ্গে উত্তর দিলেন, আমাদের সুশাসনে।

আমাদের মন্ত্রী কটমট করে তাকিয়ে বললেন, ইয়ারকি হচ্ছে ? মন্ত্রীর সঙ্গে ইয়ারকি। জান তোমার চাকরি খেয়ে ফেলতে পারি।

পারেন স্যার, তবে বদহজম হবে।

অ্যাঁ কি বললে ?

স্টেশান ডিরেকটার বললেন, আচ্ছা, ফাঁপরে পড়া গেল দেখছি।

দ্বিতীয় মন্ত্রী পা নাচাতে নাচাতে বললেন, একটা জিনিস বুঝতে পারছি না, মধু তো আমার অরণ্যসম্পদ।

আমাদের মন্ত্রী বললেন, তোমার বাপের সম্পদ।

অবজেকসান, অবজেকসান, মাননীয় স্পিকার, ও, এটা তো আবার অ্যাসেমব্লি নয়।

আমাদের মন্ত্রী নিজেকে সংযত করে বললেন, মধু ছু'রকমের, এক, বনের মধু, সেটা মধুই নয়, তার ওপর আমার কোনও কনট্রোল নেই। ছুই, চাষের মধু, সেটাই হল আসল মধু, গ্রামীণ শিল্পের মধু। ইচ্ছে করলে আমি উৎপাদন বাড়াতে পারি, আমি উৎপাদন কমাতে পারি।

ওঃ রাজা ক্যানিউট রে। দিস ফার অ্যাণ্ড নো ফারদার।

শুনলেন। আপনারা শুনলেন।

ডিরেকটার বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ, হাড়ে হাড়ে টের পেলুম, বাঘ আর গরুকে এক ঘাটে জল খাওয়াবার ক্ষমতা নেই।

ছুই মন্ত্রী কোরাসে বললেন, কে বাঘ, কে গরু।

কোরাস ছেড়ে ইনি বলেন, আমি বাঘ, উনি বলেন আমি বাঘ।

ইনি বলেন ওটা গরু, উনি বলেন ওটা গরু।

ডিরেকটার বললেন, আপনারা ছুজনেই বাঘ, আর একই জঙ্গলে ছুটো বাঘ থাকতে পারে না। প্রোগ্রাম, ক্যানসেলড।

॥ ছয় ।

ঘাড় চুলকে, মুখ কাচুমাচু করে একদিন বলেই ফেললুম, স্যার, আমার একটা প্রমোশান দীর্ঘ দিন দরকচা মেরে রয়েছে, পাকছে না, ফাটছে না, বসছে না। বড় কষ্ট পাচ্ছি।

মন্ত্রী মহোদয় সবে খানাপিনা সেরে এসেছেন। মেজাজে বসন্তের বাতাস বইছে, কোকিল ডাকছে কুহু স্বরে। দাঁতখোঁচাটা ওয়েস্ট পেপার বাসকেটে ফেলে দিয়ে বেশ ভাবুক ভাবুক মুখে বললেন, কোন্ হারামজাদা চেপে রেখেছে?

জানি না স্যার।

অপদার্থ। জেনে, আমাকে জানাও। কমপ্রেস আর তোকমারি একসঙ্গে লাগাতে হবে। তোমার তিন হাজার টাকা মাইনে হওয়া উচিত।

বুকটা কেমন করে উঠল। তিন হাজার মাইনে হলে, রোজ মাছ খাব। চারা নয়, বেশ পাকা পোনা। সকাল বিকেল। সপ্তাহে তিন দিন মুরগী চালাবো। রোজ সকালে হাফবয়েল, পুরু মাখন দিয়ে তুপিস রুটি। রাতের দিকে বাড়িতেই একটু ঢুকু ঢুকু। গালগলায় তিনথাক মাংস নেমে যাবে! আর ইডেনে আগাছার জঙ্গলে বসে যে ইভটিকে গত তিন বছর ধরে বলে আসছি—একটু অপেক্ষা কর, একটু অপেক্ষা কর, সবুরে কাবুলী মেওয়া ফলে, তাকে টেনে তুলে আনব ঘরে। সেই অভাগীর জন্যে কম রোদে পুড়েছি, জলে ভিজেছি। কাকে ব্রহ্মতালুতে বড় বাইরে করে করে, উত্তাপে চাকতি মাপের একটা টাকই তৈরি করে দিলে। সেদিন অন্ধকারে ঝোপের আড়ালে বসে দুজনে হাতে হাত রেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলছি আর তারা গুনছি, এমন সময় কে একজন প্রেম-ঘাতক ঝোপের ওপাশে ছোট বাইরে করতে লাগল। কি তার তেজ? আখের রস, কি বীয়ার খাওয়া মাল। পিঠ ফুঁড়ে যাচ্ছে। ওঠার উপায় নেই। এমনভাবে বসেছিলুম দু'জনে আইনের ভাষায় যাকে

বলে, কমপ্রোমাইজিং পজিশান। কলকাতার মানুষের তো কোনও আক্কেল নেই। হত হাইড পার্ক! এ শহরে হাইডিং হাইডিং চলে সব, কেবল হাইডপার্কটা নেই। সেই প্রথম শীতের ভূতঘাটে গিয়ে ছোটবাইরে স্নাত প্রেম-কান্তিকে গঙ্গাবারি ধৌত করে কাঁপতে কাঁপতে বাড়ি ফিরলাম। বাড়িতে প্রশ্নবাণ, ভিজে এলি কোথা থেকে? প্রেমে আর রণে অনৃত ভাষণ অ্যালাউড। অম্লান বদনে বলতে হল, রিটারনিং ফ্রম বার্নিং ঘাট। এক সহকর্মী হঠাৎ পটল তুললেন। এই তো মানুষের জীবন মা। এই আছে এই নেই। মা অমনি কোথা থেকে একমুঠো নিমপাতা এনে বললেন, চিবিয়ে খা। রাত সাড়ে দশটার সময় বাড়ির দাওয়ায় দাঁড়িয়ে প্রেমানন্দে নিমপাতা চর্বণ। অহো, এই বদান্য মন্ত্রী মহোদয়ের জাঁকে সেই প্রেম এবার কাবাইডপাকা হবে। রাতে বাড়ি ফিরে আর নিমপাতা নয়, স্ত্রীর সেবা। লং লিভ এই গবর্নমেণ্ট।

তা হলে?

বলুন স্যার?

খুশি তো। প্রমোশান হোক না হোক, তোমার ইভ্যালুয়েশন হয়ে গেল। তিন হাজার। তিন হাজারের এক পয়সাও কম নয়।

আজ্ঞে হ্যাঁ। বড় আনন্দ হচ্ছে।

তবে আর কি এই আনন্দেই একটা কাজ করে ফেল।

বলুন স্যার। আপনার জন্যে আমি সব করতে পারি। আই লাভ ইউ। আর একটু হলেই ডার্লিং শব্দটা বেরিয়ে পড়ছিল। কি দুঃসাহস আমার।

মন্ত্রী মহোদয় অবাক হয়ে আমার দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, অবাক করলে ছোকরা। আমাকে তুমি প্রেম নিবেদন করছ। আমাকে সবাই দুর্বাসা বলে। কত কি যে ভস্ম করেছি। আচ্ছা শোনো, একটু গোবরের খবর নাও তো।

গোবর স্যার?

হ্যাঁ স্যার। দুটো জেলা আগে ধর হুগলী আর চব্বিশ পরগনা।

দুটো জেলায় কত গোবর উৎপাদন হয়।

গোবর আবার উৎপাদন হয় নাকি। সে তো গরুতে ঘ্যাস ঘ্যাস করে নাদে।

গর্দভ। সেটাও একটা উৎপাদন। তুমি করবে কি, লেটেস্ট সেনসাস থেকে ক্যাটল পপুলেশানটি বের করবে। করে, একটা স্যাম্পল সারভে করবে।

সে আবার কি জিনিস?

তুমি প্রত্যেক জেলায় টেন পারসেন্ট গরুকে মিট করবে। গরুর মালিককে জিজ্ঞেস করবে, আপনার গরু দিনে কতবার মলত্যাগ করে। এক এক গরুর, এক এক হ্যাবিট। দেখবে মানুষের মতই। আমার যেমন।

আপনার গরু আছে স্যার?

তুমি এক গরু। আমি মানে আমি। আমার সকালে একবার রাত্রে একবার। তোমার কবার?

আজ্ঞে, আমার বারবার।

তোমার অ্যামিবায়োসিস, জিয়ার্ডিয়াসিস আছে।

ওই স্যার তিন হাজার টাকা হলে রোজ চিকেন ব্রথ খাব, ঠিক হয়ে যাবে। হবে তো স্যার!

ও, সিওর। তা গরুরও ওই রকম। তুমি একটা অ্যাভারেজ করবে। অ্যাভারেজ এল হয়ত ওই জেলার গরু দিনে চারবার করে এইবার তুমি কি করবে?

কি স্যার?

যে কোনও একটা গরু, মোটামুটি স্বাস্থ্যবান গরুর পেছু নেবে অ্যাজ ইফ তুমি একটা ষাঁড়। ফলো করতে করতে, ফলো করতে করতে, যেই সে ঘ্যাস করে করল, অমনি তুমি স্যাম্পলটা কালেক্ট করে নিলে।

ঘেন্না করবে স্যার।

অ্যাঃ ঘেন্না করবে। ওরে আমার ঘুঁটেকুড়ুনির ব্যাটা।

মন্ত্রী মুখ ভেঙালেন। তৎক্ষণাৎ রইল তোর চাকরি বলে উঠে আসতে ইচ্ছে করছিল। স্রেফ তিন হাজার টাকার গাজরের লোভে জেনুইন গাধার মত হাসি হাসি মুখে বসে রইলুম।

পশ্চিমবাংলার সব বাঙালী মেয়েই এক সময় ঘুঁটে দিত। ঘুঁটে না দিলে শাশুড়িরা গালে নিমঠোনা মারত।

নিমঠোনা কি জিনিস। জিজ্ঞেস করার সাহস হল না। কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরবে।

আমার মা স্যার ঘুঁটে দিতেন না।

তাঁর মা দিতেন। যত অতীতে পেছবে, দেখবে গরু আর ভড়ভড়ে গোবর। গোবরেই না আমাদের মত পদ্ম ফুটেছে। খোঁজ নিয়ে দেখ, তোমার ঠাকুর্দা মৃত্যুর আগে গোবর খেয়ে প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন। তোমরা কি জমিদার ছিলে?

না স্যার, জমিদাররা কি চাকরি করে!

আমরা ছিলুম। আমার ঠাকুর্দা সঙ্গে গোবরের গুলি নিয়ে ঘুরতেন। এ পকেটে গোবরের গুলি, ও পকেটে আফিমের গুলি। একটা করে পাপ কাজ করতেন, আর সঙ্গে সঙ্গে একগুলি গোবর, একগুলি আফিম মুখে পোস্ট করতেন। এখন তিনি স্বর্গে ডেলিভারি হয়ে গেছেন!

তোমার মাথায় কি আছে?

আজ্ঞে বুদ্ধি।

তুমি বুঝি তাই মনে কর? গোবর আছে, গোবর।

না, আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ। (না বললেই তিন হাজারের স্বপ্ন ফুস)।

আচ্ছা, গোবরটা তুমি কালেক্ট করলে। করলে তো?

আজ্ঞে হ্যাঁ।

এইবার ওজন কর। ধরো দু' কেজি হল। তা হলে কি হল, টাটাল গরু ইনটু টু ইজ ইকোয়াল টু টোটাল অ্যাভেলেবিলিটি অফ কাউডাং ইন দি ডিসট্রিক্ট। ক্লিয়ার?

আজ্ঞে হ্যাঁ, ক্লিয়ার।

তা হলে, বেরিয়ে পড়।

আজই স্যার ?

না, কাল থেকে তোমাকে সাত দিন সময় দেওয়া হল।

গোবর কি হবে স্যার ? ঘুঁটে ইনডাস্ট্রি !

তোমার মাথা ! গোবর গ্যাস তৈরি হবে। সেই গ্যাসে গ্রামের ঘরে ঘরে আলো জ্বলবে, রান্না হবে। মাঠে সার হয়ে ফিরে যাবার আগে, টন টন গোবরের কাছ থেকে আমরা গ্যাসটুকু আদায় করে নোব। একে বলে প্ল্যানিং। পশ্চিমবাংলাকে দেখিয়ে দোব, আমরা কি করতে পারি, আর কি পারি না। এক মাসের মধ্যে আনুষ্ঠানিক-ভাবে অন্তত ছটা গোবর গ্যাস প্ল্যান্ট আমি বসাবোই। সেণ্টার প্রচুর টাকা স্যাংসান করেছে। সে টাকা ফিরে না যায়। দেশের মানুষ কাজ চায়, কাজ। শুধু গলাবাজিতে কিছু হয় না।

মন্ত্রী মহোদয় ফোন তুলে বললেন, কানাইকে দাও।

ফোন নামিয়ে রেখে বললেন, হিসেবে কোনও কারচুপি কোর না, তাহলেই প্ল্যান ভেস্তে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে তুমিও যাবে। এ ব্যাপারে তোমাকে ডি এমরা সাহায্য করবেন।

ফোন বেজে উঠল।

কে কানাই ? আমার ছকটা দেখলে ! দেখেছো ? কি বললে মঙ্গল। হ্যাঁ হ্যাঁ মঙ্গল অমঙ্গল করবে ? রাসকেল। না না, তুমি রাসকেল নও, দ্যাট ব্লাডি মঙ্গল। তা ও ব্যাটাকে একটু ঠাণ্ডা কর। গাড়ি চাপা বন্ধ করব ? এবার তুমি রাসকেল। ইলেকসান এসে গেল। এখন তো ঘুরতেই হবে। লাল ? হ্যাঁ হ্যাঁ লাল। না, একটা লাল কলম ছাড়া আর কিছু নেই। ইডিয়েট ! লাল ল্যাঙোট পরতে যাব কোন দুঃখে ! আমি কি কুস্তিগির। না, তোমার বউদির ঠোঁটে লাল নেই। ঘরে ? দাঁড়াও দেখি। হ্যাঁ হ্যাঁ চেয়ারের গদি লাল বটে। হ্যাঁ হ্যাঁ এখুনি ছিঁড়ে ফর্দাফাঁই করে দিচ্ছি। জানি না কোন

রাসকেলের কাজ, সে ব্যাটার চাকরি খাব। কি বললে, খাওয়া দাওয়া কম করব! ইডিয়েট! আমি চাকরি খাবার কথা বলছি। চাকরি গেলে গলায় কাঁটা ফুটবে কেন? এ কি চারা পোনা ভেবেছ? না না, ইলেকসান পর্যন্ত বোনলেস ভেটকি আর চিকেনেই চালিয়ে নোব। ফিরে আসছি তো? আসছি। তোমার মুখে ফুলচন্দন। কি বললে, মারা না গেলে মৃত্যুর কথা আসছে কেন? আজই থরো চেক আপ, অ্যাকসিডেন্ট! মরেছে। গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবি, ও গাড়ি! গেরুয়া রঙের গাড়ি পাব কোথায়? পলা? হ্যাঁ হ্যাঁ পলা তো আমার আঙুলেই আছে। কত বড়? একটা বড় সাইজের সুপুরির মত? ও, রাস্তায় বেরোবার সময় প্রথমে ডান পা ফেলা? তাই ফেলবো। যদি মনে থাকে।

মন্ত্রী মহোদয় ফোন নামিয়ে রাখলেন।

তাহলে স্যার সাতদিন আপনার কাজে আমাকে যাতে ছাড়া হয় অফিসকে একটু বলে দেবেন।

কিইই?

মন্ত্রীর বিস্ফোরণ।

আমার কাজে অফিসের অনুমতি? আমি বড় না অফিস বড়?

আজ্ঞে আপনি।

যদি প্রশ্ন করতেন, আমি বড় না ঈশ্বর বড়? আমি বলতুম আপনি। সামান্য তেলে যদি তিন হাজারের মাচায় একবার উঠতে পারি, আমাকে আর পায় কে? সেই সিগারেটের বিজ্ঞাপন—মিনিস্টার মে কাম, মিনিস্টার মে গো, আমলাজ উইল গো ফর এভার।

মন্ত্রী বললেন, তুমি যাবে, যদি কেউ কিছু বলে কান ধরে আমার কাছে টেনে আনবে। যাও। আভি নিকালো।

দুর্গা, শ্রীহরি বলে বাঘের সামনে থেকে সরে পড়া গেল। বেশি কচলালে লেবু তেতো হয়ে যায়। বেশি তেলে হড়হড়ে। হড়কে বেরিয়ে যাবে। সাপ নিয়ে খেলা। ওঝার মৃত্যু সাপের হাতে। এই গোবরেই

না গোঁজিয়ে যাই। প্রকৃতই যদি ষাঁড় হতে পারতুম, তা হলে গরুর খবর আমার চেয়ে, কে আর ভাল জানত? আহা মানব সন্তান না হয়ে যদি কোন গোমাতার গর্ভে একটি এঁড়ে হয়ে জন্মাতুম!

সাত

হুগলী এক বিশাল জেলা। গরু-সমীক্ষায় এর কোন অংশে ল্যাণ্ড করব ভেবেই পেলুম না। মাথায় ধরব, না পায়ে ধরব, না হাতে ধরব! এত বড় একটা কাজ! ধান নয়, গম নয়, গোবরের প্রাপকতা?

বিমল বলেছিল, গরু না হলে কেউ গোবরের কথা এত ভাবে! পাড়ার একটা গরু ধর। পেটে গোটাকতক ঘুসি মার। মাল অটোমেটিক পড়বে। তাকিয়ে দেখ। চোখের দেখায় ওজন পেয়ে যাবি।

গোবর সম্পর্কে আমার কোনও ধারণাই নেই রে। হিসেবে সামান্য ভুল হলেই আমার বারোটা বেজে যাবে।

তা হলে মর।

মরতে হলে ডি এম-এর কাছেই মরা ভাল। সকাল এগারোটার সময়ে ডি এম-এর দপ্তরে হাজির। মানুষটি ভাল। ভেবেছিলুম খ্যাঁক করে উঠবেন। না, বেশ হেসে হেসেই বললেন, ভদ্রলোকের ছেলে, এ কি গেরো বলুন তো।

আজ্ঞে হ্যাঁ, তা যা বলেছেন। গোবর যে এত মূল্যবান কে জানত আপনি আমাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারেন?

কোনও ভাবেই নয়। সামনে নির্বাচন, আমাদের দম ফেলার ফুরসত নেই। যা পারেন, নিজে করুন। উইশ ইউ গুড লাক।

কিভাবে কি করা যায়! মন্ত্রী বলেছেন টেন পারসেণ্ট গরুর গোবর চেক করে একটা অ্যাভারেজ বের করতে হবে।

আপনি যেমন, আপনার মন্ত্রীও তেমন। হতেছে পাগলের মেলা খ্যাপাতে খেপিতে মিলে। আমরা মরছি আমাদের জ্বালায়। রোজ তিন চারটে করে পলিটিক্যাল লাঠালাঠি হচ্ছে। মাঠে-ঘাটে মানুষের লাশ গড়াচ্ছে, সেই সময় আপনি এলেন গোবরগণেশ হয়ে। সাত-সকালে আর জ্বালাবেন না তো!

কানে আঙুল দিয়ে বসেছিলুম। পতি নিন্দা শোনাও পাপ। আহা, ওই হল আর কি। তুমি হো পিতা, তুমি হো মাতা, সখা তুমি হো, কি যেন একটা গান আছে, এই রকম। জেলা অফিস ছেড়ে বেরিয়ে পড়লুম। একেবারে পণ্ডশ্রম হল তা বলব না। এইটুকু বোঝা গেল, গণ্ডায় আণ্ডা মেলালে জেলা অফিস ক্যাঁক করে চেপে ধরবে না।

দোকানে চা খেতে খেতে মাথায় একটা মগজের ঢেউ খেলে গেল। শ্রীরামপুরের কাছে আমার এক বন্ধু আছে। জমিদারের ছেলে। সেই সুসিতের কাছে গেলে সমস্যার হয়ত সমাধান হবে। ওদের গোটা কতক গরু আছে! সুসিত কি এই সময়ে বাড়িতে থাকবে! দেখা যাক চেষ্টা করে।

সুসিত বাড়িতেই ছিল। সবে চান সেরেছে। খেতে বসবে আর কি! একটা পাঁচের ট্রেন ধরে কলকাতায় আসবে। ব্যবসা করে। স্বাধীন মানুষ। আমাদের মত গোলাম নয়।

সুসিত বললে, আমাদের তিনটে গরু আছে তবে তারা তো সব জার্সি।

সে আবার কি? জার্সি তো ফুটবল খেলোয়াড়রা পরে।

আরে, না রে বাবা, জার্সি হল বিলিতি গরু। এক একবারে পনের কেজি দুধ নামায়।

তা নামাক। প্রাতঃকৃত্য করে তো।

তা করে। তবে কোয়ান্টিটি দিশি গরুর মত হবে না। সায়েব গরু তো, সায়েবের মত সিসটেম। একটু কম করে।

তুই ভাই আমাকে বাঁচা। একটু করতে বল, ওজনটা দেখতে হবে। তারপর একটু এদিক সেদিক করে নিলেই বিলিতি গোবর দিশি গোবর হয়ে যাবে।

তা হলে অপেক্ষা কর, করলেই আমি খবর পাঠাতে বলছি।

তোর দাঁড়িপাল্লা আছে?

সে ব্যবস্থা হবে'খন।

সুসিতের কলকাতায় যা'বার বারোটা বেজে গেল। দু'জনে ভরপেট খেয়ে বৈঠকখানায় বসে আছি। কখন গরু দয়া করে একটু করবে। বেলা প্রায় তিনটে বাজল। বিকেলের চা এসে গেল।

কি রে সুসিত, তোর গরুর কি হল?

দাঁড়া দেখে আসি।

সুসিত ফিরে এসে বললে, গরুর বোধহয় কনসটিপেশান হয়েছে মাইরি।

সে কি রে!

খাচ্ছে কিন্তু ছাড়ছে না!

তা হলে দুধে কনসটিপেশান বল?

না তা নয়, দুধ তো গ্ল্যাণ্ডের ব্যাপার।

তা হলে কি হবে?

তোর তো সাতদিন সময় আছে। আজ বরং সন্ধ্যার দিকে জোলাপ খাইয়ে রাখি। তুই কাল সকালের দিকে আয়।

জোলাপের দাস্তে তো হিসেব মিলবে না রে?

আরে বিলিতি, জোলাপ খেয়ে যা করবে, দিশি তা এমনি করবে।

হঠাৎ ভেতর বাড়িতে উল্লাসের ধ্বনি শোনা গেল, করেছে করেছে। শিশু-কণ্ঠের চিৎকার, মেজকা, গরু পায়খানা করেছে, শিগগির এসো, শিগগির এসো।

আমরা দু'জনে শেষ চুমুকের চা ফেলে দৌড়লুম। সুসিতের গোয়ালে ফন্ ফন্ করে পাখা ঘুরছে। তিনটে অদ্ভুত চেহারার জন্তু

বাঁধা রয়েছে।

সুসিত, এরা কি সত্যিই গরু?

আজ্ঞে হ্যাঁ, সায়েব গরু। দেখছিস না, গোয়ালে পাখা ফিট করেছি।

তিনটে গরুর মেমসায়েবের মত নাম, শেলি, রুবি, লিলি। শেলি নেদেছে। একপাশে পোয়াটাক মাল পড়ে আছে।

সুসিতের মা বললেন এ গরুর বাবা একটাই দোষ, একেবারে বিলিতি স্বভাব। দুধ বেশি, গোবর কম। তেমন ঘুঁটে হয় না।

তা মাসিমা, দিশি গরু এক একবারে কতটা করে দেয়?

কি, দুধ?

আজ্ঞে না, গোবর।

তা ধরো তিন চার কেজি তো হবেই।

দিনে কবার?

সে বাবা এক এক গরুর এক এক স্বভাব। আমার এই মেজো ছেলে সুসিত, দিনে সাত-আটবার—সুসিত বললে, আঃ, মা, হচ্ছে গরুর কথা, তুমি আমাকে ধরে টানাটানি করছ কেন?

টানাটানি করব কেন? আমি বলছি, মানুষের মতই কোনও গরু সকাল সন্ধে দু'বার, ঠিক তোর বাবার মত। কোনও গরু তোর মত বারবার।

ল অফ অ্যাভারেজ সাধে শিখেছি। যার কল্যাণে টাটা বিড়লার রোজগার আমাদের ঘাড়ে চেপে পারক্যাপিটা ইনকাম হয়ে যায়। ল অফ অ্যাভারেজে সুসিতের বৈঠকখানায় বসে বেরুল, গরু দিনে দুবার করে, এক একেবারে তিন কেজি। এইবার সেনসাস রিপোর্ট দেখে গরুর সংখ্যা বের করে মারো গুণ। যদি হাজার দশেক গরু থাকে, হাজার ইনটু বারো, ইনটু দশ। বাপস, হুগলী তো গোবরে পড়ে আছে রে বাবা!

সুসিতের ওখান থেকে বেরোবার পর বেশ খুশি খুশি লাগল।

একটা ফর্মুলা আয়ত্তে এলে অঙ্ক কষা সহজ হয়ে যায়। পরীক্ষায় ফেল করার ভয় থাকে না। এখন আমি সব জেলার গোবর সেকেণ্ডে বের করে দিতে পারি। গরু গুণিতক বারো সমান সেই জেলার গোবর। আর আমাকে পায় কে! আ-যাও মেরা মন্ত্রী! তিন হাজার আমার হাতের মুঠোয়।

শ্রীরামপুরের বাজারে ফার্স্টক্লাস আম উঠেছে। পেয়ারাফুলির দেশ। পেয়ারাফুলি ছাড়াও, তাজা, ল্যাংড়ার ছড়াছড়ি। তিন হাজার তো হবেই। খোদ মন্ত্রী হামারা হাত কা মুঠ্‌ঠিমে। সারা পশ্চিমবাংলার গোবরের হিসেব আমার বুক পকেটে। আয় শালা, লড়ে যাই।

বেশ তাজা ল্যাংড়া নিয়ে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে গৃহপ্রবেশ। সন্ধে হয়ে গেছে। বাতাসে বসন্ত ছেড়েছে। যদিও এখন বসন্ত নয়, বর্ষা এলো বলে। মেজাজ ভীষণ খুশি খুশি। পুরনো দেয়ালের সব প্ল্যাস্টার ফেলে দোব। নতুন প্ল্যাস্টারে সবুজ ডিসটেম্পার বিজলীর আলোয় মিটি-মিটি হাসবে। নহবতের সুরে রাঙা শাড়ি পরে তিনি আসবেন। তিন হাজার। কিন্তু কোন পোস্টে তিন হাজার মাইনে হবে! খোদ বড়-কর্তারও তো তিন হাজার হয় না। হয় কি? কে জানে বাবা! সে মন্ত্রী বুঝবেন। ছাটস নট মাই হেডেক।

খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেল, রাত প্রায় এগারোটা। গরমের রাত, পাড়া তাই সরগরম। শুয়ে শুয়ে বই পড়ছি। খাবার ঘরে এখনও হল্লা চলেছে। মা আছেন, আমার বোনটা আছে। দেখে এসেছি জানালায় চেন দিয়ে বাঁধা আছে আমাদের মাস তিনেক বয়সের কুকুর, টম। আমার বোন কোথা থেকে নিয়ে এসেছে। অ্যালসেসিয়ান বলে এনেছিল, নেড়িও হতে পারে।

ওপাড়ায় খুব একটা মজা চলেছে। মাঝে মাঝে হাসিতে সব ভেঙে পড়ছে। তিন হাজার এখনও হয়নি। তাইতেই বাড়িতে হাসির ফোয়ারা ছুটছে। হলে কি হবে! সকাল সন্ধে সানাই বাজবে।

হঠাৎ আমার বোন ডাকল, দাদা, দেখবি আয়, দেখবি আয়।

দেখার মতই ব্যাপার!

ব্যাটা কুকুর। জন্মে থেকে শুধু ছাঁটই খেয়ে আসছে। সেই মুখে পড়েছে ল্যাংড়া আমের টুকরো। তিন টুকরো খেয়ে সামনে থাবা গেড়ে বসে কান খাড়া করে জিব চোকাচ্ছে। আমার বোন তারিয়ে তারিয়ে আঁটি চুষছে। চেনে বাঁধা তাই ঝাঁপিয়ে পড়তে পারছে না। ভুক্ ভুক্ করছে আর নেচে নেচে উঠছে। জার্মান সায়েব আমের জন্যে পাগল।

আমার বোন আঁটিটা ছুঁড়ে দিল।

কুকুর আঁটিটা মুখ দিয়ে ধরে আর আঁটি পিছলে চলে যায় নাগালের বাইরে।

দাদা, ঠেলে দে, ঠেলে দে।

একবার দিলুম। আঁটি আবার পিছলে চলে এল।

আবার দিলুম। আবার চলে এল।

আঁটি তো হাড় নয়। পিচ্ছিল জিনিস। কুকুরটার অবস্থা ঠিক আমার প্রমোশানের মত। নাগালে আসে, আবার পিছলে চলে যায়। টম আমার মতই ক্ষেপে উঠেছে।

বার তিনেক হাত দিয়ে ঠেলে ঠেলে দিয়েছি। কুকুরটা ইতিমধ্যেই বদ মেজাজের জন্যে বিখ্যাত। যা করছি দূর থেকে। চতুর্থ বারে, কি ভাবে যেন আমার ডান হাতের চেটোর উলটো পিঠটা তার কামড়ের সীমানায় চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঘ্যাঁক।

ধরেই ছেড়ে দিল। দিলে কি হবে, ওইতেই যা হবার তাই হয়ে গেল। খানিকটা মাংস কুদলে ওপর দিকে ঠেলে উঠল। হাতের ওপর দিয়ে যেন পাওয়ার টিলার চলে গেল। ওদিকে ল্যাংড়ার চকলা, এদিকে হাতের চকলা।

যে কুকুরকে আম খাওয়ানোর জন্যে সবাই ব্যস্ত হচ্ছিল, তাকে এবার জুতো খাওয়াবার জন্যে সবাই তেড়ে উঠল। সে বেচারা বুঝেছে, কাজটা বড় অন্যায় হয়ে গেছে। যে হাত তিন হাজার আনবে সেই হাতে

কামড়। কোণের দিকে ভয়ে বসে আছে।

এদিকে আমার পুরো হাত চড়চড় করে ফুলছে।

মেরে কি হবে। অন্যায় করে ফেলেছে, অবলা জীব। এত রাতে ডাক্তার পাই কোথায়।

একটিমাত্র ডিসপেনসারি খোলা ছিল। তেমন নামডাকঅলা কেউ নয়! ঠেকা দেনেঅলা এল এম এফ। পরে এম বি হয়েছেন। বসে বসে সারাদিনের হিসেব মেলাচ্ছিলেন। কম্পাউণ্ডার ঝাঁপ বন্ধ করার জন্যে ব্যস্ত।

আমি ঢুকে বলেছি সবে, ডাক্তারবাবু, আমাকে কুকুরে—

দুটো হাত ওপর দিকে তুলে ডাক্তার জাম্প করলেন, ওরে বাপরে, আমি কুকুর নই, ও এখানে হবে না, এখানে হবে না, হাসপাতালে যান, হাসপাতালে যান।

ক্যাশ বাক্স ছেড়ে ডাক্তারবাবু এক লাফে রাস্তায় বেরিয়ে গেলেন। এমন আতঙ্কের কি কারণ বোঝা গেল না। কুকুরের কামড় খাওয়া মানুষ কি খ্যাপা কুকুর! জলাতঙ্ক রোগ ছড়াতে এসেছি! কম্পাউণ্ডার বাবুকে, মাস্তানের গলায় বললুম, যা বলছি, তাই করুন। বেশ খানিকটা তুলো বের করুন। ডাক্তারবাবুর চেয়ে সাহসী মানুষ বলেই মনে হল।

নিন, চেপে ধরুন। বেশ করে চাপ দিয়ে ফোলাটাকে থেবড়ে দিন।

বিজ বিজ করে শব্দ হচ্ছে। ব্যাটা টম হাতটাকে বেশ জখম করে দিয়েছে।

নিন এবার কার্বলিক ঢালুন। আরে মশাই যন্ত্রণা আমার হবে আপনি অত কাতর হচ্ছেন কেন? নিন, এবার যে কোনও একটা মলম লাগিয়ে ব্যাণ্ডেজ করে দিন।

কম্পাউণ্ডারবাবু ভয়ে ভয়ে বললেন, কাল থেকেই তলপেটে চোদ্দটা ইনজেকসান নেবার ব্যবস্থা করুন। জলাতঙ্ক হলে আর বাঁচবেন না।

কালকের কথা কালকে, এখন একটু টেটভ্যাক ছাড়ুন। আর গোটাকতক পেনিসিলিন ট্যাবলেট দিন।

সারারাত যন্ত্রণায় ছটফট। কেন মরতে তিন হাজার টাকার আনন্দে ল্যাংড়া কিনে মরেছিলুম।

সকালেই ফ্যামিলি ফিজিসিয়ানের কাছে দৌড়লুম। তিনি আবার আর এক .কাঠি ওপরে যান। টিপেটুপে বললেন, এঃ গ্যাসগ্যাংগ্রীন হয়ে গেছে হে। হাতটা না অ্যামপুট করতে হয়।

সে কি!

তাই তো মনে হচ্ছে।

আমি যে লিখে খাই।

বাঁ হাতে অভ্যাস করতে হবে। অভ্যাসে কি না হয়। অনেকে পা দিয়ে লেখে।

তলপেটে ফুঁড়তে হবে?

বাড়ির কুকুর তো!

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তা হলে প্রয়োজন হবে না।

এরপর যিনিই দেখেন, তিনিই প্রশ্ন করেন, হাতে আবার কি হল?

কুকুর কামড়েছে।

সর্বনাশ! ইনজেকসান নিয়েছ?

দরকার হবে না। বাড়ির কুকুর।

ওই আনন্দেই মর। কে বলেছে তোমাকে, নিতে হবে না।

আমাদের ডাক্তারবাবু।

কিস্সু জানে না। মানুষমারা ডাক্তার। পাস্তুরে চলে যাও।

একজন আবার রাস্তার কলের পাশে জমা জল দেখিয়ে প্রশ্ন করলেন, কি, আতঙ্ক হচ্ছে?

আজ্ঞে না।

আজ না হোক কাল হবে।

হঠাৎ পা মাড়িয়ে দিলেন, উঃ করে উঠলুম।

হঠাৎ পা মাড়ালেন!

না হে পরীক্ষা করে দেখলুম, কেঁউ কেঁউ কর কি না!

ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ডান হাত বুকের কাছে ঝুলছে। গ্যাংগ্রীন শুনেছি, গ্যাসগ্যাংগ্রীন কাকে বলে জানি না। এদিকে গোবরের রিপোর্ট একট. লিখতে হবে। চব্বিশ পরগনার ডি, এমের সঙ্গেও একবার দেখা করবার দরকার। বুড়িটা অন্তত ছুঁয়ে রাখতে হবে।

বাসে একজন জিজ্ঞেস করলেন, হাতে কি হল হে!

কুকুরে কামড়েছে শুনে বেশ যেন আনন্দ পেলেন। আমাকেও কামড়ে ছিল হে! ওয়ান্‌স আপন এ টাইম, আই ওয়াজ এ প্রাইভেট টিউটার—বলে শুরু করলেন। যে বাড়িতে পড়াতেন, সেই বাড়িতে একটা কুকুব ছিল। শুয়ে থাকত টেবিলের তলায়। একদিন চটি পরতে গিয়ে ন্যাজে পা লাগায়, ন্যাজের অপমানে খাঁক করে কামড়ে দিলে। তারপর ভাই পাস্তুরে গিয়ে ইনজেকসান। এই এত বড় সিরিঞ্জ। লাইনে দাঁড়িয়ে খবরের কাগজ পড়ছি। সামনের দিক থেকে এক একজন করে যাচ্ছেন, আর চিৎকার করে উঠছেন—বাবা রে।

বেয়নেট চার্জ শুনেছ?

আজ্ঞে হ্যাঁ যুদ্ধে হয়।

এই ইনজেকসানও দেওয়া হয় ওই কায়দায়। ত্ব'হাতে সিরিঞ্জ বাগিয়ে, দূর থেকে ছুটে এসে তলপেটে ফাঁস। আমার সামনে আর মাত্র তিনজন। ভয়ে গা-হাত-পা কাঁপছে। এক-পা এক-পা করে লাইন থেকে সরছি। ইচ্ছে, পাশে সরে গিয়ে দে ছুট। পেছন থেকে একজন বললেন, ব্যাটা পালাচ্ছে! আর যায় কোথায়! সবাই মিলে জাপটে ধরে পেড়ে ফেললে। ওঁরা সকলেই ছিলেন ন্যাজকাটা শেয়াল। আমার ন্যাজটিও কাটিয়ে ছাড়লে? সে যে কি যন্ত্রণা! তা তুমি কবে নিচ্ছ?

আমি নোব না। কামড়েছে বাড়ির কুকুর।

নেবে না মানে! আমি এজেন্ট, স্টেট ব্যাঙ্ক, গড়িয়াহাট ব্র্যাঞ্চ বলছি, বাড়িরই হোক আর রাস্তারই হোক ইনজেকশান ইজ এ মাস্ট।

কুকুরে চাটলেও আজকাল পাঁচটা নিতে বলে। কাটলে চোদ্দ, চাটলে পাঁচ। এই হল নববিধান।

তিনটে সিট আগের ভদ্রলোক এতক্ষণ কান খাড়া করে শুনছিলেন, বুঝতে পারিনি। তিনি বললেন, ঠিক বলেছেন, আজকাল আদর করে চেটে দিলেও নিতে হয়। আরে মশাই দুধ খেতে খেতে বাচ্চা ছেলে অসাবধানে কামড়ে দিলেও নিতে হয়।

দেখতে দেখতে সারা বাস আলোচনায় উত্তাল হয়ে উঠল। পেট ফোঁড়ার পক্ষে আর বিপক্ষে তুমুল তর্ক-বিতর্ক। ড্রাইভার রাস্তার একপাশে গাড়ি থামিয়ে পেছন ফিরে বললেন,

আরে মশাই, আমাকে একবার শেয়ালে কামড়েছিল। কিস্যু করিনি। এক গুণিন এসে পিঠে থালা বসিয়ে সব বিষ নামিয়ে দিলে।

ব্যাস আলোচনা ঘুরে গল, দৈব আর বিজ্ঞানের দিকে।

চব্বিশ পরগনার জেলাশাসক বুকে ঝোলা হাত নিয়ে আমাকে ঢুকতে দেখেই বললেন, ইলেকসানের আগে আমাকে আর জ্বালাবেন না। এ সব পেটি কেস লোক্যাল থানায় ডায়েরি করিয়ে রাখুন। কোন দলের? রুলিং না অপোজিসান?

অবাক হয়ে বললুম, 'আমি এসেছি মন্ত্রীর গোবরের জন্যে।'

মন্ত্রীর আবার গোবর কি? গোবর তো গরুরই হয়। খাটালে খোঁজ করুন।

আজ্ঞে, মন্ত্রীর গোবর-গ্যাস?

ও, এমনি গ্যাসে হচ্ছে না, এবার পাবলিককে গোবর-গ্যাস দেবেন! কত খেলাই জান প্রভু—সর্প হয়ে দংশ তুমি, ওঝা হয়ে ঝাড়ো। তা ডান হাতটা অমন করে বুকে ঝুলিয়েছিলেন কেন?

কুকুরে কামড়েছে।

যাক, রাজনৈতিক দংশন নয়। যে দংশনে আমরা অষ্টপ্রহর জ্বলছি।

ইনজেকশান নিয়েছেন ?

আজ্ঞে না, বাড়ির কুকুর তো।

বেশ করেছেন। আমার তিনটে কুকুর। কামড়ে কুমড়ে আমার শরীর ফর্দাফাঁই করে দিয়েছে। সর্ব অঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত। যেন বুয়োর যুদ্ধ থেকে ফিরে এলুম।

অমন কুকুর পোষার দরকার কি স্যার ?

এ আপনি কি বলছেন ? এই যে ভোট দিয়ে যাদের ক্ষমতায় পাঠালেন তাঁরা যদি কামড়াতে আসেন, কিছু করার থাকে! যদ্দিন মেয়াদ তদ্দিন কামড়। কুকুরের কামড় সহ্য হয়ে গেছে বলে মানুষের কামড় আর তেমন অসহ্য লাগে না।

সকলে ভয় দেখাচ্ছেন, ইনজেকসান না নিলে জলাতঙ্ক হবে।

হ্যাঁ সব হবে। আমি ডি, এম বলছি, নো ইনজেকসান।

তা হলে গোবর স্যার।

আমাকে গোবর বানালেন ? শুনুন, গোবর আছে, গোবর থাকবে, ওইসব অ্যাকাডেমিক একসারসাইজ ইউজলেস।

আমি চব্বিশ পরগণার একটা ফিগার বের করেছি।

আমাকে দিয়ে যান। লিখে রাখি। মন্ত্রী চাইলে সেইটাই সাপ্লাই করব।

বাক্ কোস্ট ইজ ক্লিয়ার। ডি, এম-কে বাজিয়ে গেলুম। এখন হাত নিয়ে দিনকতক পড়ে থাকি। সাতদিনের মাথায় হাজিরা দিয়ে গোময় পরিসংখ্যান পেশ করব।

সন্ধে থেকেই ঝোড়ো হাওয়া বইতে শুরু করল। টিপটিপ বৃষ্টি। তুমুল ঝড় জল আসছে। বাড়ির সামনে একটা জিপ এসে দাঁড়াল। তিন হাজার এখনও হয়নি, হবে শুনেই ভি আই পি'রা আসতে শুরু করেছেন। তাও কেমন দিনে ঝড়ের রাতে। কার এই অভিসার!

আমাদের অফিসের ড্রাইভার ইসমাইল জিপ থেকে নেমে এল। বগলে একটা ফাইল।

কে পাঠালেন ?

বড় সায়েব।

ইসমাইল, আমি তো ভাই এখন কিছু লিখতে পারব না। আমার হাতের অবস্থা দেখো! তিন মাসের আগে এ হাতে কলম ধরা যাবে কিনা সন্দেহ!

সে আর আমাকে বলে কি হবে স্যার! আপনি বড় সায়েবকে বলুন।

তড়াক করে লাফিয়ে জিপে উঠে, ইসমাইল কালবিলম্ব না করে চলে গেল। থাকলেই আমার কাঁদুনি শুনতে হবে। কুকুরে কামড়াবার পর থেকেই আমার আচার আচরণ কিঞ্চিৎ কুকুর কুকুর হয়ে গেছে। করুণ সুরে কথা বলতে গেলে এক ধরনের কুঁই কুঁই শব্দ হচ্ছে। রেগে গেলে গড়্‌ড়্, গড়্‌ড়্। আমার মনে হয় তার আগে থেকেই হয়েছে। যবে থেকে মন্ত্রী মহোদয়ের সান্নিধ্যে এসেছি।

ফাইলটা খুলতেই একটা নোট বেরিয়ে এল। বড় কর্তার হুমকি :

আগামীকাল সকাল সাতটার মধ্যে খাজারামকে চুটিয়ে গালাগাল দিয়ে একটা বক্তৃতা লিখে মন্ত্রী মহোদয়ের সঙ্গে দেখা করবেন হাস-পাতালের লেম্যানস ওয়ার্ডে। জিপ দুর্ঘটনায় আজ সকালে তিনি আহত হয়েছেন। ঠ্যাং ভেঙে গেছে। জরুরী, জরুরী, জরুরী।

খাজারাম সম্প্রতি দল ভেঙে বেরিয়ে গেছেন। তিনি আর একটি দল করেছেন। আলাদা সিম্বল, আলাদা ম্যানিফেস্টো। নির্বাচনে নামছেন। খুব হম্বিতম্বি করছেন। বড় বড় বোলচাল মারছেন। মন্ত্রীর মত আমারও খুব রাগ। পার্টি কমজোর হয়ে যাচ্ছে অন্তর্দ্বন্দ্বে ধুনোর আঠা দিয়ে সাঁটা মেয়েদের সেলাইয়ের বাকসের মত সব খুলে পড়ে যাচ্ছে। বিরক্ত

গালাগালের তুবড়ি ছোটাতে পারি। বাদ সে

ফুলে ফেঁপে ঢোল। তিন হাজারের খেলা। আঙুল

হয়, আমার হাত ফুলে মনুমেণ্ট। বড় অসহায় অবস্থা। ওদিকে মন্ত্রী পড়লেন ঠ্যাং ভেঙে, এদিকে তাঁর কলমচির হাত খাবলাচ্ছে নেকড়ে বাঘে। খাজারাম গলাধাক্তি করছে। আমাদেব মন্ত্রী মহোদয়কে ফেরাতেই হবে। নইলে, আমাদের আখেরে কাঁচকলা।

মাঝরাতে বৃষ্টি নামল তেড়ে। ঘণ্টা চারেকেই কলকাতা কাত। একেবারে কল্লোলিনী কেলেঙ্কারি। সব হাবুডুবু। বক্তৃতা লেখা হয়নি, তার একটা জেনুইন কারণ আছে। না হাজিরা দিলে চাকরি চলে যাবে।

বাসও চলবে না, ট্রাম তো সামান্য বৃষ্টিতেই ঠ্যাং তুলে বসে থাকবে। হাফপ্যাণ্ট পরে জলে নেমে পড়াই চাকরি বাঁচাবার একমাত্র রাস্তা। জল ভেঙে, রিকশা ঠেঙিয়ে যখন হাসপাতালে পৌঁছলুম তখন সর্বাঙ্গে ঝাঁঝি আর কচুরিপানার কুচি লেগে আছে। বেশ রোহিত মৎস্যের মত খেলে খেলে এসেছি। ওয়ার্ডের বাইরে একটা বেঞ্চিতে মুখার্জি সায়েব বসে আছেন বিরস বদনে। মালকোঁচা মারা ধুতি ভিজে সপসপে।

স্যার আপনি ?

তুমি যদি ফেল কর, মন্ত্রীকে ঠেকাতে হবে তো। তোমার হাতে কি হল।

আজ্ঞে কুকুরে কামড়েছে।

আঃ, তুমি আবার এই দুর্দিনে কুকুর নিয়ে ছেলেখেলা করতে গেলে। ইলেকসানের পর করলে হত না। যাক, লেখা হয়েছে ?

আজ্ঞে, না।

সে কি। সারা রাত তাহলে কি করলে তুমি ?

কি করে লিখব স্যার। হাতটা তো অকেজো হয়ে গেছে। ভিজে করে৺কট থেকে নস্যির ডিবে বের করে এক টিপ নস্যি নিলেন স৺

আ৺ফলে দৃষ্টিতে আমার দিকে এমনভাবে তাকিয়ে রইলেন, বগলে একট৺ত চলেছি।

তোমার মন্ত্রী তুমি সামলাও, আমার কি ?

মন্ত্রী কি স্যার আমার একার ? তিনি সকলের, সারা দেশের।

ঠিক আছে ? ভেতরে যাও বুঝবে ঠ্যালা।

কেবিনের বাইরে পুলিশ পাহারা। কোথায় যাবেন ?

মন্ত্রী ডেকেছেন। আমার নাম বলুন।

ভেতরে মন্ত্রী মহোদয় চিল চিৎকার করছেন। সাংঘাতিক একটা কিছু হয়েছে। ভেতরে যাবার অনুমতি মিলল।

কি সুন্দর দৃশ্য—ট্রামের ট্রলির মত একটা ঠ্যাং ওপর দিকে তুলে মন্ত্রী আমার শয্যাশায়ী। মাথার দিকে গুরুগম্ভীর চেহারার দু'জন ডাক্তার, দু'জন নার্স। পাশের চেয়ারে আমার মুখ চেনা এক বড় কর্তা। যিনি আমাকে একবার বেলা দেড়টার সময় গরম রসগোল্লা খাবার বায়না ধরে দুপুর রোদে সারা ব্র্যাবোর্ন রোড চষিয়ে মেরেছিলেন। এক এক মাড়োয়াবী মিষ্টির দোকানে ঢুকি আর জিজ্ঞেস করি গরম রসগোল্লা হ্যায় ? তারা হাঁ করে মুখের দিকে তাকায় আর বলে, রসগোল্লা হ্যায়, লেকিন গরম কাঁহাসে মিলেগা। রাত বারো বাজে আইয়ে।

তিনি এখন খুব আমড়াগাছি করছেন, আপনি যদি বাঁদিকে একটা ডাইভ মারতেন স্যার ?

ইডিয়েট। তাহলে তো মরেই যেতুম। মরলে খুব সুবিধে হয়, তাই না ? জিপ তো বাঁ দিকে ওল্‌টাল। তাহলে স্যার ডানদিকে মারলেন না কেন ?

তাই তো মেরেছিলুম। গিয়ারে পা আটকে লাট খেয়ে গেলুম।

অ্যাকসিডেন্টের আগে যদি নেমে পড়তেন।

মন্ত্রী ভীষণ রেগে গিয়ে বললেন, এই এটাকে বার করে দাও তো। ওই মূর্খটাকে।

পুলিশ ছুটে এল, আপনি স্যার বাইরে যান তো, উনি বিরক্ত হচ্ছেন।

গরম রসগোল্লা বেরিয়ে গেলেন।

মন্ত্রী মহোদয় আড়চোখে আমার দিকে তাকালেন। বেশ স্নেহ মাখানো গলায় বললেন, কি, লিখে এনেছ?

আজ্ঞে না স্যার।

হোয়াট? তুমি লেখনি?

আমার হাত গেছে স্যার। কুকুরে কামড়ে দিয়েছে।

ষড়যন্ত্র ষড়যন্ত্র। ও খাজারামের লোক। ওকে পরীক্ষা কর তো।

ডাক্তারবাবুরা বললেন, কোন্ দলের লোক, স্টেথিসকোপ কিম্বা এক্সরেতে তো ধরা পড়বে না। মূর্খ ওর হাতটা পরীক্ষা কর। সত্যিই কুকুরে কামড়েছে কি না?

একজন নার্স এগিয়ে পড়-পড় করে আমার ব্যাণ্ডেজ খুলে ফেললেন, স্যার সাংঘাতিক কামড়েছে। সেপটিক মত হয়ে গেছে।

বলো কি; কার কুকুর কামড়েছে তোমাকে?

একটু মিথ্যে বললুম, আজ্ঞে হুগলীতে যখন গোবর সারভে করছিলুম, সেই সময় এক গোয়ালের বাইরে একটা বাঘের মত কুকুর শুয়েছিল। আমি নধর একটি গরুর পেটে হাত দিয়ে যেই বলেছি, মা ভগবতী একটু কর তো, কুকুরটা অমনি লাফিয়ে এসে খ্যাঁক করে কামড়ে দিলে।

ইনএফিসিয়েনসি অফ দি ডি-এম। গ্রস নেগলিজেনস অফ ডিউটিস। আমাকে দেখতে হচ্ছে। ডাক্তারবাবু বললেন, আহা পা-টা অমন করে নাড়াবেন না স্যার। ওয়েট দেওয়া আছে। ট্র্যাকসান ডিসপ্লেসড হয়ে যাবে। সেরে উঠে যা হয় করবেন।

তুমি ইনজেকসান নিয়েছ?

আজ্ঞে না স্যার। ডি-এম টোয়েন্টিফোর পরগনাস বললেন, কুকুরটা যখন পাগল ছিল না তখন না নিলেও চলবে।

হি নোজ নাথিং। এই একে একটা ভ্যাকসিন ঠুকে দাও তো এখুনি।

পেছু হটে দরজার সরছি। একজন নার্স বললেন, পালাচ্ছে স্যার।

চেপে ধরো, ধরো।

নারী-বাহিনী বলল।

মন্ত্রী বললেন, মন্ত্রী বলছি, তোমাকে নিতে হবে।

তলপেটে পাঁচ সি সি সেরাম ফুঁড়ে দেওয়া হল। যেমন কর্ম তেমন ফল।

মন্ত্রী বললেন, এক কাজের কথা।

হ্যাঁ স্যার কাজের।

লিখতে যখন পড়তখন বলতে তো পারবে?

কি স্যার?

ওই খাজারামকেঃ করে দু'চার কথা?

কোথায় স্যার?

তিনদিন পরে এবাসনের জন্যে পার্লামেণ্টারি বাই ইলেকসান: আমার ক্যাণ্ডিডেট হেক, ডু ইউ ওয়ানট ছাট?

নো স্যার!

তাহলে আজই অযাব।

ডাক্তারবাবুরা বল, আমরা এই অবস্থায় আপনাকে যেতে দোব না।

তোমাদের বাপ দে

আমি মিউ মিউ করলেলুম, এখন আর কুকুরের ঘেউ নয় বেড়ালের মিউ, ইলেকসান পড়েছে পলিটিকসে জড়ালে আমার চাকরি চলে যাবে স্যার!

না জড়ালেও যাবে। আমি যাইয়ে দোব।

মরেছে, এগোলেও নিশ্বর ব্যাটা, পেছলেও নির্বংশের ব্যাটা।

ঘণ্টাখানেক পরে হাসপাতাল থেকে অভিনব একটি শোভাযাত্রা উদাস শহর কলকাতা সেভাবে তাকিয়ে দেখল না। দেখলে

নজরে পড়ত, একটি সাদা অ্যামব্যাসাডার, পেছনে রাগী চেহারার এক মানুষ। ব্যাণ্ডেজ বাঁধা ডান পা সামনেরদিকে ট্রলির মত প্রসারিত প্রান্ত ভাগে একটি বাটখারা ঝুলছে। থেকে বেরিয়ে থাবা লোহার 'বায়ে' যেমন হুঁসিয়ারি লাচাকতি ঝোলে। চারপাশে বালিশ। তিনি সেট হয়ে বসে আছেন পাশেই বিমর্ষ চেহারার একটি ছেলে। বুকের কাছে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাত স্লিংয়ে ঝুলছে। মুখটা মাঝে মাঝে বিকৃত হচ্ছে। তাতে সিঙি মাছের কাঁটা মারছে।

পেছনে আর একটি গাড়িতে দু'জন হাড়বিশেষজ্ঞ একজন সেবিকা, ওষুধপত্র।

মিছিল ক্রমশ রাজনীতির অন্ধকারে অস্পষ্ট থেকে অস্পষ্টতর হয়ে গেল। আর ফিরে এল না, পতাকা উড়িয়ে গান দিতে দিতে!

এখন কলকাতার উপকণ্ঠে কোনও এক বাজারে মধ্যবয়সী একটি ছোকরা গামছা বিক্রি করে। কেউ জানে না, তার দাম দশ হাজার টাকা। এখন সে দিন আনে আর দিন খায়, কিন্তু সুখে আছে। কোনও বৃশ্চিক দংশন নেই। আগের চেয়ে একটু মোটা হয়েছে।